ভূদান-যজ্ঞ কি ও কেন

শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

॥ সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডল ॥
কলিকাতা

প্রকাশক :

পরমেশ বসু

সম্পাদক, সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডল

সি-৫২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা-১২

মুদ্রক :

শ্রীসুখলাল চট্টোপাধ্যায়

লোক-সেবক প্রেস

৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড

কলিকাতা—১৪

বাঁধাই :

ইউনিভার্সেল বুক বাইণ্ডার্স

১২৩, লোয়ার সার্কুলার রোড

কলিকাতা-১৪

প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর, ১৯৫৩—৩৩০০

দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪—৭৫০০

তৃতীয় (পরিবর্ধিত) সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৫৫—৭৫০০

মূল্য

বার আনা

পুস্তকখানি (দ্বিতীয় সংস্করণ) সম্পর্কে সন্ত বিনোবার আশীর্বাদ

তা ১—১০—৫৪

श्री चारूबाबू

पत्र मिला। 'भूदान-यज्ञ कि ओ केन' दूसरा संस्करण मिल गया। देख लिया। पुस्तक मुझे सर्वाङ्ग परिपूर्ण मालूम हुआ। मैं आशा करता हूँ यह पुस्तक बंगालमें प लिखे हर घर में पहुँचेगी। दाम तो नाम मात्र ही है। जो यह पुस्तक लेगा उसके हृदयसे दान-धारा नित्य बहती रहेगी।

শ্রীচারুবাবু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। "ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন" পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ আমি পাইয়াছি। উহা আমি দেখিয়া লইয়াছি। আমার মনে হয়, পুস্তকখানি সর্বাঙ্গ-পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমি আশা করি, এই পুস্তক বাংলার প্রত্যেক শিক্ষিত ঘরে পৌঁছিবে। মূল্য তো নামমাত্র রাখা হইয়াছে। যিনি এই পুস্তক লইবেন তাঁহার হৃদয় হইতে দান-ধারা নিত্য প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

বিনোবার প্রণাম

পুস্তকখানি (প্রথম সংস্করণ) সম্পর্কে পূজ্য বিনোবাজীর পত্র

तां १६, १०, ५३

श्री चारूबाबू,

"भूदान-यज्ञ कि ओ केन" यह आपकी किताब मिली। कुछ तो मैं देख गया। सब देखनेके लिये समय नहीं मिलेगा। लेकिन आपने हमारे आंदोलन के बुनियादी विचारों का बहुत ही अच्छे ढंगसे विवरण किया है इतना मैं समझ सका हूँ। मैं मानता हूँ आपकी यह किताब बंगालमें लोक-प्रिय होगी। मूल्य भी ज्यादह नहीं रक्खा है।

শ্রীচারুবাবু,

আপনার বই "ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন" আমি পাইয়াছি। কিছু কিছু তো আমি পড়িয়াছি। বইখানি সমস্ত পড়িবার মত সময় আমি পাইব না। তবে যতটা পড়িয়াছি তাহাতে আমি এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে আপনি আমাদের আন্দোলনের বুনিয়াদী সমস্যাসমূহকে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। আমি আশা করি, আপনার এই পুস্তক বাংলা দেশে জনপ্রিয় হইবে। ইহার মূল্যও বেশী করা হয় নাই।

বিনোবার প্রণাম

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণের ৩ হাজার কপি নয় মাসের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণে ৭৷৷৹ হাজার কপি মুদ্রিত করা হয়। কিন্তু উহাও এক বৎসরের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ ভূদানযজ্ঞ তথা সর্বোদয় সম্পর্কে ক্রমশ অধিকাধিকভাবে আগ্রহশীল হইতেছেন।

আরও কিছু পরিবর্ধিত আকারে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে ১৩টি নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, যথা (১) ভূদান-যজ্ঞের পঞ্চসোপান (ভূদান-আরোহণ), (২) পশ্চিমবঙ্গে ভূমি কি কম, (৩) ভূদানযজ্ঞে 'যজ্ঞ'-শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য, (৪) তপঃ, (৫) প্রজাসূয়-যজ্ঞ, (৬) ভূ-কুরবাণী, (৭) সৌম্য, সৌম্যতর ও সৌম্যতম সত্যাগ্রহ, (৮) কৃষি সর্বোত্তম শরীরশ্রম ও শ্রেষ্ঠ জীবিকা, (৯) সকলেই ভূমি পাইবার অধিকারী, (১০) অপরিগ্রহী সমাজের অর্থ, (১১) ভূদানযজ্ঞের সপ্তবিধ উদ্দেশ্য, (১২) গান্ধী-দর্শনে ত্রয়ী নীতি ও (১৩) আন্দোলনের ভাবী স্বরূপ। উড়িষ্যায় সমগ্র গ্রামদানের মাধ্যমে ভূমিক্রান্তি সাধিত হইতে থাকায় "সমগ্র গ্রামদান বা ভূমির গ্রামীকরণ" বিষয়টি বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে এবং উহাতে বিনোবাজীর নবতর উক্তিসমূহ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। 'সমন্বয়ে' বিনোবাজীর সাম্প্রতিক উক্তিসমূহ যোগ করা হইয়াছে। শাসনমুক্ত সমাজও নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে ভূদনাযজ্ঞ তথা সর্বোদয় সাহিত্য বিক্রয়ের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ পাঠক ভূদানযজ্ঞ ও সর্বোদয়ের ভাবধারা তথা বিনোবাজীর জীবনী সম্পর্কে একই পুস্তক হইতে জানিতে চান। বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন পুস্তক হইতে পাঠ করিবার মত আগ্রহ এখনও অধিকাংশের হয় নাই। তাই এই সংস্করণে "কে এই বিনোবা" অধ্যায়ে বিনোবাজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে। উহাতে সংক্ষেপে বিনোবা-জীবনীর এক প্রাণবান চিত্র দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আরও কয়েকটি বিষয়ে কিছু-কিছু নূতন লেখা যোগ করা হইয়াছে। আন্দোলনের বর্তমান

অবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় বিবেচনায় দু-একটি বিষয় একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং কয়েকটি বিষয় হইতে কিছু-কিছু অংশও বাদ দেওয়া হইয়াছে। মোটকথা, এবারে পুস্তকখানি আরও পূর্ণাঙ্গ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

মোট ২৬০ পৃষ্ঠার স্থলে এবারে ৩০০ পৃষ্ঠা হইয়াছে। মূল্য ॥০ আনার স্থলে ॥৵০ আনা করা হইয়াছে।

বাংলায় ভূদান-সাহিত্য প্রকাশনের দায়িত্ব কয়েকজন বিশিষ্ট সর্বোদয় সেবকের দ্বারা গঠিত "সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডল"-এর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। তাই এই সংস্করণ 'সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডল' প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা পুস্তকের প্রকাশনভার নিঃস্বার্থ সেবাস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। 'সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডলে'র শ্রীপরমেশ বসু এই পুস্তক প্রকাশের সুব্যবস্থার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং নিজেই সমস্ত প্রুফ দেখিয়াছেন। এজন্য আমি সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডল তথা পরমেশবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ।

পূর্ব দুই সংস্করণে কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই সম্পর্কে যাঁহাদের নিকট হইতে যেরূপ সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল এবারেও তাঁহাদের নিকট তদ্রূপ বা ততোধিক পাওয়া গিয়াছে। এজন্য আমি তাঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

ডায়মণ্ডহারবার
২-রা ডিসেম্বর, '৫৫

শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণে এই পুস্তক তিন হাজার কপি মুদ্রিত করা হয়। নয় মাসের মধ্যে গত জুলাই মাসের প্রথমভাগে উহা নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাই প্রথমে পুস্তকখানির পুনর্মুদ্রণের কথা হয়। কিন্তু ইহা মনে হয় যে, ভূদানযজ্ঞের ন্যায় নিত্য-বর্ধনশীল বিষয় সম্পর্কে লিখিত পুস্তক প্রায় এক বৎসর পরে কেবলমাত্র পুনর্মুদ্রণ করা হইলে উহা বাসি জিনিস বলিয়া পরিগণিত হইবে। সেজন্য পুস্তকখানির সংস্করণ ও পরিবর্ধন করা হইল।

ভূদানযজ্ঞ যুগধর্ম। উহাতে বিপ্লবের বীজ নিহিত। তাই উহা ক্ষুদ্র বীজের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া আজ বিরাট বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে। দিন দিন উহার নূতন নূতন শাখা-প্রশাখা নির্গত হইতেছে এবং উহারা আশাতীত দ্রুতভাবে পরিবর্ধিত হইতেছে। বিনোবাজীও চির-বর্ধনশীল। তাঁহার ব্যক্তিত্ব অপরিমেয়। তাঁহার বর্ধনশীলতা লক্ষ্য করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বিনোবাজী বর্ধিত হইতেছেন—একথা বলা হয় তো সঠিক নয়। বিনোবাজীর বিকাশ হয়তো পূর্ব হইতে অপরিমেয় হইয়াই ছিল। এখন দিন দিন তাহা প্রকাশ পাইতেছে। এমন দিন যায় না যে-দিন তিনি একটি নূতন কথা না বলেন। দিন দিন তিনি এই বিষয়ের উপর নূতন নূতন আলোক-সম্পাত করিতেছেন। কতই-না গভীরতায় ভরা ঐসব অনুপম বাণী! তাহাতে আন্দোলন দিন দিন নূতন শাখা-প্রশাখা লইয়া বিস্তৃত হইতেছে। তিনি যুগ-পুরুষ! অপরিগ্রহ ও অস্তেয়—আত্মার এই দুই মহান গুণের অবতার-পুরুষ তিনি! তাঁহার মাধ্যমে এই যুগে সমাজে এই দুই মহান গুণের বিকাশ সাধিত হইবে। এই সমস্তকে সবিস্তারে ও সঠিকভাবে উপস্থাপিত করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভব নহে। তথাপি যত-দূর সম্ভব নূতন বিষয়গুলি সংক্ষেপে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। উহাতে আমার কোন কৃতিত্ব নাই। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিয়াছি মাত্র।

২১টি নূতন বিষয়ের আলোচনা নূতন সংস্করণে করা হইয়াছে। যথা—(১) কমিউনিষ্টগণের আপত্তির খণ্ডন, (২) সাম্যযোগ, (৩) সাম্যবাদ ও সাম্যযোগ, (৪) আজ সখ্য-ভক্তির যুগ, (৫) শ্রমদান-যজ্ঞ, (৬) জীবনদান,

(৭) পরমধর্ম, (৮) ভূমি-বিতরণ, (৯) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য উৎপাদন (১০) পুঁজিবাদ অবসানের উপায়, (১১) সর্বোদয় সাধনের ভিত্তি, (১২) সর্বোদয়-সূত্র, (১৩) শাসনমুক্ত সমাজ, (১৪) শরীর-শ্রমের গুরুত্ব, (১৫) গ্রামরাজ ও রামরাজ, (১৬) যুগপৎ উভয় পদ্ধতি অনুসরণ, (১৭) বুদ্ধি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা, (১৮) জ্ঞান ও বিজ্ঞান, (১৯) দান, যজ্ঞ ও তপঃ, (২০) সূতাঞ্জলি, (২১) সমন্বয়। প্রস্তাবনা সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে। পূর্বের প্রস্তাবনার বিষয়বস্তু পুস্তকের একটি নূতন বিষয়ে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পরিশিষ্টের পরিসংখ্যান ভাগে অনেক পরিবর্তন করা হইয়াছে। ইশাক-রিপোর্টের মহকুমাওয়ারী ভূমি-সংক্রান্ত বিবরণের পরিবর্তে জেলাওয়ারী ফসল-সংক্রান্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। উপরন্তু জীবিকা হিসাবে শ্রেণী-বিভাগ ও কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের শ্রেণী-বিভাগের জেলাওয়ারী বিবরণ এবং বনের জেলাওয়ারী হিসাব (পরিচয়সূচক ভূমিকাসহ) দেওয়া হইয়াছে। সম্পত্তিদান সম্পর্কীয় পরিশিষ্টে পূর্বের বিষয়টি বাদ দিয়া সম্পত্তিদান সম্পর্কে আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পূর্বের বিষয়ের প্রয়োজনীয় অংশ পুস্তকের মধ্যে 'সম্পত্তিদানযজ্ঞ' বিষয়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কয়েকটি পুরাতন বিষয়ের মধ্যেও নূতন লেখা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এরূপে পুস্তকের কলেবর মোট ২১২ পৃষ্ঠার স্থলে উহা বৃদ্ধি হইয়া মোট ২৬০ পৃষ্ঠা হইয়াছে। তথাপি কাগজ প্রস্তুতকারক ফার্ম Orient Paper Mills Ltd., লোক-সেবক প্রেস ও ইউনিভার্সেল বুক বাইন্ডার্স-এর সহৃদয় সহায়তায় পুস্তকের মূল্য অবর্ধিত রাখিতে পারা সম্ভব হইয়াছে।

প্রথম মুদ্রণে পুস্তকের কোন-কোন স্থানে বানান ও ভাষায় যে-সব দোষত্রুটি ছিল তাহা শ্রীযুক্ত পরমেশ বসু অতি মনোযোগের সহিত পুস্তকখানি বার-বার পড়িয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমার সোদর-প্রতিম সহকর্মী শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মেইকাপ ভূদানযজ্ঞ দপ্তরে তাহার উপর ন্যস্ত গুরুদায়িত্ব পালন করিয়াও অতিরিক্ত সময়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমার খারাপ-লেখা পাণ্ডুলিপিগুলি উদ্ধার করিয়া ও সমস্ত প্রুফ নিজে দেখিয়া পুস্তকখানি প্রকাশে যে সহায়তা দান

করিয়াছে তাহাতে আমি অভিভূত হইয়াছি।

এই সংস্করণে পুস্তকখানি ভূদানযজ্ঞের বিপ্লবাত্মক বিচারধারা প্রচারে অধিকতর সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করি। তাই পুস্তকখানি পরম শ্রদ্ধাসহকারে বাংলা ভাষাভাষী কোটী-কোটী ভাই-ভগ্নীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হইল।

বিনোবা জন্মতিথি
১১ই সেপ্টেম্বর, '৫৪

শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এখনও বাংলা ভাষায় ভূদানযজ্ঞ-সাহিত্য বেশীকিছু প্রকাশিত হয় নাই। অতএব এই পুস্তক প্রকাশ করা বোধহয় অনাবশ্যক বিবেচিত হইবে না। বাংলার জনসাধারণ যাঁহারা ভূদানযজ্ঞের তত্ত্ব ও বিচারধারা এবং ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলনের তথ্যাদি জানিবার ও বুঝিবার জন্য আগ্রহশীল তাঁহাদের হস্তে এই পুস্তকখানি এক ক্ষুদ্র কর্মীর বিনীত নিবেদনস্বরূপ অর্পিত হইল।

এই পুস্তকখানি বাংলার কর্মীদের ও সম্ভাবিত কর্মীদের উপকারে আসিবে বলিয়া মনে করি। তাই পূজ্য বিনোবাজী কর্মীদের উদ্দেশ্যে যাহা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন তাহার কিছু-কিছু এই পুস্তকের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

সম্পত্তিদানযজ্ঞ সম্পর্কেও এই পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে। উপরন্তু সম্পত্তিদানযজ্ঞ সম্পর্কে পূজ্য বিনোবাজীর প্রবচন ও লেখার কিছু-কিছু পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। তাহাতে সম্পত্তিদানযজ্ঞের মহত্ত্ব ও তত্ত্ব গভীরভাবে বুঝিবার সুবিধা হইবে।

এই পুস্তকখানি লেখার মধ্য দিয়া আমি নিজে ভূদানযজ্ঞের তত্ত্ব ও বিচারধারা অধিকতর গভীরভাবে বুঝিবার ও অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

পূজ্য বিনোবাজী ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কে এযাবৎ এক হাজারেরও অধিক প্রবচন দিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি কিছু-কিছু লিখিয়াছেনও। প্রত্যেক

প্রবচন ও লেখায় তিনি তাঁহার হৃদয়ের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে কিছু-না-কিছু নূতন কথা বলিয়াছেন ও উহাতে নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছেন। অতএব এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে তাহার সবকিছু সন্নিবেশিত করা সম্ভব নহে এবং তাহা করাও এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। তবে ভূদানযজ্ঞের তত্ত্ব ও উহার অন্তর্নিহিত বিচারধারা তথা সর্বোদয় বিচারধারা বিভিন্ন দিক হইতে বুঝিবার পক্ষে যাহা প্রধানত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি তৎসমুদয় এই পুস্তকে সংক্ষেপে সহজবোধ্য করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছি। প্রত্যেক বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া যতদূর সম্ভব বিনোবাজীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি।

পূজ্য বিনোবাজীর ভাষণের অংশাদি 'হরিজন', 'সর্বোদয়', 'ভূদানযজ্ঞ-বার্তা', 'ভূদানযজ্ঞ-বিহার' প্রভৃতি পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। পশ্চিম-বাংলার ভূমিসংক্রান্ত তথ্যাদি ভূমিরাজস্ব কমিশন-রিপোর্ট, ইশাক-রিপোর্ট, প্রফেসর মহালানবিশ প্রভৃতির "Survey of the after effect of the Bengal Famine of 1943" ও শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহের 'Concentration in the Land structure' --শীর্ষক প্রবন্ধ (যাহা ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের "মডার্ন রেভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়) হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। ভূমির শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কীয় জেলাওয়ারী বিবরণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি অধিকরণ হইতে পাইয়াছি। এজন্য আমি তাঁহাদের সকলের নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

গান্ধী-জয়ন্তী
১৯৫৩

শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

প্রস্তাবনা

"মানবসমাজ বহু হাজার বৎসর পুরাতন। কিন্তু পৃথিবী এত বড় যে, পুরাকালে পৃথিবীর একদিকের মানুষের সহিত অন্যদিকের মানুষের কোন পরিচয় বা সম্পর্ক ছিল না। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হইতে লাগিল এবং ক্রমশ মানসিক, ধার্মিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সকল দিকে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু বন্ধুত্বের বা মিলনের সম্পর্ক প্রথমে হইল না। বহুক্ষেত্রে সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া প্রথম এই সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই কখন প্রথম সম্পর্ক মধুর আবার কখন তাহা তিক্ত হইয়াছিল। তবে মোটের উপর পারস্পরিক সম্পর্কের ফল ভালই হইয়াছে।

"পুরাকালে উত্তর-ভারতে আর্যজাতি বাস করিতেন এবং দক্ষিণ-ভারতে দ্রাবিড় জাতি বাস করিতেন। যদিও একই দেশ, তথাপি এই বিশাল দেশের উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বিরাট দণ্ডকারণ্য ব্যবধান থাকায় হাজার-হাজার বৎসর যাবৎ ইঁহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল না। আর্যগণের পাহাড়ী সংস্কৃতি এবং দ্রাবিড়দের সামুদ্রিক সংস্কৃতি ছিল। উত্তরের মনুষ্য জ্ঞান-প্রধান ছিলেন এবং দক্ষিণের মনুষ্য ভক্তি-প্রধান ছিলেন। ক্রমশ দেশের এই উভয় অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হইল। উভয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ সাধিত হইল। উত্তর-ভারতে বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাব হইল এবং তাঁহাদের বাণী—আত্মজ্ঞানের বিচারধারা দক্ষিণে রামেশ্বর পর্যন্ত পৌঁছিল। তৎপূর্বেও বৈদিকগণ তাঁহাদের নিজস্ব ধারায় দক্ষিণ-ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন। অন্যদিকে দক্ষিণ-ভারতে শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মাধবাচার্য, প্রভৃতির আবির্ভাব হইল। উত্তর-ভারত হইতে যে-আত্মজ্ঞানের বিচারধারা দক্ষিণ-ভারতে গিয়াছিল, দক্ষিণ-ভারত তাহাতে নিজের বৈশিষ্ট্য দান করিল অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা তাহাকে সমৃদ্ধ করিল। শঙ্করাচার্য, রামানুজ প্রভৃতি তাহা উত্তর-ভারতে লইয়া গেলেন। দক্ষিণ-ভারতে আরও বহু জ্ঞানবান,

ভক্তিমান সন্ত-পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও সমগ্র ভারতে ভক্তিমার্গ প্রচার করিয়াছিলেন। পরিণামস্বরূপ বৈচারিক দৃষ্টিতে উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারত একই রাষ্ট্রে পরিণত হইল। যদিও ভারতের প্রতি প্রদেশে বহুসংখ্যক রাজ্য ছিল তথাপি বিচারের রাজ্য কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

"অতঃপর মুসলমানগণ বাহির হইতে আসিলেন। তাঁহারা এক নূতন সংস্কৃতি সঙ্গে লইয়া আসিলেন। ইসলাম সকলকে সমান বলিয়া মানিতেন। উপনিষদ প্রভৃতিতে সাম্যের কথা ছিল বটে, কিন্তু আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় বা সামাজিক আচরণে ইহার কিছুমাত্র ছিল না; বরং ইহার বিপরীতই ছিল। অসাম্যমূলক জাতিভেদ-প্রধান এই সমাজ-ব্যবস্থা। তাই মুসলমানদের সংস্কৃতির সহিত এখানকার সংস্কৃতির সংঘর্ষ বাধিল। মুসলমানেরা তাঁহাদের সংস্কৃতির বিকাশের জন্য হিংসার পথ ও প্রেমের পথ—এই উভয় পথই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই দুইটি পথ দুইটি ধারার মত একসাথে চলিয়াছিল। গজনী, ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি হিংসা-পথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর অন্যদিকে আকবর, কবীর প্রভৃতি প্রেমের পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ তরবারির বলে-যে এই দেশ জয় করিয়াছিলেন অথবা এই দেশের লোক-যে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন—একথা কেহ বলিতে পারে না। তবে যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পূর্বে মুসলমান ফকিরগণ এদেশে আসিয়া ইসলামের সাম্যের বাণী গ্রামে-গ্রামে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। এই জাতিভেদের দেশে তাঁহাদের প্রচারের দ্বারা লোকে খুবই প্রভাবিত হইয়াছিল। এইভাবে এই দুই সংস্কৃতি পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসিল। ইহার পর এই দেশে বহু ভক্তের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছিলেন এবং একই পরমেশ্বরের উপাসনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছিলেন। ইহাতে-যে ইসলামের বৃহৎ অবদান ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর্য-সংস্কৃতি ও দ্রাবিড়-সংস্কৃতির যে-সংমিশ্রণ হইয়াছিল তাহাতে এইভাবে ইসলামের সংস্কৃতির রসায়ন যুক্ত হইল।

"ভারতে যে-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে বিজ্ঞানের অভাব

ছিল। ভারতে এক সময়ে বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ে তাহার অভাব হইল। ঠিক সেই সময়ে ইউরোপে নূতন-নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়া তথায় অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক উন্নতি হইল ও ইউরোপীয়গণ তখন এখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। ভারত ইংরাজগণের নিকট পরাধীনতাপাশে আবদ্ধ হইল। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতে থাকিল। সংঘর্ষের মাধ্যমে সংমিশ্রণ আরম্ভ হইল। এই মিশ্রণের ফলে এক নূতন সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছে। তাহা হইতেছে সামূহিক অহিংসা। পূর্বে অহিংসার প্রয়োগ যাহা হইত তাহা ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে হইত। সামুদায়িক ক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ হইতে পারিত না। কারণ বিজ্ঞানের প্রগতির জন্য আজ মানবসমাজ একে অন্যের সহিত যেরূপ সম্পর্কযুক্ত হইতে পারিতেছে পূর্বে তাহা সম্ভব ছিল না। আজ যেখানে যে-সংঘর্ষ আসুক না কেন অথবা যে-সম্পর্ক স্থাপিত হউক না কেন, উহা সামাজিক হইয়া পড়িতেছে। তাই বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে কোন আন্দোলন কোন এক দেশে সীমাবদ্ধ থাকে না। উহা বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হইয়া পড়ে।• আজকাল এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের এবং এক সমাজের সহিত অন্য সমাজের সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে—সংঘর্ষও হইতেছে।"*

ইংরেজ ভারতকে কেবলমাত্র পরাধীন করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন না। পরন্তু উহাকে একেবারে নিঃশস্ত্র করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর ভারতে জাগৃতি আসিল এবং স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিল। কিন্তু প্রচলিত উপায়ে অর্থাৎ হিংসার দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করিবার কোন অবকাশ আর থাকিল না। হিংসা প্রয়োগ করিবার যেটুকু প্রচেষ্টা করা হইল তাহাও নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। হৃদয়ে স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার জ্বালা; বাহিরে ব্যর্থতা ও নিরাশার ঘোর অন্ধকার। ভারতের অন্তরাত্মা এক কার্যকরী পন্থার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পরিস্থিতির প্রয়োজনের দাবীতে ভারতের অধ্যাত্ম ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সংযোগের ফলে সামুদায়িক অহিংসার উদ্ভব হইল। যুগের দাবীতে, যখন এইভাবে

---

* বিনোবা।

আত্মার কোন গুণের বিকাশের প্রয়োজন হয় তখন এক যুগ-পুরুষের মাধ্যমে ঐ গুণের বিকাশ ও প্রচার সাধিত হইয়া থাকে। সামূহিক অহিংসার বিকাশ ও প্রচারকল্পে আবির্ভূত সেই যুগ-পুরুষ হইতেছেন—মহাত্মা গান্ধী।

সামূহিক অহিংসার প্রয়োগের ফলে রাজনৈতিকক্ষেত্রে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিলাম। অহিংসা জীবনের এক আধ্যাত্মিক বিচার। আত্মার একত্ব অর্থাৎ সর্বভূতে একই আত্মা বিরাজমান এই বিশ্বাস হইতেছে অহিংসা-বিচারের উৎস। উহা জীবনের মূলদেশে প্রবেশ করে। জীবনের মূলদেশে প্রবেশলাভ হইলে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই উহার ক্রিয়া না হইয়া থাকিতে পারে না। তাই আজ ভারতে আর্থিক, সামাজিক প্রভৃতি জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রে সামূহিক অহিংসার সম্প্রসারণ ও বিকাশের সাধনা চলিতেছে। ভারতের পরিস্থিতিতে তাহাই আজ প্রয়োজন। সামুদায়িক অহিংসার চরম পরিণতি সর্বোদয়-প্রতিষ্ঠায়। উহাই চরম ও পরম ধ্যেয়।

"এখন ভারত তথা প্রতীচ্যের পালা আসিয়াছে। এখন ভারত এক নূতন সংস্কৃতি, নূতন বিচারধারা অর্থাৎ সামূহিক অহিংসা, পশ্চিমের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। মনু বলিয়াছেন—"স্বং স্বং চরিত্রং, শিক্ষেরণ, পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ"—'পৃথিবীর সকল লোক চরিত্রের শিক্ষালাভ করিবে ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিকট হইতে।' এই যে মনুর ভবিষ্যদ্বাণী উহা মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবে সিদ্ধ হইয়াছে।

"আত্মজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সংযোগে যে পরিণাম সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আলোক ভারতের মাধ্যমে সারা বিশ্বে বিকীর্ণ হইবে—ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রায়।"* ইহার লক্ষণও দেখা যাইতেছে। ভারতের পক্ষ হইতে শান্তির জন্য আবেদনের বাণী কোরিয়ায় পৌঁছিল আর সেখানে রণ-বিরতি হইয়া গেল। ভারত ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পূর্ণভাবে সফল করিতে পারিবে কি? সামূহিক অহিংসার পূর্ণ বিকাশের জন্য যে ত্যাগ এবং ঐকান্তিক ও অক্লান্ত তপশ্চর্যার প্রয়োজন, ভারত যদি তাহা করিতে পারে তবে এই যুগে ভারত সারা জগতকে আলোক দান করিতে পারিবে।

---

* বিনোবা।

সূচীপত্র

ভূদানযজ্ঞ কি	......	১
ভূদানযজ্ঞের সফলতায় আশংকা	......	৭
কে এই বিনোবা	......	৮
কাঞ্চনমুক্তি-যোগ	......	২৪
সর্বোদয়দর্শন ও সর্বোদয়-সমাজের প্রতিষ্ঠা	......	২৬
তেলংগানার পরিস্থিতি ও বিনোবাজীর তেলংগানা যাত্রা		২৯
ভূদানযজ্ঞের উদ্‌গম	......	৩২
ভূদানযজ্ঞের ক্রমবিকাশ	......	৩৫
ভূদানযজ্ঞের পঞ্চসোপান (ভূদান-আরোহন)	......	৪১
ইহা-যে বাপুরই সেইদৃশ্য	......	৪৪
সমগ্র গ্রামদান বা ভূমির গ্রামীকরণ	......	৪৫
প্রেম ও আত্মত্যাগবৃত্তির বিকাশ	......	৫২
ভারতে আত্মজ্ঞানের বিকাশ	......	৬১
ক্রান্তির অভিব্যক্তির ক্রম	......	৬৫
ভূদানযজ্ঞের মূলতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম	......	৬৬
সর্বোদয়প্রেমীর কর্তব্য	......	৬৯
রাষ্ট্রনায়কগণের করুণ অবস্থা	......	৬৯
দণ্ডনিরপেক্ষ জনশক্তি	......	৭১
সমস্যা সমাধানে আইনের স্থান	......	৭২
দারিদ্র্যের মূল	......	৭৮
পশ্চিমবঙ্গের ভূমিব্যবস্থা	......	৮০
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে দুর্দশার দৃশ্য	......	৮৫
পশ্চিমবঙ্গে ভূমি কি কম	......	৮৮
দরিদ্র চায় জমি	......	৯২
বেকার-সমস্যা ও তাহার স্বরূপ	......	৯২

শাসনমুক্ত-সমাজ ২২৬
শরীর-শ্রমের গুরুত্ব ২৩১
অপরিগ্রহী-সমাজের অর্থ ২৩৪
গ্রামরাজ ও রামরাজ ২৩৭
ভূদানযজ্ঞের সপ্তবিধ উদ্দেশ্য ২৩৮
যুগপৎ উভয় পদ্ধতির অনুসরণ ২৩৯
বুদ্ধি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা ২৪০
জ্ঞান ও বিজ্ঞান ২৪২
গান্ধী-দর্শনে ত্রয়ী নীতি ২৪২
সূতাঞ্জলি ২৫০
সমন্বয় ২৫১
বিনোবাজী মৌলিক ২৫৭
আন্দোলনের ভাবী স্বরূপ ২৫৮
উপসংহার ২৬১

পরিশিষ্ট—

(ক) কর্মীদের প্রতি বিনোবাজীর বাণী ২৬৫
(খ) সম্পত্তিদানযজ্ঞ সম্পর্কে আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য ২৬৮
(গ) পশ্চিমবঙ্গে জেলাওয়ারী ভূমির বিবরণ ২৭২
(ঘ) পশ্চিমবঙ্গে জীবিকা হিসাবে শ্রেণীবিভাগ ও কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের শ্রেণীবিভাগের বিবরণ ২৭৪
(ঙ) ফসল উৎপাদন অনুসারে জেলাওয়ারী ভূমি-বিভাগের বিবরণ ২৭৬
(চ) পশ্চিমবঙ্গের বন ২৭৯

ভূদানযজ্ঞ কি?

"যজ্ঞ"—এই কথার সহিত আমরা সকলে পরিচিত। "যজ্ঞ" কি—তাহা আমরা সকলেই কমবেশী জানি। "যজ্ঞ" একপ্রকার পূজাপদ্ধতি। "যজতি যজতে বিষ্ণুং সুধীঃ পূজয়তীত্যর্থঃ"। 'অশ্বমেধ' যজ্ঞের কথা আমরা জানি। 'রাজসূয়' যজ্ঞের কথাও আমরা জানি। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ ইত্যাদি যজ্ঞের উল্লেখ আছে। উপরন্তু গারুড়, শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, মহাব্রত, সর্বোত-মুখ, পৌণ্ডরীক, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, আঙ্গিরস ইত্যাদি বহুবিধ যজ্ঞের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। কিন্তু 'ভূদানযজ্ঞের উল্লেখ কোথাও নাই। ইহা নূতন শব্দ ও নূতন যজ্ঞ। নূতন শব্দ বলিয়া আমাদের মনে যেন আশঙ্কা না আসে। কারণ যুগান্তকারী শব্দসৃষ্টির সহিত বাঙ্গালী বিশেষভাবে পরিচিত। 'দরিদ্রনারায়ণ' ও 'বন্দেমাতরম্'—এই দুই শব্দের স্রষ্টা বাংলার দুই মহান্ মনীষী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দ সৃজন করেন এবং ঐ শব্দ ধর্ম ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করে। 'বন্দেমাতরম্'এর স্রষ্টা ও দ্রষ্টা ছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। ভারতের জাতীয়তার উন্মেষ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই শব্দ-মন্ত্রের স্থান যে কোথায় তাহা সকলে অবগত আছেন। 'ভূদানযজ্ঞ' এই শব্দও ভারতের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ক্রান্তিকারক হইবে সন্দেহ নাই। আলোচনা যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই ভূদানযজ্ঞের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইবে। তবে সংক্ষেপে উহার অর্থ এই যে—যে-ব্যক্তি ভূমি-হীন দরিদ্র—যে ভূমি চাষ করিতে জানে ও ভূমি চাষ করিতে চাহে কিন্তু অন্যের ভূমিতে চাষ করা বা শ্রমিকবৃত্তি ছাড়া যাহার অন্য কোন জীবিকা নাই, তাহার জন্যই ভূমিদান এবং এই ভূমিদান হইবে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বিসর্জনের জন্য, মালিকানাবোধ নিরসনের জন্য। অর্থাৎ বায়ু, জল, আলোর ন্যায় ভূমির মালিক একমাত্র ভগবান এবং প্রত্যেকেরই নিজ হাতে চাষ করিবার সমান অধিকার আছে—এই বোধ হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া দাতা নিজের মালিকানাবোধ বিসর্জনের জন্য ভূমি ভূদানযজ্ঞে অর্পণ করিবেন—

যাহাতে গ্রামের ভূমি গ্রামের হইয়া যায় অর্থাৎ—ভূমির গ্রামীকরণ সাধিত হয়। ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য হইতেছে—ভূমির এবম্প্রকার গ্রামীকরণকে ভিত্তি করিয়া কুটীরশিল্পপ্রধান অহিংস-সমাজ রচনা করা।

ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জীব তথা মনুষ্যের জীবনধারণ ও পোষণের জন্য যাহাকিছু মৌলিক প্রয়োজন, তাহা প্রয়োজনানুযায়ী সকলের পক্ষে সমভাবে প্রাপ্য করিয়া দান করিয়াছেন; তাহা হইতেছে পঞ্চভূত--"ক্ষিত্যপ্‌তেজ-মরুৎব্যোম্"—ক্ষিতি (ভূমি), অপ্ (জল), তেজ (আলো), মরুৎ (বাতাস), ব্যোম্ (শূন্যদেশ)। বাতাস সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজনমত ভোগ করিতে পারে। বাতাসে সকলের সমান অধিকার। আলোতেও সকলের সমান অধিকার এবং সকলে তাহা নিজ নিজ প্রয়োজনমত ভোগ করিতে পারে। জলেও সকলের সমান অধিকার। আকাশের জল যখন বর্ষিত হয়, তখন তাহা উচ্চ-নীচ বা ধনী-দরিদ্র ভেদ জ্ঞান করে না। নদীর প্রবহমান জলে সকলের সমান অধিকার। ভগবানের সৃষ্টির কৌশল এমন যে, মানুষ তথা তাঁহার সৃষ্ট অন্য জীবের জন্য যে জিনিসের যত বেশী প্রয়োজন তাহাকে তিনি ততই সহজপ্রাপ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন বাতাস না হইলে মানুষ অল্পক্ষণও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, তাই বাতাসকে তিনি সর্বাপেক্ষা সহজপ্রাপ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন ঈশ্বরের দান বাতাস, আলো ও জলে সকলের সমান অধিকার তেমনি ঈশ্বরের দান ভূমিতেও সকলের সমান অধিকার। ভগবানের দানে একজনের অধিকার থাকিবে আর অন্য জনের অধিকার থাকিবে না--ভগবানের এমন বিধান হইতে পারে না। এই সম্পর্কে বিনোবাজী তাঁহার অনুপম ভাষায় বলিয়াছেন—"সূর্য ঘরে ঘরে গিয়া পৌঁছায়। উহার রশ্মি রাজা যতটুকু পায় মেথরও ততটুকু পাইয়া থাকে। ভগবান কখনও নিজের জিনিসকে অসমানভাবে বিতরণ করেন না। যদি ভগবান হাওয়া, জল, আলো ও শূন্যদেশের বিতরণে ভেদভাব না করিয়া থাকেন, তবে ইহা কিরূপে হওয়া সম্ভব যে, তিনি জমি সকলকে সমানভাবে না দিয়া মাত্র কতিপয় লোকের হাতে থাকিতে দিবেন?" কিন্তু যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী সমাজের অর্থনৈতিক অপব্যবস্থার ফলে সেই ভূমি হইয়া গিয়াছে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। একজনের আছে আর এক-

জনের নাই। একজনের কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত, আর একজনের কাছে প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। তাই দেশে এত হাহাকার! দেশের বিকট ধনবৈষম্যের মূলে রহিয়াছে এই অস্বাভাবিক ও বিকারগ্রস্ত ভূমি-ব্যবস্থা! যাঁহার হৃদয় আছে তিনি অন্তরে অনুভব করিতে পারেন যে, ভারতের অন্তস্তল ভেদ করিয়া অহরহ দরিদ্র ভূমিহীনের আকুল ক্রন্দনরোল উত্থিত হইতেছে। মায়ের কোল ফিরিয়া পাওয়ার জন্য মাতৃহারা শিশুর যেমন আকুল আগ্রহ, ভূমি পাওয়ার জন্য ভূমিহীন দরিদ্রের তেমনি আগ্রহাকুল প্রতীক্ষা। যেমন নিঃসন্তান রমণী অন্যের সন্তানকে লালনপালন করিলেও নিজ গর্ভজাত সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিবার যে স্বাভাবিক ক্ষুধা তাহা তৃপ্ত হয় না, তেমনি অন্যের ভূমি চাষাবাদ করিলেও ভূমিহীন দরিদ্রের ভূমি-ক্ষুধা তৃপ্ত হয় না।

গ্রাম-সংগঠনের কাজ সফল হইতেছে না কেন? গঠনমূলক কর্মীদের অভিজ্ঞতা কি? ভূমিহীনকে চরকা দেওয়া হইয়াছে—তাঁত দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে অন্যান্য গৃহশিল্প দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহা সে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই—তাহাতে তাহার অন্তর তৃপ্ত হয় না। কারণ সে সর্বপ্রথমে চাহে ভূমি—ভূমিকে সে আপনার করিয়া পাইতে চাহে। ভারত তথা এশিয়া মহাদেশের যেখানে যে অশান্তি দেখা দিয়াছে তাহার মূলগত কারণ—এই ভূমি-সমস্যা। তাই ভূমি-সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপর ভারতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যপ্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ।

কেন এই নিদারুণ ভূমিক্ষুধা? উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যেই উহার কারণ নিহিত রহিয়াছে। সকলের সমানভাবে পাওয়ার অধিকার দিয়া ভগবান যে 'পঞ্চভূত' দান করিয়াছেন ভূমি তাহাদের অন্যতম। মানুষের জীবনধারণের জন্য পঞ্চভূতের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন অপরিহার্য। মানুষের চলাফেরার জন্য ব্যোমের (space) প্রয়োজন। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ু, পানের জন্য জল ও তাপ সংরক্ষণ প্রভৃতির জন্য আলোর প্রয়োজন। এই চারিটি তো মানুষ প্রয়োজনমত সমান অধিকারে পাইয়া থাকে। কিন্তু

কেবলমাত্র ইহাতেই মানুষ বাঁচিতে পারে না। জীবনধারণের জন্য ইহা ছাড়া তাহার খাদ্য, পরিধেয় ও আবাস গৃহের প্রয়োজন। খাদ্য সামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্রাদির উপাদান ও আবাসের যাবতীয় সরঞ্জাম উৎপাদনের একমাত্র উৎস ও সাধন ভূমি বা ভূগর্ভ। সুতরাং ভূজাত বা ভূমিগর্ভজাত উৎপাদনের উপর মানুষের খাদ্য, পরিধেয় ও আবাসের যাবতীয় ব্যবস্থা নির্ভর করে। ভূমি বা ভূগর্ভ ব্যতীত আর কিছু হইতে ঐ সকলের উৎপাদন সম্ভব নহে। মানুষ হাতে বা যন্ত্রে অনেক কিছু দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু খাদ্যশস্য, শাকসব্জী ও ফলমূলাদি একমাত্র ভূমিতেই উৎপন্ন হয়। আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদির জন্য তুলা এবং চরকা ও তাঁতের কাঠ ভূমি হইতে উৎপন্ন; বস্ত্র-কলের লৌহও ভূগর্ভ হইতে উৎপন্ন। বাসগৃহাদি মৃত্তিকা, ইষ্টক বা প্রস্তর নির্মিত যাহাই হউক তাহার যে-কোন উপাদান ভূমি বা ভূগর্ভ হইতে উৎপন্ন। এইভাবে একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, আমাদের জীবন-ধারণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যাহা কিছু দ্রব্য-সামগ্রী সকলেরই মৌলিক উৎপত্তি-স্থল ভূমি বা ভূগর্ভ। বায়ু, আলো ও জলের সহিত ভূমির পার্থক্য এই যে, উহারা সরাসরিভাবে ভোগ্য অর্থাৎ বায়ু, আলো ও জল ভোগ করিবার জন্য পরিশ্রম করিয়া উহাদের উৎপাদন করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু খাদ্য, পরিধেয় ও আবাসস্থল পাইতে হইলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরি-শ্রম করিয়া উৎপাদন করিতে হয়। ভগবান মানুষকে খাইবার জন্য যেমন এক মুখ দিয়াছেন, তেমনি উৎপাদন করিবার জন্য দুই হাত দিয়াছেন। ভূমি মানুষের জীবিকা অর্জ্জনের মৌলিক ক্ষেত্র এবং খাদ্য, পরিধেয় ও আবাসস্থল উৎপাদনের মৌলিক সাধন। তাই বাতাস, জল ও আলোর ন্যায় ভূমিতে মানুষের সমান অধিকার অব্যাহত না রাখিলে মানুষের জীবন অন্যের হস্তে আবদ্ধ হইয়া যায় এবং মানুষ—বিশেষত যে মানুষ ভূমিতে দুই হাত খাটাইয়া উৎপাদন ও জীবিকার্জ্জন করিতে চায়—শ্বাসরোধের ন্যায় অবস্থা অন্তরতম প্রদেশ হইতে অনুভব করে। আজ যদি এমন হইত যে বায়ুর উপর মানুষ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছে এবং বায়ু মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে, অধিকাংশ বায়ু কতিপয় ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত হইয়াছে, বায়ুতে জমিদারী ও জোতদারী ধরণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং

বায়ুর বিঘার মূল্য ২০০৲ টাকা ও বায়ুর বিঘার খাজনা ১০৲ টাকা হইয়াছে তাহা হইলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইত? যাহার অধিকারে বায়ু নাই সে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বায়ুর জমিদার ও বায়ুর জোতদারের কাছে ছুটাছুটি করিত। সে মনে করিত যে বায়ুর জমিদার ও জোতদারের নিকট তাহার জীবন-মরণ বাঁধা আছে। যেমন রূপকথার রাক্ষসীর হাতে মানুষের জীবন-কাঠি ও মরণ-কাঠি থাকে; সেরূপ যে ব্যক্তি ভূমি চাষ জানে ও ভূমি চাষ করিতে চায় এবং ভূমি চাষ ছাড়া আজ যাহার স্বাধীন জীবিকার ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে, অথচ যাহার নিজের ভূমি নাই—সে ব্যক্তি অনুভব করে যে তাহার জীবন ও মরণ জমিদার ও জোতদারের হাতে বাঁধা—তাহার জীবন-কাঠি ও মরণ-কাঠি জমিদার ও জোতদারের হাতে। কারণ তাহার জীবনধারণের জন্য বায়ু, জল ও তাপ ব্যতীত আরও যে তিনটি জিনিস অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন সেই খাদ্য, বস্ত্র ও আবাস-গৃহ উৎপাদনের সাধন যে ভূমি তাহা তাহার হাতে নাই। তাহার জন্য তাহাকে নির্ভর করিতে হয় অন্যের খেয়াল-খুসির উপর। তাই সে রুদ্ধশ্বাস মানুষের ন্যায় অনুভব করিতে থাকে। তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের এই অনুভূতি। তাহার অন্তরের ভাষা এই। সে মূক। এখন সে ক্রমশঃ মুখর হইয়া উঠিতেছে। যদি শীঘ্র এবং শান্তির পথে ভারতে ভূমির সুসম-বণ্টন না হয় তবে ভারতের প্রগতির পথ রুদ্ধ হইবে, ভারতকে এক অভাবনীয় দুর্দৈবের সম্মুখীন হইতে হইবে।

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় কথা বুঝিয়া রাখিতে হইবে। যাহার শ্বাস গ্রহণ করার প্রয়োজন সে বায়ু পায়। বায়ু পাইবার মৌলিক অধিকার তাহার আছে। যাহার পিপাসা লাগিয়াছে সে জল পাইয়া থাকে। জল পাইবার মৌলিক অধিকার তাহার আছে। সেরূপ যাহার ক্ষুধা পাইয়াছে খাদ্য পাইবার অধিকার তাহার আছে বটে, কিন্তু সে-অধিকার তাহার তখনই জন্মিবে যখন সে পরিশ্রম করিয়া খাদ্য উৎপাদন করিতে প্রস্তুত হইবে। নচেৎ খাদ্য পাইবার নৈতিক অধিকার তাহার নাই, কারণ ভূমিতে পরিশ্রম না করিলে খাদ্য উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। ঐ একই কারণে ভূমি পাইবার অধিকার তখনই কোন ব্যক্তির হইতে পারে যখন সে নিজ হাতে চাষ করিতে প্রস্তুত থাকে। নচেৎ এ অধিকার দাবি করিবার নৈতিক অধিকার

তাহার নাই।

এই ভূমিক্ষুধা মিটিবে কিরূপে? সাধারণভাবে এরূপ মনে করা হয় যে ভূদানযজ্ঞের ভিত্তিতে অহিংস সমাজ-রচনার কল্পনা এখন স্থগিত রাখা হউক। তাড়াতাড়ি ভূমির পুনর্বণ্টন হওয়া আবশ্যক এবং একমাত্র আইনের পথেই তাহা সম্ভব। এরূপ মনোভাবের কারণ এই যে, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর এ দেশের লোকের মন নিতান্ত শাসনাভিমুখী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে দেশের বর্তমান অবস্থায় আইনের দ্বারা ভূমি-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হওয়া সম্ভব নহে। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, একমাত্র হিংসার পথে ভূমি-সমস্যার দ্রুততর সমাধান হওয়া সম্ভব। পরের আলোচনায় ইহাও বুঝিতে পারা যাইবে যে, এ দেশের বর্তমান অবস্থায় তাহাও সম্ভব নহে। শান্তি ও প্রেমের পথ একমাত্র পথ যাহাতে এদেশের ভূমি-সমস্যার সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক সমাধান হইতে পারে। ভূদানযজ্ঞ শান্তি ও প্রেমের পথে এই ভূমিক্ষুধা তৃপ্ত করিবার ভারতব্যাপী প্রচেষ্টা। সকলের হৃদয়ে ভগবান বিরাজমান। ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন—মানুষের হৃদয়স্থিত সেই ভগবানের কাছে প্রেমপূর্ণ আকুল আবেদন। "ভূমিতে সকলের সমান অধিকার। সে-অধিকার হইতে যে বঞ্চিত, সে আজ ধূলায় লুণ্ঠিত—সে আজ সর্বহারা। সে ক্ষুধার জ্বালায় মরিতেছে। তাহার জীবিকা অর্জনের অন্য কোন উপায় নাই। তাহার সে-হৃত অধিকার তাহাকে প্রত্যর্পণ কর। তাহার প্রাপ্য ভূমি তাহাকে ফিরাইয়া দাও। ভূমির মালিক ভগবান। ভূমি সকলের মাতা। সকলেই ভূমির সন্তান। কিন্তু তুমি নিজেকে ভূমির মালিক বলিয়া গণ্য করিতেছ। মাতাকে দাসী করিয়াছ। আজ সেই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার দিন আসিয়াছে। ভূমির মালিকানা বিসর্জন দেওয়ার দীক্ষা গ্রহণ কর। সন্তানকে ভূমিমাতার বুক হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। মায়ের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ও বঞ্চিত সন্তানের উষ্ণ অশ্রুজল দেশের আবহাওয়াকে, উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। কেহই শান্তি পাইতেছে না। মাকে বঞ্চিত সন্তানের কাছে ফিরাইয়া দাও। শান্তি ফিরিয়া আসিবে। ধনীর কল্যাণ হইবে, দরিদ্রের কল্যাণ হইবে এবং দেশেরও কল্যাণ হইবে। মানুষের অন্তরস্থিত সুপ্ত ভগবান! তুমি আজ

জাগ্রত হও, তুমি প্রসন্ন হও। জ্ঞাতসারে হউক আর অজ্ঞাতসারে হউক, যে-অন্যায় ভূমিহীন দরিদ্রের প্রতি যুগ-যুগ ধরিয়া করা হইয়াছে, আজ তাহার প্রতিকার হউক। বঞ্চিতের ভগবান আজ জাগ্রত।"

ভূদানযজ্ঞের সফলতায় আশংকা

এই আবেদনে কি মানুষ সাড়া দিবে? যে-জগতে মানুষ পাঁচ কাঠা ভূমিও অন্যকে এমনি দেয় না, পাঁচ কাঠা ভূমি লইয়াও লোকে যেখানে মারামারি কাটাকাটি করে—হাইকোর্ট-সুপ্রীমকোর্ট পর্যন্ত লড়াই করে সেখানে মানুষ কি এইরূপ আবেদনে স্বেচ্ছায় সাড়া দিবে? ভারতের কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ৩০ কোটী একর। ইহার এক-ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ ৫ কোটী একর, ভূমি যদি আজ যাহাদের হাতে ভূমি আছে, তাহাদের হাত হইতে ভূমিহীন দরিদ্রের হাতে আসিয়া যায় তবেই ভূমি-সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এত বড় বিরাট সমস্যার সমাধান কিভাবে হওয়া সম্ভব?

গত ১৯৫২ সালের মে মাসে ২৪-পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী হটুগঞ্জ গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ ভূদানযজ্ঞ সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চিমবঙ্গে ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের প্রবর্তন করা হয়। উহার অব্যবহিত পরে ভূদানযজ্ঞের বাণী প্রচার ও ভূদান সংগ্রহ করিবার জন্য ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় লেখক পদব্রজে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করেন। একদিন বৈকালে এক গ্রামে ভূদানযজ্ঞ বিষয়ে বক্তৃতা দিবার সময় জনসভায় উপস্থিত সেই অঞ্চলের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লেখককে বলিলেন—"দেখুন, এই আন্দোলন পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নহে। জমি পাইতে হইলে আইন করিয়া লইতে হইবে—নচেৎ বলপ্রয়োগ করিয়া লইতে হইবে। জমি চাহিলে লোকে স্বেচ্ছায় জমি দিবে—এ আশা করা পাগলামি ছাড়া আর কি হইতে পারে? বিনোবাজী এক পাগল, আর তাঁহার পিছনে আপনারা কিছু পাগল জুটিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্র, আমাদের মহাভারত এই শিক্ষা দান করিয়াছে যে—বিনা লড়াই-এ কেহ কাহাকেও ভূমি ছাড়িয়া দেয় না—শান্তির পথে কেহ ভূমি প্রত্যর্পণ করে না।" লেখক উহার উত্তরে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"আমি কিন্তু মহাভারত হইতে ইহার বিপরীত শিক্ষালাভ করিয়াছি।

পাণ্ডবদের ন্যায্য ভূমি কৌরবেরা ফেরৎ দিলেন না। শান্তির পথে সূচ্যগ্র ভূমিও দিলেন না। লড়াই বাধিল। তদানীন্তন ভারতবর্ষে যেখানে যত রাজা ছিলেন, তাঁহারা হয় পাণ্ডব পক্ষে না হয় কৌরব পক্ষে যোগদান করিলেন। কৌরবরা সকলে নিহত হইলেন, পাণ্ডবদের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ হইল। কুলে বাতি দিবার মত কয়েকজন মাত্র জীবিত রহিলেন। এতদূর মর্মান্তিক পরিণতি ঘটিল। মহাভারত এ সম্পর্কে যদি কোনো শিক্ষা দিয়া থাকে, তবে তাহা হইতেছে এই যে, যাহার প্রাপ্য ভূমি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়, নচেৎ সর্বনাশ অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী।"

কিন্তু তথাপি মন হইতে সংশয় দূরীভূত হয় না। এইরূপ বলা হয় যে, ইতিহাসে ইহার নজীর নাই। যাহা ইতিপূর্বে কখনও সংঘটিত হয় নাই, তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে?---এইরূপ আপত্তি বা আশঙ্কার কোন কারণ নাই। ইতিহাসে কোন্ বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়? যাহা কখনও ঘটে নাই তাহা সংঘটিত হইলে তবেই তাহা ইতিহাসে স্থানলাভ করে। যাহা ঘটিয়াছে বা ঘটিয়া থাকে, তাহা তো ইতিহাসই নহে। ফরাসী-বিপ্লব সংঘটিত হইবার পূর্বে ইতিহাসে কি তাহার কোন নজীর ছিল? নিঃশস্ত্র সংগ্রাম করিয়া ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্বে কি কখনও ইতিহাসে ঐরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল? অতএব এই আশঙ্কা ভিত্তিহীন। তথাপি মন সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত হয় না। ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের উৎপত্তি, বিকাশ ও অদ্যাবধি পরিণতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এবং ভূদানযজ্ঞের অন্তর্নিহিত ভাবধারা হৃদয়ঙ্গম করিলে এই সংশয় দূরীভূত হইবে আশা করা যায়।

কে এই বিনোবা?

ভূদানযজ্ঞের স্রষ্টা ও প্রবর্তক আচার্য বিনোবা ভাবে। কে এই বিনোবা? তিনি আজীবন সেবাব্রতী সন্ন্যাসী, মহাত্মা গান্ধীর পরম অনুগামী, গান্ধী-মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম ধারক ও বাহক। তাঁহাকে মহাত্মা গান্ধীর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী বলা হয়। সেই উত্তরাধিকারীই যোগ্য উত্তরাধিকারী যিনি পিতৃপুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন এবং সেই শিষ্যই যোগ্য শিষ্য যিনি গুরুকে ছাড়াইয়া যাইতে সক্ষম হন। সেই

অর্থে বিনোবা মহাত্মা গান্ধীর আধ্যাত্মিক যোগ্য উত্তরাধিকারী ও যোগ্য শিষ্য। তিনি এই যুগের যুগপুরুষ। স্বাধীনতালাভের পর ভারতে রামরাজ্য বা 'সর্বোদয়' প্রতিষ্ঠা করা মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা-প্রাপ্তির অল্পদিনের মধ্যে তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিতে পারেন এমন কোন মহাপুরুষ তখন দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। তাই দেশ হতাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বিনোবা বহুদিন যাবৎ একান্ত সাধনায় লীন হইয়া ছিলেন। সেই একান্তবাস ত্যাগ করিয়া বিনোবা বাহির হইয়া আসিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার আলোক-ছটায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অল্পদিনের মধ্যেই দেশের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে এক নবীন জাগৃতি আসিল। আজ সারা ভারত আশাভরা দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। বর্তমানে সারা জগৎ শান্তি-পিপাসু। তাই জগতের অন্যান্য দেশও অতীব আগ্রহে তাঁহার মুখ-নিঃসৃত শান্তির বাণী শুনিতেছে—তৃষ্ণার্ত যেমন পিপাসা শান্তির জন্য জল গ্রহণ করে। ১৯৪০ সালে শ্রীমহাদেব দেশাই বিনোবা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"লোকে আজ নহে—কয়েক বৎসর পরে বিনোবার প্রভাব বুঝিতে পারিবে।" তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রের (বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত) কোলাবা জেলার গাগোদা গ্রামে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে চিৎপাবন ব্রাহ্মণকুলে বিনোবার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নরহরি ভাবে ও মাতা রুক্মিণী দেবী বা রখুমাঈ। পিতামহ শম্ভুরাও ভাবে।

বিনোবার পিতামহ শম্ভুরাও উদার, ধর্মপরায়ণ ও তেজস্বীপুরুষ ছিলেন। তখনকার দিনেও তিনি অস্পৃশ্যতা মানিতেন না। সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবও তাঁহার ছিল না। কোনও নিন্দাকে গ্রাহ্য না করিয়া একবার এক মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞকে তিনি পাটেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট হইতে ভজন শুনিয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রায়ন ব্রত পালন করিতেন। ইহা অতি কঠোর ব্রত। শম্ভুরাওয়ের তিন পুত্র—নরহরি, গোপালরাও ও গোবিন্দ। জ্যেষ্ঠপুত্র নরহরি বুদ্ধিমান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি কলেজের পড়া ছাড়িয়া দিয়া বয়ন-শিল্প সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বরোদার

এক কারখানায় কাজ করিতেন।

নরহরের প্রথম সন্তান বিনোবা। বিনোবার পুরা নাম—বিনায়ক নরহর ভাবে। বাড়ীতে তাঁহার ডাক-নাম ছিল 'বিন্যা'। মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে আসার পর হইতে গান্ধীজীর দেওয়া নাম হইয়াছিল—বিনোবা। বিনোবার তিন ভ্রাতা—বালকৃষ্ণ, শিবাজী ও দত্তাত্রেয়। এক ভগিনী শান্তা। কিশোর বয়সে কনিষ্ঠ ভ্রাতা দত্তাত্রেয়ের মৃত্যু হয়। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে ভগিনী শান্তারও মৃত্যু হয়। বিনোবা গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমে যোগদান করার পর ভ্রাতা বালকৃষ্ণ ও শিবাজী জ্যেষ্ঠভ্রাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তথায় চলিয়া আসেন এবং আশ্রমের কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। বালকৃষ্ণ (বালকোবা) এক্ষণে মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত উরুলিকাঞ্চন প্রাকৃতিক চিকিৎসালয় কেন্দ্রের দায়িত্ব লইয়া আছেন। শিবাজী একজন বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও সন্ত-সাহিত্যের প্রগাঢ় পণ্ডিত। ভারতের লিপি-সংশোধনের কাজে তিনি ব্যাপৃত আছেন।

বিনোবার বাল্যকাল পাহাড় পরিবেষ্টিত গাগোদা গ্রামে অতিবাহিত হয়। পিতামহের ধর্মনিষ্ঠা, ভক্তিভাব ও তেজস্বিতা বিনোবার সুকুমার মনে গভীর ছাপ অঙ্কিত করিয়া দেয়। তাঁহার মাতা পরম ধর্ম-পরায়ণা ও পরম ভক্তিমতী রমণী ছিলেন। তাঁহার হৃদয় উচ্চ ও উদার ছিল। মাতা ছিলেন বিনোবার শ্রেষ্ঠ গুরু। তিনি তাঁহার মাতার নিকট হইতে অনেক কিছু পাইয়াছেন। মা কোন গহনা পরিতেন না। যতই ঠাণ্ডা পড়ুক না কেন তিনি প্রত্যহ ভোরে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতেন। তাঁহার পিতার নিকট হইতে শেখা বহু মারাঠী-ভজন তাঁহার মুখস্থ ছিল। রান্না করিবার সময়ও তিনি গুন-গুন সুরে ভজন গাহিতেন। এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, তরকারীতে দুইবার লবণ দিলেন কি আদৌ দিলেন না তাহা খেয়াল থাকিত না। পুত্র বিনোবাও তন্ময় হইয়া মায়ের ভজন শুনিতেন। ধর্মভাব বিকাশের জন্য মা পুত্র-বিনোবাকে সাধু-সন্তদের কাহিনী শুনাইতেন। উহা হইতেই ধর্মগ্রন্থ পাঠের প্রতি বিনোবার মনে প্রবল আগ্রহ জন্মে। মার নির্দেশে বিনোবাকে খাওয়ার পূর্বে তুলসীগাছে জল দিতে হইত এবং ঐরূপে মা পুত্রকে শিখাইতেন যে, অন্যকে না খাওয়াইয়া নিজে খাইতে নাই—এমন

কি বৃক্ষ-জগৎকেও না খাওয়াইয়া নিজে খাইতে নাই। মা পুত্রকে সঙ্গে লইয়া শিব-মন্দিরে গিয়া শিবের মস্তকে জলাভিষেক দেখাইতেন এবং তদ্দ্বারা বিনোবাকে শিখাইতেন যে, বিন্দু বিন্দু ঝরিয়া নিরন্তর যে অভিষেক হইতেছে উহাই সাধনার নিদর্শন। বাল্তিভরা জল একসঙ্গে ঢালিয়া দিলে তাহাতে অভিষেক তথা সাধনা হয় না। নিতান্ত বাল্যকাল হইতেই বিনোবার মনের গতি ভোজন-সুখের প্রতি বীতরাগ ছিল। মা-ও তাঁহাকে শিখাইতেন যে, জিনিসের প্রতি 'আরও চাই'-রূপ আকাঙ্ক্ষা করিলে তাহাতে সুখ পাওয়া যায় না। একমাত্র সংযমের দ্বারাই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়। মা একবার পুত্রকে আম কিনিয়া খাইবার জন্য পয়সা দিয়াছিলেন। কিন্তু বিনোবা আম খাইতেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং পরে একদিন সেই পয়সা মাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মা ছিলেন উদার ও সমদর্শী। তাঁহাদের বাড়ীতে এক আশ্রিত অন্ধ থাকিতেন। বিনোবা প্রভৃতি তাঁহাকে 'অন্ধ-কাকা' বলিয়া ডাকিতেন। মা আশ্রিতের প্রতি এমন উদার ব্যবহার করিতেন যে, তিনি যে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেহ নন তাহা বিনোবা প্রভৃতি তাঁহার জীবিতকাল পর্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই। 'অন্ধ-কাকা'র মৃত্যুর পর যখন বাড়ীতে অশৌচ পালন করা হইল না তখন তাঁহারা মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেহ নহেন।

মায়ের স্বভাব ছিল সত্যিকারের সেবিকার। কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে অসুখ হইলে মা তাহাদের বাড়ীতে গিয়া রান্না করিয়া দিয়া আসিতেন। একবার মা নিজেদের রান্না শেষ করিয়া পরে অন্য এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে রান্না করিতে যাইতেন বলিয়া বিনোবার মনে সন্দেহ হইল যে মায়ের মনে হয়ত কিছু স্বার্থপরতার ভাব থাকিবে। কিন্তু মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, উহাতে কোনরূপ স্বার্থপরতা নাই বরং পরার্থপরতা রহিয়াছে। কারণ অন্যের বাড়ীতে পরে রান্না হয় বলিয়া সেই বাড়ীর লোক গরম-গরম খাইতে পান। বাড়ীতে সবল সুস্থ ভিক্ষুক আসিলে মা তাহাকেও বিমুখ করিতেন না। কিন্তু বিনোবা ভাবিতেন যে, কার্যক্ষম, সবল সুস্থ ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিলে অন্যায় করা হয়, আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। একদিন বিনোবা মাকে একথা বলেন। কিন্তু মায়ের নিকট হইতে তিনি যে

শুনেন তাহা খণ্ডন করিবার মত যুক্তি বিনোবা আজ পর্যন্তও খুঁজিয়া পান নাই। "ভিক্ষা করিবার জন্য যে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায় সে তো ভিক্ষুক নয়—সে যে সাক্ষাৎ ভগবান। ভগবানকে কি অপাত্র ভাবিতে আছে?" মা-র এইসব মহৎ আচরণ দেখিয়া বিনোবার তরুণ মনে সমভাব ও ভক্তির বীজ উপ্ত হইয়াছিল।

ধর্মগ্রন্থ পাঠের প্রভাব এবং মায়ের সরল সহজ পরিশুদ্ধ জীবনের ঘনিষ্ঠতম সাহচর্য বিনোবার তরুণ মনকে সাধনার দিকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। ক্রমে-ক্রমে বিনোবা কঠোর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মা একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "বিন্যা, গৃহস্থাশ্রম-ধর্ম ঠিকমত পালন করিতে পারিলে এক পুরুষ উদ্ধার হয়, কিন্তু উত্তম ব্রহ্মচর্য পালন করিতে পারিলে সাত পুরুষ উদ্ধার হয়।" এরূপে মা পুত্রের হৃদয়কে ব্রহ্মচর্য পালনের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। তখন বিনোবার বয়স মাত্র দশ বৎসর। তৎপূর্বে রামদাস স্বামীর "দাসবোধ" নামক পুস্তক পড়িয়াও তাঁহার মন ব্রহ্মচর্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। মাতার আশীর্বাদ পাইয়া ঐ দশ বৎসর বয়স্ক বালক আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিবার সংকল্প গ্রহণ করিলেন।

এহেন পিতামহ! এহেন মাতা! সহজাত বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস প্রবৃত্তি লইয়া যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার এইরূপ কুলেই জন্ম হইবার কথা।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১১ বৎসর বয়সে বিনোবা মা-র সঙ্গে তাঁহার পিতার কর্মস্থল বরোদায় আসিলেন এবং বিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম হইতে বিনোবা কুশাগ্রবুদ্ধি ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ। সম্প্রতি তিনি নিজে একস্থানে বলিয়াছেন যে, একসময়ে তাঁহার বিশ-পঁচিশ হাজার শ্লোক কণ্ঠস্থ থাকিত। বাল্যকাল হইতেই তিনি অতীব অধ্যয়নশীল ছিলেন। বিনোবা ১৩।১৪ বৎসর বয়সের মধ্যেই বরোদা সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সমস্ত পুস্তক পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহা খুবই আশ্চর্যের কথা। কারণ বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী তখনকার দিনে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরী ছিল। যখন লাইব্রেরীতে আর কোনও পুস্তক পড়িতে বাকি থাকিল না তখন তিনি সাথীদের সহযোগিতায় "বিদ্যার্থী-

মণ্ডল" নামে এক অধ্যয়ন-সংস্থা সৃষ্টি করিলেন। নানাস্থান হইতে ১৬০০ পুস্তক সংগ্রহ করা হইল। উহার প্রত্যেক পুস্তকই সেই সেই বিষয়ের শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া পরিগণিত ছিল। বিনোবার বেড়াইবার খুব সখ ছিল। একসঙ্গে ৫।৭ মাইল বেড়াইলে তাঁহার কিছুই মনে হইত না। কোন-কোন দিন বেলা ১২টার সময় তাঁহার বেড়াইবার ঝোঁক আসিত। সাথীরা মুস্কিলে পড়িয়া যাইতেন। কিন্তু তাঁহারা না যাইয়া পারিতেন না। বক্তৃতা দিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। যখন তিনি বলিতে আরম্ভ করিতেন তখন তাঁহার বক্তৃতা অখণ্ড প্রবাহের মত চলিতে থাকিত। সদর রাস্তায় দাঁড়াইয়া সাথীদের সঙ্গে যখন আলোচনাক্রমে বক্তৃতা দিতে থাকিতেন তখন রাস্তায় ভীড় জমিয়া যাইত।

বিনোবা স্কুলে সর্বদাই প্রথম হইতেন। মারাঠী-ভাষায় বালককাল হইতেই তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। সংস্কৃতে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা। কিন্তু প্রথমে পিতার আদেশে সংস্কৃত ছাড়িয়া তাঁহাকে ফরাসী-ভাষা লইতে হইয়াছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করা তাঁহার পক্ষে কিছু কঠিন ছিল না। কিন্তু এজন্য তিনি কোন চেষ্টা করিলেন না। কারণ তাঁহার মনের গতি ছিল অন্যদিকে। ১৯১৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া তিনি কলেজে ভর্তি হন। গণিত তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় ছিল। গণিতে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতার খ্যাতি ছাত্র ও বিদ্যার্থী মহলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমশ সাধারণ শিক্ষার প্রতি ও গতানুগতিক জীবনযাত্রার প্রতি তিনি বীতরাগ হইয়া আসিতেছিলেন। স্কুলে পড়িবার সময়ও তাঁহার কঠোর জীবনযাপন চলিতেছিল।—চাটাইয়ের উপর শুইতেন এবং বালিশ ব্যবহার করিতেন না। কলেজ-জীবনেও ঐরূপ চলিতে থাকিল। অন্যদিকে স্কুলে পড়িবার সময়ই তাঁহার মন রাষ্ট্রীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তখন স্বদেশী-আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গের যুগ। কলেজে পড়িবার সময় তাঁহার মন ক্রমশ বাংলার বিপ্লবী দলের কার্যকলাপের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। এরূপে তাঁহার মন দুইদিকে ঝুঁকিতেছিল—(১) আধ্যাত্মিকতা ও (২) দেশের স্বাধীনতালাভ। এই দুইভাবে ভাবিত হইয়া মনে মনে তিনি পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া গৃহত্যাগ করিবার সঙ্কল্প

করিলেন। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বে একদিন তিনি উনানের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সার্টিফিকেটগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে থাকেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন তিনি ঐরূপ করিতেছেন। তিনি বলিলেন—"আমি আর পড়াশুনা করিব না এবং কোনদিন চাকুরীও করিব না। তাই সার্টিফিকেটগুলি পোড়াইয়া ফেলিতেছি।" মা বলিলেন—"সার্টিফিকেট-গুলি রাখিয়া দিলে কখনও কোন কাজে লাগিয়া যাইত।" বিনোবা তাহার উত্তরে বলিলেন, "যদি এগুলি রাখিয়া দিই তবে কোনদিন হয়তো ইহার বন্ধনে পতিত হইব। তাই ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দড়ি কাটিয়া ফেলাই ঠিক।" কিরূপ দৃঢ় সংকল্প লইয়া যে তিনি কোন কার্যে ব্রতী হন ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি বোম্বাই রওনা হইলেন। তাহা হইল ১৯১৫ সাল। তখন তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর। কিন্তু বোম্বাইয়ে না গিয়া তিনি কাশী চলিয়া আসিলেন এবং পথ হইতে বাড়ীতে পত্র লিখিয়া তাঁহার গৃহত্যাগের কথা জানাইয়া দিলেন।

কাশী আসিয়া তিনি ভালভাবে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং কাশীর বিখ্যাত মুর সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে গভীরভাবে ধর্মগ্রন্থ পাঠে মগ্ন হইলেন। ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আসন, প্রাণায়ামাদিও করিতে লাগিলেন। ২ ঘণ্টা করিয়া ছাত্র পড়াইয়া তিনি মাসে ২৲ টাকা উপার্জন করিতেন এবং ঐ ২৲ টাকায় তাঁহাকে জীবনযাপন করিতে হইত। তাই ৩ দিন অন্তর তিনি একদিন খাইতেন এবং তাঁহার খাদ্য ছিল—দই ও রাঙা আলু। দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন—ব্রহ্ম ও বিপ্লবের সন্ধান। বিপ্লবের জন্য তাঁহার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ আর ব্রহ্মের জন্য হিমালয়। কাশীতে তিনি বাংলার বিপ্লবীদের সন্ধান পাইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা বলিয়া তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি সেই সময় কাশী হইতে হিমালয়েও গিয়াছিলেন এবং হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

তখন ১৯১৬ সাল। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ঘাটন সমারোহ উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী কাশী আসিয়াছিলেন এবং ঐ সমারোহে এক অতি প্রভাবশালী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সংবাদপত্রে উহা

পাঠ করিয়া অন্য আরও অনেকের মত বিনোবাও খুবই প্রভাবিত হন। তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন এবং পরে পত্র লিখিয়া ঐ সম্পর্কে তাঁহার কয়েকটি জিজ্ঞাস্য বিষয় জানিতে চাহেন। গান্ধীজী এক পত্রের উত্তরে সাক্ষাৎভাবে আলোচনা করিবার জন্য বিনোবাকে আশ্রমে আহ্বান করেন। তখনও মহাত্মা গান্ধীর আশ্রম সবরমতীতে যায় নাই। উহা তখন আমেদাবাদের কৌচরব এলাকায় ছিল। বিনোবাজী সেখানে গিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

আশ্রমের সহজ সরল জীবনযাত্রা, কথায় ও কাজে অভেদভাব, দেশ-ভক্তি এবং ত্যাগ ও তপস্যার জীবন দেখিয়া বিনোবা বিশেষভাবে অভিভূত হন। যে-উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন সেই বিপ্লব ও আধ্যাত্মিকতা এই উভয়ের সমাবেশ তিনি মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে দেখিতে পান। অতঃপর মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমে তিনি আশ্রমে যোগদান করেন।

আশ্রমে যোগদান করায় বিনোবাজীর জীবনধারা নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হইবার সুযোগ পাইল এবং মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় পরিচালক পাইয়া তিনি ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন। তিনি আশ্রমে জড়-ভরতের ন্যায় পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। জল তোলা, সাফাই করা, রান্না করা, সুতাকাটা ও বস্ত্র-বয়ন প্রভৃতি আশ্রমের যাবতীয় কাজে তিনি অংশ গ্রহণ করিতেন। অধিক পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। স্বাস্থ্যোদ্ধার ও সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ পাঠের উদ্দেশ্যে তিনি এক বৎসরের জন্য ছুটি লইলেন এবং ওয়াই নামক স্বাস্থ্যকর স্থানে আসিয়া নারায়ণ শাস্ত্রী মারাঠী নামক একজন আজন্ম ব্রহ্মচারী পণ্ডিতের নিকট উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্র ও শঙ্কর-ভাষ্য, মনুস্মৃতি, পাতঞ্জল, যোগ-দর্শন, বৈশেষিক দর্শন ও যাজ্ঞবল্ক-স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। উপরন্তু তিনি বহু শিক্ষার্থীকে গীতা অধ্যয়ন করান। এরূপে তিনি সংস্কৃতে ও ধর্মশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। নিজের জীবনকে আশ্রমের আদর্শ অনুসারে আরও সুদৃঢ়ভাবে গঠন করিয়া তুলিবার জন্য ঐ প্রবাসেও তিনি কঠোর শৃঙ্খলার সহিত জীবনযাপন করিতে থাকেন। প্রবাস হইতে তিনি মহাত্মা গান্ধীকে এক দীর্ঘ পত্রে তাঁহার কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ দেন এবং লেখেন যে, তিনি মহাত্মা গান্ধীকে পিতৃস্বরূপ

মনে করেন। ঐ পত্র পাইয়া মহাত্মা গান্ধীর মনে হয় যে, পুত্র পিতাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে। তিনি খুশী হইয়া মন্তব্য করেন—"ভীম হ্যায় ভীম।" যেদিন এক বৎসর পূর্ণ হয় ঠিক সেইদিন সেই সময়ে বিনোবা চুপচাপ আশ্রমে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। এইরূপ তাঁহার নিয়মনিষ্ঠা ও সত্যনিষ্ঠা! কিছুদিন পরে আশ্রমে পায়খানা সাফাইয়ের কাজ সুরু হয়। বিনোবাজী সর্বাগ্রে ঐ কাজ গ্রহণ করেন এবং অবিরত তিনমাসকাল অতিশয় নিষ্ঠা ও তন্ময়তার সঙ্গে ঐ কাজ করেন। কিছুদিন তিনি গুজরাট বিদ্যাপীঠে অধ্যাপনা এবং আশ্রমে ব্যবস্থাপকের কাজও করেন।

বরোদায় ১৯১৮ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীরূপে দেখা দেয়। বিনোবার মা ঐ মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। মা মৃত্যুশয্যায়। সংবাদ পাইয়া বিনোবা আশ্রম হইতে আসিয়া মায়ের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকিয়া এবং বহুদিন পরে প্রিয়তম পুত্রের সহিত শেষবারের মত মিলিত হইয়াও মা বলিয়াছিলেন—"কাজকর্ম ফেলিয়া কেন চলিয়া আসিলে?" ধন্য মাতা! মা চলিয়া গেলেন। বিনোবা শ্মশানের ব্রাহ্মণদের দ্বারা মায়ের মুখাগ্নি ক্রিয়া করাইতে রাজী হইলেন না। তিনি মায়ের শবানুগমনও করিলেন না, মায়ের আত্মার শান্তির জন্য গীতা-উপনিষদ পাঠ করিতে থাকিলেন।

১৯২১ সালে শেঠ যমুনালাল বাজাজের অনুরোধক্রমে মহাত্মা গান্ধী বিনোবাকে ওয়ার্ধায় সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পাঠান। প্রথম হইতেই যমুনালালজীর সবরমতী আশ্রমে যাতায়াত ছিল। তাঁহার তীব্র ইচ্ছা ছিল যে, মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্ধায় আসিয়া আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। এখন বিনোবাকে পাইয়া তিনি ধন্য হইলেন। বিনোবা তথায় আশ্রম স্থাপন করিলেন। তখন হইতে ওয়ার্ধার সমস্ত গঠনমূলক কর্ম-প্রচেষ্টা বিনোবাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতে থাকে। সবরমতী আশ্রমে তিনি ছিলেন একজন মৌন-সাধক। ওয়ার্ধায় তিনি হইলেন আশ্রম-পরিচালক। আশ্রমের উদ্দেশ্য ছিল অহিংসাব্রতী জীবনব্যাপী দেশসেবক সৃষ্টি করা। সেই উদ্দেশ্যে আশ্রমবাসীদিগের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

গভীর চিন্তার পর তিনি আশ্রমবাসীদিগের পক্ষে পালনীয় একাদশ ব্রত স্থির করিয়া উহা শ্লোকবদ্ধ করেন। আশ্রমের প্রাতঃকাল ও সান্ধ্যকালীন প্রার্থনায় উহার আবৃত্তি চলিতে লাগিল এবং তদনুসারে আশ্রম-বাসীদিগের জীবনগঠনের প্রযত্নও চলিতে লাগিল। একাদশ ব্রত এই—সত্য, অহিংসা, অস্তেয় (অচৌর্য) ব্রহ্মচর্য, অসংগ্রহ, শরীর-শ্রম, অস্বাদ, অভয়, সর্বধর্মে সমভাব ও অস্পৃশ্যতা পরিহার।

ওয়ার্ধায় যমুনালালজী ও তাঁহার পরিবারের সকলের সহিত বিনোবার অত্যন্ত আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। যমুনালালজী তাঁহাকে আধ্যাত্মিক গুরুরূপে গ্রহণ করেন। বিনোবার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রভাবে যমুনালালজীর জীবন উত্তরোত্তর ত্যাগশীল হইতে থাকে। যমুনালালজীর পুত্র কমলনয়ন ও কন্যা মদালসার শিক্ষা এবং জীবনগঠনের কাজ বিনোবাজী নিজহস্তে গ্রহণ করেন। ঐ সময়ের এক ঘটনা বিনোবার জীবনের গভীরতম অন্তস্তলে আলোক-সম্পাত করে। বিনোবা তাঁহার পত্রগুলি পাওয়ামাত্র একবার পড়িয়া লইয়া তখনকার মত রাখিয়া দিতেন এবং বহুপত্র জমা হইলে একদিন একসঙ্গে সবগুলির উত্তর পাঠাইয়া ঐগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। একদিন তিনি একখানি পত্র পাইয়া উহা পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ইহা কমলনয়নের কাছে আশ্চর্য লাগিল। তিনি পত্রের ছিন্ন-খণ্ডগুলি কুড়াইয়া ও গুছাইয়া লইয়া দেখিলেন যে, উহা মহাত্মা গান্ধীর একটি পত্র এবং তাহাতে লেখা আছে—'তুম্ সে বড়্‌কর্ উচ্চ আত্মা মেরী জানকারী মে নহী হ্যায়।'—অর্থাৎ তোমার চেয়ে উচ্চাত্মা কেউ আছে বলিয়া আমার জানা নাই। বাপুর এত বড় প্রশংসা-পত্র আর তাহার এই অবস্থা! কমলনয়ন সবিস্ময়ে বিনোবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন কেন?" বিনোবা সহজভাবে উত্তর দিলেন—"ইহা আমার কাজে লাগিবে না। তাই ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।" কমলনয়ন বলিল—"ইহা তো রাখিয়া দিবার মত জিনিস!" বিনোবা পুনরায় সহজভাবে উত্তর দিলেন—"যাহা আমার কোন কাজে লাগিবে না তাহা কেন ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিব? বাপু নিজের মহত্ত্বে আমাকে ঐরূপ ভাবিয়াছেন। আমার দোষগুলি তো তিনি দেখেন নাই?" এই সহজ কথাকয়টিতে সমগ্র বিনোবা ফুটিয়া উঠে। বিনোবা কিরূপ

অন্তর্মুখ এবং তাঁহার প্রকৃতি কত গভীর আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ—ইহা তাহার এক নিদর্শন। বিনোবা যে কত উচ্চস্তরের অপরিগ্রহী তাহার একটি দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পূর্বে তিনি পুস্তকের উপর নিজের নাম লিখিতেন। পরে তাঁহার মনে এই ভাব আসিল—পুস্তকের উপর নিজের নাম লিখিব কেন? পুস্তক তো সম্পত্তি। পুস্তক পড়া হইয়া যাইবার পর উহা সংগ্রহ করিয়া রাখাও পরিগ্রহ। নিজের বই পড়া হইয়া যাইবার পর অন্যকেহ উহা পড়িবার জন্য লইতে চাহিলে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত।—তৎক্ষণাৎ তিনি বইয়ের উপর নাম লেখার অভ্যাস পরিত্যাগ করেন। এমন কি ১৯১৮ সালে তিনি যখন নিজের বোঝা মাথায় লইয়া পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন তখনও নূতন পুস্তক লইবার আবশ্যক হইলে পুরাতন পুস্তকগুলি অন্যকে দিয়া বোঝা হাল্‌কা করিয়া লইতেন।

১৯২৩ সালে বিনোবাজী ওয়ার্ধার আশ্রম হইতে নাগপুর যাইয়া পতাকা-সত্যাগ্রহে যোগদান করেন এবং তাহাতে তাঁহার কয়েক মাসের জেল হয়। জেল হইতে বাহির হইবার পর—১৯২৪ সালের প্রারম্ভে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে তিনি কেরলের অন্তর্গত ভাইকম সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব করেন। সেখানকার সনাতনী ব্রাহ্মণগণ মন্দিরের আশেপাশের রাস্তা দিয়াও হরিজনদের চলিতে দিতেন না। কিছুকাল সত্যাগ্রহের পর সরকার-পক্ষ ও সনাতনীরা নতি স্বীকার করেন। বিনোবাজী আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় মৌন-সাধনায় রত হইলেন। বিনোবা ১৯৩০ সালের লবণ-সত্যাগ্রহে যোগদান করেন এবং দুর্বল শরীর সত্ত্বেও স্বয়ং তালগাছ কাটার কাজ করিতে থাকেন। ১৯৩২ সালের আন্দোলনে তিনি ধুলিয়া প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দেন এবং গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন। সে-সময় তিনি ধুলিয়া জেলে ছিলেন এবং শেঠ যমুনালাল বাজাজ, প্যারেলালজী প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। জেলে তাঁহারা একসঙ্গে সুতা কাটিতেন, একসঙ্গে গম পিষিতেন এবং এক-সঙ্গে বসিয়া বহু বিষয়ের চর্চা করিতেন। জেলও আশ্রমে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। ধুলিয়া জেলে বিনোবাজীর সর্বাপেক্ষা বড় কাজ হইয়াছিল—গীতা সম্বন্ধে ভাষণ দান। ১৮টি রবিবারে তিনি গীতার ১৮টি অধ্যায়ের

অপূর্ব ব্যাখ্যা করেন। উহাই পরে পুস্তকাকারে ‘গীতা-প্রবচন’ নামে সারা ভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তখন বিনোবাজীর বয়স ছিল মাত্র ৩৭ বৎসর। এই বয়সেই আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি কত উচ্চস্তরে উঠিয়াছিলেন তাহা গীতা-প্রবচন পাঠ করিলে বুঝা যায়। গীতা-প্রবচন মূল মারাঠী হইতে প্রায় ভারতীয় ভাষাতেই অনূদিত হইয়াছে এবং লক্ষাধিক কপি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। উহার বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। গীতা-প্রবচন একটি অপূর্ব গ্রন্থ। তিনি উহাতে গীতার আধারে এক পূর্ণ জীবন-দর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যিনি উহা শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করিবেন তাঁহার জীবন সেবা, ত্যাগ ও ভগবানের অভিমুখী না হইয়া যায় না। ভূদানযজ্ঞ আরম্ভ হইবার বিশ বৎসর পূর্বে ঐসব প্রবচন দেওয়া হইয়াছিল। অথচ উহা অধ্যয়ন করিলে ভূদানযজ্ঞের ভাবধারাও সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং উহাতে অংশ গ্রহণ করিতে প্রেরণা আসে।

বাল্যকালে গাগোদা থাকিবার সময় মাতা রুক্মিণী দেবীর গীতা পড়িবার তীব্র ইচ্ছা হয়। মারাঠী-অনুবাদে গদ্য বা পদ্য যাহা পাওয়া গেল তাহা এত কঠিন যে উহা পড়িয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তখন তিনি সহজ সরল-ভাবে বিনোবাকে গীতার পদ্যানুবাদ করিয়া দিতে বলিলেন। পুত্রের উপর মাতার এতই গভীর বিশ্বাস ছিল। পুত্রের উপর মাতার এই গভীর বিশ্বাসই বিনোবার জীবনে অশেষ শক্তিদান করিয়াছে। যাহা হউক, মায়ের জীবদ্দশায় বিনোবা মাতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ১৯৩২ সালে তিনি গীতা-শ্লোকের অনুরূপ ছন্দে গীতার এক অপূর্ব ‘সমশ্লোকী’ মারাঠী-অনুবাদ রচনা করেন। তিনি উহার নাম দেন ‘গীতাঈ’। মারাঠী-ভাষায় ‘আঈ’ শব্দের অর্থ ‘মা’ সুতরাং ‘গীতাঈ’ অর্থাৎ গীতা-মা। গীতা বিনোবার জীবনে একমাত্র পথপ্রদর্শক। তিনি গীতার শিক্ষা অনুসারে নিজের জীবন গঠন করিয়াছেন। তাই গীতা তাঁহার কাছে মাতৃ-স্বরূপ। বিনোবা তাঁহার ‘বিচার-পোথী’ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

“যখন আমি গীতার অর্থ বুঝিতে শিখিলাম তখন মা চলিয়া গিয়াছেন। আমার এরূপ মনে হইল মা যেন আমাকে গীতা-মার ক্রোড়ে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছেন। গীতা-মা, আমি আজও তোর দুধে পালিত

হইতেছি এবং ভবিষ্যতেও তুই আমার আধার হইয়া থাকিবি।" 'গীতাঈ' মহারাষ্ট্রে এত জনপ্রিয় হইয়াছে যে, উহার লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

ধুলিয়া জেলে থাকার সময় বিনোবাজী গ্রাম-সংগঠনের কাজ করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন। জেল হইতে বাহির হইয়া তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গ্রামবাসীদের সুতাকাটা, সাফাই প্রভৃতির কাজে দীক্ষিত করিতে থাকেন। ওয়ার্ধার মগনওয়াদিতে প্রথমে সত্যাগ্রহ-আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল। অতঃপর উহা বাজাজওয়াদিতে শেঠ যমুনালালজীর 'ঘাসের বাংলা' নামক বাংলোতে স্থানান্তরিত হয়। বাংলোতে আশ্রমের উপযোগী সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া তোলা সম্ভব হইতেছিল না। তাই ১৯৩৩ সালের প্রথম ভাগে ওয়ার্ধা হইতে ২ মাইল দূরে নলওয়াদিতে গ্রাম-সংগঠনের কাজের উপযোগী করিয়া নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া 'গ্রাম-সেবা-মণ্ডল' স্থাপন করা হয় এবং সেখানে গ্রামসেবার কাজ ব্যবস্থিতভাবে আরম্ভ হয়। ২ লক্ষ লোক অধ্যুষিত ওয়ার্ধা-অঞ্চলকে ছয় ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক এলাকার দায়িত্ব এক-একজন আশ্রমবাসীর উপর দেওয়া হয়। কর্মীরা দুই সপ্তাহ অন্তর অন্তর গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কেন্দ্রে ফিরিতেন, কাজের বিবরণ দিতেন এবং পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিতেন। পরের দিনই আবার গ্রামে চলিয়া যাইতেন। সুতা-কাটার কাজে বিনোবা নিজে বহুরকমের পরীক্ষাকার্য চালাইয়াছেন। সুতা-কাটাতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি তকলীকাটার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতাকাটাকে ব্যাপকতর করিবার জন্য তিনি তুনাইয়ের নূতন পদ্ধতি বাহির করিয়া তাহা প্রয়োগ করেন এবং উহা সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। নিজের হাতে তুলার বীজ ছাড়াইয়া তিনি নিজেই তুলা ধুনিতেন। কাপড়-বুনার কাজও করিতেন। প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করিয়া তিনি এই সব কাজ করিতেন। সুতাকাটার আর্থিক বুনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ছয় মাস সুতা কাটিয়া যাহা আয় হইত তাহাতেই জীবন চালাইতেন। এই সমস্ত কাজে তিনি এমন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন যাহা ভারতবর্ষে আর কেহ করিতে পারেন নাই। সুতাকাটাকে মৌলিক হস্তশিল্পরূপে গণ্য করিয়া তিনি ঐ বিষয়ে এক মৌলিক পুস্তকও

লিখিয়াছেন।

ভবিষ্যৎ জীবনে যিনি সর্বোদয়ের ঋষি হইবেন তিনি গোড়া হইতেই কিরূপ ধাতুতে গঠিত ছিলেন তাহা তাঁহার তরুণ বয়সের একটি ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। ১৯২৮ সালের কথা। তখন তিনি ওয়ার্ধা-আশ্রমে। আমের মরসুম। একদিন বাজার হইতে তিনি এক ঝুড়ি ছোট দেশী আম ছয় আনায় খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন। দুইদিন পরে তিনি আবার বাজারে গেলেন এবং যে-বৃদ্ধার নিকট হইতে পূর্বে আম খরিদ করিয়াছিলেন তাহাকে ঐ দিনও আম বিক্রয় করিতে দেখিলেন। কিন্তু ঐ দিন বৃদ্ধা এক ঝুড়ি আম দুই আনায় দিতে চাহিল। এত কম দাম কেন তাহা বিনোবা জানিতে চাহিলেন। বৃদ্ধা বলিল—পূর্বদিন ঝড়ে বহু আম পড়িয়াছে, তাই বাজারে প্রচুর আম আসিয়াছে। কিন্তু খরিদ্দার বেশী নাই বলিয়া দাম এত কম। বিনোবা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এক ঝুড়ি আমের জন্য পূর্বের মত গতকালও তাহার একই পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল কিনা। বৃদ্ধা উত্তর দিল—'হাঁ।' তিনি বলিলেন—'তবে কম দাম লইবে কেন?' এই বলিয়া তিনি এক ঝুড়ি আম লইয়া ছয় আনা পয়সা তাহাকে দিয়া গেলেন।

১৯৩৬ সালে মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্ধার নিকটে সেবাগ্রাম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময় গ্রামোদ্যোগ সংঘের সৃষ্টি হয় এবং খাদি ছাড়া অন্যান্য গ্রামোদ্যোগের প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। তখন হইতে নলওয়াদি আশ্রমে বিভিন্ন শিল্পের কাজ আরম্ভ হয়। সবরমতী আশ্রমের মহিলাকর্মিগণ ওয়ার্ধায় চলিয়া আসিবার পর তাঁহাদের জন্য সেখানে একটি মহিলাশ্রম স্থাপনা করা হয়। আশ্রমের ভার মহাত্মা গান্ধী বিনোবার হাতে অর্পণ করেন। বিনোবার পরিচালনাধীনে আশ্রমের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ১৯৩৬ হইতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর ওয়ার্ধা জেলার গঠন-কর্মীদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হইত। তাহাতে কয়েকদিন ধরিয়া বিভিন্ন গঠনমূলক কার্য সম্পর্কে শিক্ষাপ্রদ আলোচনা হইত। বিনোবাজী উহার নাম দিয়াছিলেন "খাদিযাত্রা"। অন্য ধর্মের প্রতি সম-শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিবার জন্য তিনি আরবী-ভাষা শিক্ষা করেন এবং মূল আরবীতে 'কোরাণশরীফ' গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। কোরাণ সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান

অগাধ। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা বা নঈ-তালিমের ব্যবস্থা সংগঠনাদি কাজে তিনি অনেক সহায়তা করিয়াছেন। কুষ্ঠ-সেবার কাজ তাঁহার অতি প্রিয় কাজ। তাঁহার একজন কর্মীকে এই কাজের জন্য গড়িয়া তুলিয়া তাঁহাকে তিনি কুষ্ঠ সেবাশ্রমের কাজে দিয়াছেন।

নলওয়াদি আশ্রমে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ১৯৩৮ সালে বিনোবাজীর স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙিয়া পড়ে। মহাত্মা গান্ধী তাহাতে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বাস করিতে অনুরোধ করেন। বিনোবাজী বাহিরে যাইতে চাহিলেন না। নলওয়াদীর ৪ মাইল দূরে পওনার নদীতীরে যমুলালজীর এক বাংলো ছিল। বিনোবা সেখানে আসিয়া আশ্রম স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে ধান নদী আর পওনার নদী মিলিত হইয়াছে এবং বাংলোটি ধাম নদীর অপর পারে বলিয়া তিনি আশ্রমটির নামকরণ করেন—'পরমধাম'।

যাহাতে কেহ অর্থ বা লোক দিয়া যুদ্ধে সাহায্য না করে তাহার জন্য গত মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪০ সালের শেষ ভাগে মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। উক্ত সত্যাগ্রহে মহাত্মা গান্ধী বিনোবাজীকে প্রথম সত্যাগ্রহীরূপে মনোনীত করিলেন। সারা ভারত চমকিত হইয়া ইহা শুনিল এবং তখন হইতে তাঁহার নাম ও সুযশ সর্বত্র প্রচারিত হইতে থাকিলে। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের দরুণ প্রথমে তাঁহার তিনমাস জেল হয়। জেল হইতে মুক্ত হইবার পর আবার তিনি সত্যাগ্রহ করেন এবং পুনরায় তাঁহার জেল হয়। এরূপে ঐ আন্দোলনের দেড় বৎসরের মধ্যে তিনি তিন-বার গ্রেপ্তার হন এবং তিনবার জেলে যান।

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মত তাঁহাকেও 'পরমধাম'-আশ্রম হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া অজ্ঞাত স্থানে রাখা হয় এবং আশ্রম বাজেয়াপ্ত করা হয়। এক বৎসর তাঁহাকে মাদ্রাজের ভেলোর জেলে রাখা হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহাকে মধ্যপ্রদেশের সিউনী জেলে রাখা হয়। ভেলোর জেলে থাকাকালীন তিনি তেলেগু, কানাড়ী, তামিল, মলয়ালম প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। বিভিন্ন ভাষা-রচনার তুলনামূলক পদ্ধতি তিনি বাল্যকাল হইতেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এজন্য

তিনি যে-কোন ভাষা অতি সহজেই শিখিয়া লইতে পারেন। তিনি ভারতের প্রায় সব-কয়টি প্রাদেশিক ভাষাই শিখিয়া লইয়াছেন। তন্মধ্যে বাংলা অন্যতম।

নোয়াখালীর বীভৎস সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি প্রশমন করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী যখন সেখানে পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন বিনোবাজী পওনারে তাঁহার 'পরমধাম'-আশ্রমে গ্রাম-সেবার সাধনায় নীরবে মগ্ন ছিলেন। অনেকে তাঁহাকে নোয়াখালী যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আদেশ ব্যতীত তিনি আশ্রম ছাড়িয়া এক পা-ও নাড়িলেন না। তাঁহার শৃঙ্খলাবোধ এমনি দৃঢ়তম।

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী চলিয়া গেলেন। উহার দেড়মাস পরে সেবাগ্রামে সারা ভারতের গান্ধী-আদর্শে বিশ্বাসী গঠনকর্মীদের এক সম্মেলন হইল। গান্ধীজীর স্বপ্নের 'সর্বোদয়' প্রতিষ্ঠার জন্য 'সর্বোদয় সমাজ' ও 'সর্ব-সেবা সংঘের সৃষ্টি হইল। গান্ধী-কর্মের বিরাট দায়িত্ব বিনোবাজীর উপর বর্তাইল। পরম নম্রতা-সহকারে তিনি তাহা তুলিয়া লইলেন এবং আশ্রমের নীরবতা হইতে বহির্জগতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

মহাত্মা গান্ধী-পরিকল্পিত শান্তি-প্রতিষ্ঠার কাজ তখনও অসমাপ্ত। শরণার্থীদের সমস্যা এক বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। তিনি দিল্লী আসিয়া শরণার্থীদের সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। শিবিরে শিবিরে গিয়া শরণার্থীদিগকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শিবিরে শিবিরে চরকা, যাঁতা প্রভৃতির প্রবর্তন করা হইল। মেও-দের সমস্যা সব চাইতে জটিল ছিল। মেও-রা দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমান কৃষক-সম্প্রদায়। পাকিস্তান হওয়ার সংগে সংগে উৎসাহবশে তাহারা পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেখানে সুবিধা না হওয়ায় তাহারা আবার ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইতিমধ্যে তাহাদের বাড়ীঘর, জমি-জায়গা হিন্দু-শরণার্থিগণ অধিকার করিয়া বসিয়া গিয়াছিল। বিনোবাজী এই শক্ত কঠিন কাজ হাতে লইলেন এবং বহু পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে মেও-দের ঘরবাড়ী ও জমি কিছু ফিরাইয়া দিতে ও কিছু বদলে দেওয়াইতে সক্ষম

হইলেন। সাম্প্রদায়িক শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিকানীর, আজমীর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন এবং তৎ-তৎ স্থানে তাঁহার নৈতিক প্রভাবে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি হয়।

অতঃপর তিনি 'পরমধাম'-আশ্রমে আসিয়া পুনরায় নীরব সাধনায় মগ্ন হন। উৎপাদক কায়িক-শ্রম ও স্বাবলম্বন সর্বোদয় প্রতিষ্ঠার মূল-কথা। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ঐ আদর্শ উপলব্ধি না করিয়া জন-সাধারণকে সর্বোদয় শিক্ষা দিবার জন্য অগ্রসর হওয়া বিড়ম্বনামাত্র। এরূপ ভাবনায় ভাবিত হইয়া বিনোবাজী ও তাঁহার আশ্রমের সাথীরা পরমধাম আশ্রমে 'কাঞ্চনমুক্তি-যোগ' সাধনায় ব্রতী হন। কাঞ্চনমুক্তি-যোগ কি?

কাঞ্চনমুক্তি-যোগ

অর্থ ও শ্রম—এই দুই শক্তি জগতে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। উৎপাদক শ্রমকে ছাড়িয়া লোকে অর্থের উপর অধিকাধিকভাবে নির্ভরশীল হওয়ায় জগতে যত অনর্থ ঘটিতেছে। অতীত সমাজে এমন এক সময় ও অবস্থার কল্পনা করা যায় যখন সকলেই দ্রোহরহিত উৎপাদক শ্রমে রত থাকিত এবং নিজ নিজ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নিজ শ্রমে উৎপাদন করিয়া লইত। সেই অবস্থায় সমাজে কেহ একেবারে নিঃস্ব থাকিত না। আবার কেহ অধিক ধনবানও হইতে পারিত না। সকলে সমান সংগতিসম্পন্ন না হউক বৈষম্য অধিক থাকিত না ও থাকিতে পারিত না। কিন্তু বহুলোক উৎপাদক শ্রম ত্যাগ করাতেই এত ধন-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সংকট অবস্থায় পতিত ব্যক্তির অসহায় অবস্থার সুযোগে মানুষ অন্যকে নিজের প্রয়োজনে নিযুক্ত রাখিবার সুবিধা পাইল এবং নিজে উৎপাদক শ্রম ত্যাগ করিয়া আরাম ভোগ করিতে প্রলুব্ধ হইল। তাই তাহার হাতে ভূমি ও উৎপাদনের অন্যান্য সাধন যথা উৎপাদনের যন্ত্রাদি, পুঞ্জীভূত ও কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। এরূপে ক্রমশঃ বৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়া উহা ব্যাপকতর ও গভীরতর হইতে থাকিল। অর্থের সাহায্যে মানুষ অন্যের শ্রমকে খরিদ ও নিয়োগ করিতে সুবিধা পাইল। অর্থ দিয়া অন্যের শ্রমার্জিত দ্রব্যাদি খরিদ করিবারও সুবিধা হইল। তাই অর্থ ধন-বৈষম্যের সৃষ্টি ও বৃদ্ধির প্রধান হাতিয়ার-রূপে ক্রিয়া

করিয়া আসিতেছে। তাই শ্রমের হাত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য লোকে অর্থ সঞ্চয়ে ব্যস্ত থাকে। জগতে কতিপয়ের হাতে ও অনুৎপাদকের হাতে যে ভূমি ও উৎপাদনের অন্যান্য সাধন কেন্দ্রীভূত হইতেছে উহার মূলগত কারণও তাহাই। তাই বর্তমান যুগে শ্রম তথা শ্রমিকের মর্যাদা নষ্ট হইয়াছে এবং অর্থের উপর মিথ্যা গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। উৎপাদক শ্রমকে তাহার মহান্ সম্মানের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য দূর করা যাইবে না এবং সমভাবে সকলের মঙ্গলসাধন করাও সম্ভব হইবে না। বিনোবাজী বলেন—"বর্তমানের বিকারগ্রস্ত সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক জিনিসের মূল্যে পয়সায় নির্ধারিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে জিনিসের প্রকৃত মূল্য নজরে আসে না। এরূপ বলা হয় যে, এখানে জমি খুব দুর্মূল্য কিন্তু কার্যতঃ উদারতার দিক হইতে জমি সেই একরূপই হইয়া আছে। গত পরশু বক্সারের গেজেটিয়ারে পড়িলাম যে, দেড়শত বৎসর পূর্বে সেখানে এক সের গম এক পয়সায় বিক্রয় হইত, আজ সেই স্থলে এক সের গম দশ আনায় বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু তখন এক সের গমে যতটা পেট ভরিত এবং যতটা পুষ্টি হইত, আজও তাহাই হইতেছে। কিন্তু আজ পয়সার মায়াজালে পড়িয়া মরুভূমিকে জলাশয় বলিয়া মানিয়া লইয়াছি।" তিনি আরও বলেন, "লোকের হৃদয় শুদ্ধ আছে। যদি কিছু বিগড়াইয়া থাকে তবে তাহা হইতেছে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। উৎপাদনের সহিত পয়সার এবং শ্রমের সহিত পয়সার কোন নির্দিষ্ট সম্পর্ক থাকিতেছে না। পয়সা সদা-সর্বদা নিজের কথা পরিবর্তন করিতেছে। কখনও উহা এক টাকা বলে, কখনও দুই টাকা আবার কখনও চার টাকা বলে। পয়সা বদমাইস ও দুশ্চরিত্র। তাহাকে আমাদের কারবারী করিয়াছি। বদমাইসের কাছেই আমরা আমাদের চাবি রাখিয়াছি।" তাই বিনোবাজী কয়েকদিন উপবাসী থাকিয়া ভগবানের নামে সংকল্প গ্রহণ করেন যে, তিনি আর অর্থ গ্রহণ করিবেন না। অর্থ-বর্জনের সংকল্প লইয়া বিনোবাজী ও তাঁহার সহকর্মি-গণ পরমধাম-আশ্রমে কায়িক শ্রমের দ্বারা নিজেদের প্রয়োজনীয় সবকিছু উৎপাদন করিতে রত থাকেন। তিনি আশ্রমে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। যদি কেহ সাহায্য দিতে চাহিতেন, তবে তিনি মাত্র নিজের কায়িক

শ্রমের দ্বারা সাহায্য দিতে পারিতেন। এই আদর্শ অনুসরণ সর্বোদয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তিনি ইহারই নাম দিয়াছেন—"কাঞ্চনমুক্তি-যোগ"। সর্বোদয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে 'কাঞ্চনমুক্তি-যোগ' সাধন অপরিহার্য।

সর্বোদয়দর্শন ও সর্বোদয় সমাজের প্রতিষ্ঠা

অহিংসার পথে দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন চলিতেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন অহিংস-সমাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনাও মহাত্মা গান্ধী সেই সময়েই করিয়াছিলেন। এবং উহার প্রস্তুতির জন্য তিনি ১৮ দফা সংগঠন কার্যের ব্যবস্থা করেন। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে উহার সহিত অবিভাজ্য ও অভিন্নভাবে উক্ত সংগঠন কর্মপ্রচেষ্টা দেশের বিভিন্ন স্থানে অল্পাধিকভাবে চলিতেছিল। উক্ত গঠনকর্ম তালিকা এইরূপ ঃ—(১) হিন্দু-মুসলমান বা সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা, (২) অস্পৃশ্যতা বর্জন, (৩) মাদকতা বর্জন, (৪) খাদি, (৫) অন্যান্য গ্রাম্যশিল্প, (৬) গ্রামের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, (৭) নূতন বুনিয়াদী শিক্ষা, (৮) পূর্ণবয়স্কদের শিক্ষা, (৯) স্ত্রী-জাতির উন্নয়ন, (১০) স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কীয় শিক্ষা, (১১) রাষ্ট্রভাষা প্রচার, (১২) মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধার অনুশীলন, (১৩) অর্থনৈতিক সাম্যপ্রতিষ্ঠা-কল্পে প্রচেষ্টা, (১৪) কংগ্রেস সংগঠন (স্বাধীনতা-যুদ্ধের জন্য জাতীয় রাজ-নৈতিক সংস্থা সংগঠন), (১৫) কৃষক সংগঠন, (১৬) শ্রমিক সংগঠন, (১৭) ছাত্র সংগঠন ও (১৮) কুষ্ঠরোগী সেবা ও কুষ্ঠরোগ প্রতিকার। অবস্থাভেদে ও প্রয়োজনানুসারে এই তালিকা বৃদ্ধি কবা যাইতে পারে।

রাস্কিনের ইংরেজী গ্রন্থ "আন্‌টু দি লাষ্ট"-এর যে অনুবাদ মহাত্মা গান্ধী করিয়াছিলেন তিনি উহার নাম দিয়াছিলেন "সর্বোদয়"। উক্ত অনুবাদের ভূমিকায় তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন—"আধুনিক সংস্কৃতি এবং উহার উপর আধারিত যে সমাজব্যবস্থা তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক লোকের যথাসাধ্য অধিক পরিমাণ সুখবিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রধান সিদ্ধান্ত হইতে সহজেই এই উপসিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, যথাসম্ভব অধিক লোকের যথাসম্ভব অধিক সুখের ব্যবস্থা

যদি করিতে হয় তবে কিছু লোক যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদের দুঃখ-কষ্ট ঘটিলে কোন ক্ষতি নাই। দশজন লোকের মধ্যে নয়জন লোকের সুখের ব্যবস্থার সময় অবশিষ্ট এক ব্যক্তির জন্য চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। শুধু ইহাই নহে, বরং উহার অনিষ্ট করা বা নাশ করা বিধেয়। এরূপ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গঠিত সমাজব্যবস্থায় বিরোধ, ঝগড়া এবং অবশেষে ধ্বংস যে অপরিহার্য হয় ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। কারণ এই সমাজব্যবস্থায় যে বলবান হয় সে এরূপ মনে করে যে, দুর্বলের নাশ হউক এবং তাহার নাশ-সধানের জন্য সে চেষ্টাও করিতে থাকে। কিন্তু দুর্বল ইহা চাহে না যে, বলবানের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার নাশ হউক। দুর্বল হউক, তাহাতে কি? পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে, যে চাহিবে তাহার মৃত্যু হউক অথবা সে না থাকুক। প্রত্যেকেই ইহা চাহে যে, সে থাকুক। কেন না এই 'থাকা' বা 'অস্তিত্বের' মধ্যে মানুষ একপ্রকারের আনন্দ বা সুখ অনুভব করে। অতএব সংঘর্ষ ও সর্বনাশের প্রতিকারকল্পে সমাজে সকলেই শান্তি ও সন্তোষ লাভ করিবে—এমন সমাজ যদি রচনা করিতে হয় তবে ইহা সুস্পষ্ট যে, 'যথাসম্ভব অধিক লোকের অধিকতম সুখবিধান'—এই নীতির পরিবর্তে 'সকলেরই সর্বপ্রকারের কল্যাণসাধনের' সিদ্ধান্তের আধার সমাজজীবনকে দেওয়া আবশ্যক। 'সকলেরই হিতসাধন' জীবনের তত্ত্বজ্ঞান হওয়া চাই।" এই তত্ত্বজ্ঞান অহিংস সমাজরচনার মূলে রহিয়াছে। তাই মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত অহিংস সমাজব্যবস্থার নাম দেওয়া হইয়াছে "সর্বোদয়"। ভারতের প্রাচীন মুনিঋষিগণ সমাজব্যবস্থার এই আদর্শই প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং উহাকে এক সুন্দর কথায় প্রকাশ করিয়াছেন—"সর্বে সুখিনঃ সন্তু" (সকলেই সুখী হউক)।

রাস্কিনের উপরোক্ত "আন্ টু দিস্ লাষ্ট" নামক গ্রন্থের ভিত্তি হইতেছে বাইবেলে বর্ণিত (St. Mathews Ch. 20) "Unto this Last" নামক নীতিমূলক গল্পটি (parable)। উহা এইরূপঃ—এক ব্যক্তি কতিপয় শ্রমিককে তাঁহার আঙুর ক্ষেতে এক পেনি করিয়া মজুরী দিবার চুক্তিতে কাজ করিবার জন্য পাঠাইলেন। সেসময় সেখানে শ্রমিকের দৈনিক মজুরীর হার ছিল এক পেনি। ঐ ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের সময় শ্রমিকদের আড্ডায় গিয়া দেখেন

যে, কিছু লোক সেখানে বেকার আছে। তিনি তাহাদিগকেও তাঁহার ক্ষেতে কাজ করিতে পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে আশ্বাস দিলেন যে তাহারা পুরা মজুরী পাইবে। বৈকালে আবার যখন তিনি সেখানে গেলেন তখন আরও কয়েকজন বেকার শ্রমিককে তিনি দেখিতে পাইলেন। তাহাদিগকেও তিনি তাঁহার ক্ষেতে কাজ করিতে পাঠাইলেন। সন্ধ্যার সময় যখন আবার তিনি সেখানে গেলেন তখন আরও কয়েকজন বেকারকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ বেকার শ্রমিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা এখানে বেকার বসিয়া রহিয়াছ কেন?" শ্রমিকরা উত্তর দিল—"আমাদিগকে কেহ কাজে লয় নাই।" তিনি বলিলেন—"তোমরাও আমার আঙুর ক্ষেতে কাজ করিতে চল। পুরা মজুরী পাইবে।" যখন রাত্রি হইল তখন ক্ষেতের মালিক তাঁহার সহকারীকে বলিলেন, "সকল শ্রমিককে ডাকিয়া প্রত্যেককে পুরা মজুরী দাও এবং সব চাইতে শেষে যাহারা আসিয়াছে তাহাদিগকে প্রথমে দিয়া সুরু কর।" সকলের শেষে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা যখন এক পেনি করিয়া পাইল তখন প্রথমে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা মনে করিল যে তাহাদিগকে তদপেক্ষা অধিক মজুরী দেওয়া হইবে। কিন্তু যখন তাহাদিগকেও এক পেনি করিয়াই দেওয়া হইল তখন তাহাদের মধ্যে অভিযোগের সুরে কাণাকাণি আরম্ভ হইল। অবশেষে তাহারা মালিককে বলিল—'যাহারা সর্বশেষে আসিয়াছে তাহারা মাত্র এক ঘণ্টা করিয়া কাজ করিয়াছে আর আমরা সারাদিন রৌদ্রে পুড়িয়া পুড়িয়া কাজ করিয়াছি। অথচ আমাদিগকে তাহাদেরই সমান মজুরী দেওয়া হইল।"

ক্ষেতের মালিক উত্তর দিলেন—"আমি তোমাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করি নাই। তোমাদের সহিত এক পেনি করিয়া চুক্তি ছিল। তোমরা চুক্তিমত এক পেনি করিয়া পাইয়াছ। এখন তোমরা ঘরে যাইতে পার। তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি ঠিক তাহাই সকলের শেষে যে আসিয়াছে তাহাকেও দিব।" ("Friend, I do thee no wrong. Dist not thou agree with me for a penny? Take that thine is. And go thy way. I will give unto this last even as unto thee".) ইহার মূলগত নীতি হইতেছে 'প্রত্যেকের নিকট হইতে তাহার সামর্থ্য

অনুযায়ী গ্রহণীয় এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী দেয়' (From each according to his capacity, and to each according to his need.)—ইহাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের নীতি। তাই এই নীতির ভিত্তিতে রচিত রাস্কিনের অমূল্য "আন্ টু দিস্ লাষ্ট" গ্রন্থ পাঠ করিয়া মহাত্মা গান্ধী তাঁহার হৃদয়ে সর্বোদয়ের প্রথম প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন এবং উহা তাঁহার জীবনযাত্রার প্রণালীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে বিনোবাজীর প্রেরণায় সারা ভারতের গঠনমূলক কর্মীরা সেবাগ্রামে মিলিত হন এবং যাহাতে সর্বোদয়ের কাজ সফলভাবে অগ্রসর হয় সেই উদ্দেশ্যে "সর্বোদয়-সমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বৎসর এক এক প্রদেশে সর্বোদয়-সমাজের বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সালে এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে হায়দ্রাবাদের নিকটবর্তী শিবরামপল্লী গ্রামে তৃতীয় বার্ষিক "সর্বোদয় সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়।

তেলঙ্গানার পরিস্থিতি ও বিনোবাজীর তেলঙ্গানা যাত্রা

ঐ সময় হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত তেলঙ্গানায় ভূমি-সমস্যা লইয়া হিংস্র হাঙ্গামা চলিতেছিল। কমিউনিষ্টদের হাতে বহু ভূম্যধিকারী নিহত হইয়াছিল। ভূম্যধিকারীদের নিকট হইতে বহু জমি কাড়িয়া লইয়া কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অন্যদিকে তাহাদিগকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া আবার সেই জমি তাহাদের হস্তচ্যুত করা হইতেছিল। সরকার সশস্ত্র উপায়ে হাঙ্গামা দমনের চেষ্টা করিতেছিলেন। উভয় পক্ষেই হানাহানি কাটাকাটি চলিতেছিল। সেখানে ভীতি, আতঙ্ক, হত্যা ও অগ্নিসংযোগের পালা চলিতেছিল। উভয় পক্ষের দ্বারা জনসাধারণ পীড়িত, লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হইতেছিল। দিবসে সশস্ত্র পুলিশের জুলুম—কমিউনিষ্ট বা কমিউনিষ্টদের সহায়তাকারী সন্দেহে পুলিশের হাতে লাঞ্ছনা। রাত্রে জমিদার-জোতদারের সমর্থক বা পুলিশের সহায়ক সন্দেহে কমিউনিষ্টদের অত্যাচার। দুই দিকের অত্যাচারে লোকে পাগলপ্রায় হইয়া গিয়াছিল।

বিনোবাজীর শরীর অসুস্থ ছিল। সেজন্য শিবরামপল্লী সর্বোদয় সম্মেলনে যাওয়ার অভিপ্রায় তাঁহার তেমন ছিল না। তৎপূর্ব বৎসর উড়িষ্যার অংগুলে নামক স্থানে সর্বোদয় সম্মেলন হইয়াছিল। সেখানেও তাঁহার যাওয়া হয় নাই। শ্রীশংকররাও দেওজী তাঁহাকে বলিলেন—"যদি আপনি শিবরামপল্লী সম্মেলনে না যান তবে সকলের সেখানে গিয়া সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না।" শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও বিনোবাজী শিবরামপল্লী যাইতে সম্মত হইলেন এবং পদব্রজে যাইবেন স্থির করিলেন। ৮ই মার্চ রওনা হইয়া ৩০০ মাইল হাঁটিয়া তিনি সেখানে পৌঁছিলেন। শিবরামপল্লীর সর্বোদয় সম্মেলনে সমবেত সর্বোদয় আদর্শে বিশ্বাসী কর্মী-দের মনে তেলংগানার ঘটনাবলী গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। অহিংস-পন্থায় বিশ্বাসী কর্মীদের নিকট তেলংগানা এক চ্যালেঞ্জ-স্বরূপ পরিগণিত হইল। শান্তি ও প্রেমের পথে দেশের ভূমি-সমস্যা তথা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে শুধু মুখে অহিংসার কথা বলা নিষ্ফল।

মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর হইতে বিনোবাজী অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অহিংসা প্রয়োগের পথ অন্বেষণ করিতেছিলেন। এক শান্তি সৈনিকের ভূমিকায় তিনি তেলংগানায় ভ্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি সর্বোদয়-সমাজের সেবক। সর্বোদয়ের নাম আমার কাছে ভগবানের সমান। সর্বোদয় বলিতে সবাইকে বুঝায়; অতএব কমিউ-নিষ্টরাও আমার চিন্তার বহির্ভূত নহে।" তাই প্রথমেই তিনি হায়দ্রাবাদ জেলে আটক কমিউনিষ্ট বন্দীদের সহিত জেলে গিয়া সাক্ষাৎ করেন এবং দুই-তিন ঘণ্টাকাল তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা বলেন। তিনি বলেন—"কমিউনিষ্ট ভাইদের বিচারধারা কি তাহা জানিবার ও বুঝিবার জন্য আমি জেলে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।" অতঃপর ১৬ই এপ্রিল তেলংগানা ভ্রমণের জন্য তিনি কয়েকজন কর্মীসহ আবার পদব্রজে রওনা হইলেন। তেলংগানা ভ্রমণের সংকল্পের পশ্চাতে যে-পটভূমিকা তাঁহার মনে ছিল এবং কেন তিনি পদব্রজে ভ্রমণের সংকল্প করেন সে-সম্পর্কে তেলংগানা ভ্রমণকালীন ১৯৫১ সালের ২৬শে মে তারিখে বারংগল (হায়দ্রাবাদ) নামক স্থানে তিনি তাঁহার প্রবচনে বলেন—"গান্ধীজীর তিরোভাবের পর

চিন্তা করিতেছিলাম—এখন আমার কি করা আবশ্যক। আমি উদ্বাস্তু-দের সেবাকার্যে লাগিয়া গেলাম। কিন্তু এখানের (তেলংগানার) কমিউনিস্ট-দের সম্পর্কে আমি বরাবর চিন্তা করিতেছিলাম। এখানকার হত্যা ইত্যাদি ঘটনা সম্পর্কে আমি সব সংবাদ পাইতেছিলাম। তাহা সত্ত্বেও আমার অন্তরে কোনরূপ নিরুৎসাহের ভাব আসে নাই। কেননা মানবজীবনের বিকাশের ধারা সম্পর্কে কিছু বোধ আমার আছে। তাই আমি বলিতেছি—যে-যে সময় মানবজীবন নূতন সংস্কৃতি লাভ করে, সেই-সেই সময়ে কিছু-কিছু সংঘর্ষ ঘটিয়া থাকে, রক্তের ধারাও বহিয়া যায়। এইজন্য নিরুৎসাহিত না হইয়া শান্তমনে চিন্তা করিতে হইবে এবং শান্তিপূর্ণ পথের সন্ধান করিতে হইবে।

"এখানে শান্তিস্থাপনের জন্য সরকার পুলিশ পাঠাইয়াছেন। কিন্তু পুলিশ বিচারক নহে। পুলিশ শস্ত্রধারী এবং অস্ত্রবলই তাহার একমাত্র উপায়। তাই জংগলে ব্যাঘ্রের উপদ্রব প্রতিকারের জন্য পুলিশকে পাঠানো উচিত এবং পুলিশ ব্যাঘ্র শিকার করিয়া আমাদিগকে ব্যাঘ্রের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু কমিউনিস্টদের উপদ্রব ব্যাঘ্রের উপদ্রব নহে—উহা মানুষের উপদ্রব। উহাদের কার্যপন্থা যতই ভ্রান্ত হউক না কেন উহাদের জীবনে কিছু-না-কিছু বিচারধারা আছে। সেক্ষেত্রে মাত্র পুলিশ পাঠাইয়া প্রতিকার হওয়া সম্ভব নহে। সরকারের একথা অজানা নাই। তাহা সত্ত্বেও নিজের কর্তব্য বিবেচনা করিয়া সরকার পলিশ পাঠাইয়াছেন। সেজন্য আমি সরকারকে দোষ দিতেছি না।

"আমি এইভাবে বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে ভাবিতেছিলাম। তাহাতে আমার মনে এই কল্পনার উদয় হইল যে, "আমি এই অঞ্চলে ভ্রমণ করিব। কিন্তু ভ্রমণ যদি করিতে হয় তবে কিভাবে ভ্রমণ করিব? মোটর প্রভৃতি যান বিচার-শোধক নহে, উহা সময়-সাধক—দূরত্ব ঘুচাইতে পারে মাত্র। যেখানে চিন্তাধারার শোধন করিতে হইবে সেখানে শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। পুরাকালে তো উষ্ট্র, ঘোটক ইত্যাদি ছিল। লোকে উহার বব্যহার করিত এবং এক রাত্রির মধ্যে দুইশত মাইল পর্যন্ত পথ অতিক্রম করিত। শংকরাচার্য, মহাবীর, বুদ্ধ, কবীর, নামদেব প্রভৃতি ভারত

ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং পদব্রজেই ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দ্রুতগামী যানের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। কারণ বিচারধারা সংশোধন করা তাঁহাদের কাম্য ছিল এবং চিন্তাধারা শোধনের জন্য উত্তম উপায়--পদব্রজে ভ্রমণ করা। বর্তমান কালে পদব্রজে ভ্রমণ আদৌ পছন্দ হয় না। কিন্তু যদি শান্তিপূর্বক চিন্তা করা যায় তবে বুঝিতে পারা যাইবে যে পদব্রজে ভ্রমণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।"

ভূদানযজ্ঞের উদ্‌গম

দুইদিন পরে ১৮ই এপ্রিল তারিখে বিনোবাজী নলগুণ্ডা জেলার অন্তর্গত পচমপল্লী গ্রামে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে দণ্ডকারণ্যের আরম্ভ। গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে সাদরে ও সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করিলেন। নলগুণ্ডা ও ওয়ারঙ্গল জেলা কমিউনিষ্ট উপদ্রবের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং পচমপল্লী গ্রামকে কমিউনিস্টদের কেন্দ্র বলা হইত। সেই অঞ্চলে দুই বৎসরের মধ্যে ২০ জন লোককে হত্যা করা হইয়াছিল। ঐ গ্রামে ১০।১২ জন কমিউ-নিষ্ট থাকিতেন। গ্রামে কমবেশী তিন হাজার লোকের বাস এবং আবাদ-যোগ্য জমির পরিমাণ ২৷৷০ হাজার একর। তথাপি তিন হাজার লোকের মধ্যে দুই হাজার লোকই ভূমিহীন ছিল। পৌঁছিবার দুইঘণ্টা পরে বিনোবাজী গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন। তিনি হরিজন-পল্লী দেখিতে গেলেন। হরিজনেরা অত্যন্ত গরীব। তাহাদের জমি তো ছিলই না, তাহারা পুরা কাজ পাইত না এবং পেট ভরিয়া খাইতেও পাইত না। ভূমিবানদের জমিতে মজুর খাটিত আর মজুরী বাবদ তাহারা উৎপন্ন ফসলের কুড়ি ভাগের এক ভাগ, কম্বল ও একজোড়া করিয়া জুতা পাইত। বিনোবাকে দেখিয়া তাহারা মনে করিল যে সম্ভবত মহাত্মা গান্ধীর মত একজন মহাপুরুষ আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট অভাবের কথা জানাইলে হয়তো একটা ব্যবস্থা হইতে পারে ভাবিয়া তাহারা বিনোবাজীর নিকট জমি চাহিল। তাহাদের কত জমি আবশ্যক বিনোবা জানিতে চাহিলেন। তাহারা বলিল ৪০ একর নীচু জমি ও ৪০ একর উঁচু জমি মোট ৮০ একর জমি পাইলে তাহাদের চলিয়া যাইবে। বিনোবাজী জানিতে চাহিলেন জমি পাইলে তাহারা মিলিতভাবে আবাদ

করিবে না পৃথক-পৃথকভাবে আবাদ করিবে। নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা করিবার পর তাহাদের নায়ক জানাইল—তাহারা মিলিতভাবে চাষ করিবে। বিনোবাজী তাহাদিগকে সেই অনুসারে একটি দরখাস্ত দিতে বলিলেন। তিনি মনে করিতেছিলেন—সরকারের নিকট হইতে জমি পাওয়াইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন। ইতিমধ্যে গ্রামের লোকজন সেখানে আসিয়া সমবেত হইলেন। বিনোবাজী তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি সরকারের কাছ হইতে জমি পাওয়া না যায় অথবা জমি পাইতে বিলম্ব হয় তবে গ্রামের কেহ গরীবদের জন্য কিছু জমি দিতে পারেন না কি? সমাগত গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডি নামক এক ভাই বলিলেন যে, তিনি তাঁহার ও তাঁহার পাঁচ ভাইয়ের পক্ষ হইতে ৫০ একর উঁচু এবং ৫০ একর নীচু মোট ১০০ একর জমি গরীব ভাইদের জন্য দান করিতে চাহেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় প্রার্থনা-সভায় বিনোবাজী ঐ দানের কথা ঘোষণা করিলেন। তিনি জমি পাইলেন এবং তাহা ঐ দরিদ্র হরিজনদিগকে দিলেন। তাহাদের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু বিনোবাজী ভাবিলেন—এ কি হইল! যেখানে মানুষ ৩ গন্ডা জমির জন্য ঝগড়া-দ্বন্দ্ব করে, সেখানে চাহিতেই ১০০ একর জমি কিরূপে মিলিল! কত জমি চাই তাহাও তিনি বলেন নাই। তাঁহার অবাশ্যক ছিল ৮০ একর জমির; কিন্তু পাওয়া গেল ১০০ একর। তবে কি ভগবান আজ শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডির মাধ্যমে ভারতে ভূমি-সমস্যা সমাধানের পথের ইঙ্গিত দান করিলেন? তবে কি মহাত্মা গান্ধীর আত্মা শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভূমি-সমস্যা সমাধানের শান্তিময় পথের সন্ধান তাঁহাকে দিলেন? এরূপে যাচ্ঞা করিয়া ভূমি-সংগ্রহ করত ভূমি-সমস্যা সমাধানের কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হইল। এরূপে ভূদানযজ্ঞের গঙ্গোত্রীর সৃষ্টি হইল। তিনি ইহার নাম দিলেন 'ভূদানযজ্ঞ'। তিনি ভূদানযজ্ঞের বাণী বহন করিয়া সেই হিংসাবিধ্বস্ত রক্তস্নাত তেলেঙ্গানার দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু মুহূর্তের জন্য তাঁহার মনে শঙ্কার উদয় হইল। এই সম্পর্কে তিনি তাঁহার এক প্রার্থনোত্তর ভাষণে বলিয়াছেন—"যেদিন আমি প্রথম দানপ্রাপ্ত হই, সেদিন রাত্রে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম—এইরূপে

ভূমি চাহিয়া চাহিয়া কি আমি সমস্ত দরিদ্র ভূমিহীনের সমস্যার সমাধান করিতে পারিব? আমি কোন সাহস পাইতেছিলাম না। কারণ ইতিহাসে এরূপ কাজের কোন নজীর ছিল না। কিন্তু ভিতর হইতে শক্তি পাইলাম। ভিতর হইতে বাণী আসিল—'ভীত হইও না; ভূমি চাহিতে থাক।' তখন আমার এরূপ মনে হইল যে, যখন তিনি আমাকে ভূমি চাহিবার প্রেরণা দিতেছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই অন্যকে ভূমি দান দিবারও প্রেরণা দিবেন; কারণ তিনি কখনও অসম্পূর্ণ কাজ করিতে পারেন না।" বিনোবাজী সম্প্রতি (১৯৫৫।৮ই আগষ্ট তারিখে) অন্ধ্রের শ্রীকাকুলম জেলার পার্বতীপুরম্ গ্রামে প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলিয়াছেন, "যেদিন আমি প্রথম দান (একশত একর) পাইলাম সেদিন রাত্রে চিন্তা করিতে লাগিলাম—এই ঘটনার কোন অর্থ আছে কি? আমার মনে হইল, পৃথিবীতে মানুষ শুধু নিজের বিচারে কাজ করিতে পারে না। বিশ্বজগতে তাহার জন্য বিচার তৈয়ারী হইয়া থাকে। আজ জগতে আবহাওয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আমি আরও ভাবিতে লাগিলাম—এই কার্য সম্পন্ন করিবার শক্তি আমার আছে কি? তখন অন্তর হইতে সাড়া আসিল—আমি শক্তিশূন্য। কিন্তু শক্তিশূন্য হইলেও আমি বিশ্বাস-শূন্য নহি। তাই আমি যদি অভিমানশূন্য হইয়া যাই তবে রাম অবতারে যিনি বানরের দ্বারা কাজ করাইয়াছিলেন তিনি আমার দ্বারাও কাজ করাইয়া লইবেন। দ্বিতীয় দিন আমি অন্য গ্রামে গিয়া বলিলাম, যদি আপনাদের চার পুত্র থাকে তবে আমি আপনাদের পঞ্চম পুত্র। আমাকে এক-পঞ্চমাংশ দিন। কেহ যে এমনভাবে চাহিতে পারে তাহার জন্য সেখানকার লোক প্রস্তুত ছিল না। হিরোসিমায় এ্যাটম্ বম পতনে যেরূপ ফল হইয়াছিল আমার কথার ফলও তাঁহাদের উপর সেরূপ হইল। আমি ২৫ একর জমি পাইয়া গেলাম এবং এরূপে ভূদানযজ্ঞ আরম্ভ হইয়া গেল।" এইভাবে অতীব বিনয়ে—অত্যন্ত ভক্তিসহকারে তিনি ভূমিদান চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইলেন। জুন মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত দুই মাস তিনি তেলঙ্গানায় এরূপে দুয়ারে দুয়ারে ভ্রমণ করিলেন। এই দুই মাসের মধ্যে লোকে দরিদ্রনারায়ণের জন্য তাঁহাকে ১২ হাজার একর জমি দান করিল। বর্ষা

আসিয়া পড়িল। তিনি চাতুর্মাস্য পালনের জন্য এবং 'কাঞ্চনমুক্তি' সাধনের কাজে অংশগ্রহণের জন্য তাঁহারা পরমধাম-আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।

অনেকের চক্ষু খুলিল। ভারতের অর্থনৈতিক স্বরাজের ভিত্তি পত্তনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। ভারতের ভূমি-সমস্যার শান্তিময় সমাধানের পথ মিলিয়াছে। কিন্তু আবার অনেকের মনে এই সন্দেহ থাকিল যে তেলঙ্গানায় জোতদার-জমিদারগণ কমিউনিষ্টদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াছে বলিয়া কিছু-কিছু জমি দিয়াছে। সাধারণ অবস্থায় এভাবে জমি পাওয়া সম্ভব নহে। বিনোবাজী ভাবিলেন, জমি তো শুধু জমিদার-জোতদারেরা দান করেন নাই? বহু জমি তো সামান্য কৃষকের কাছ হইতে পাওয়া গিয়াছে। তবে এ সন্দেহ আসে কেন? উপরন্তু আশঙ্কাকারীদের কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রেমের পথে কাজ পাইতে হইলে প্রথমে হিংসার প্রয়োগ করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু ইহা তো অহিংসার পন্থা নহে। তিনি মনে করিলেন, যেখানে তেলঙ্গানার পটভূমিকা নাই অর্থাৎ যেখানে কোনরূপ হিংসাত্মক আন্দোলন হয় নাই এমনস্থানে ভূদানযজ্ঞের পরীক্ষা করা আবশ্যক।

ভূদানযজ্ঞের ক্রমবিকাশ

ভগবান সে সুযোগ তাঁহাকে দিলেন। অহিংস সমাজরচনা সম্পর্কে তাঁহার বিচার জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার জন্য পন্ডিত জওহরলাল নেহরু বিনোবাজীকে দিল্লীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বিনোবাজী যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু পদব্রজে যাওয়া স্থির করিলেন। তাঁহার জন্মতিথি দিবসের পরদিন ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৫১) তিনি মধ্যপ্রদেশ দিয়া উত্তরভারতের পথে দিল্লী রওনা হইলেন এবং ভূদানযজ্ঞের বাণী প্রচার করিতে করিতে ও ভূমিদান চাহিতে চাহিতে চলিলেন। দুই মাসে ৫৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি দিল্লী পৌঁছিলেন। এই দুই মাসে তিনি ১৮ হাজার একর জমি পাইলেন। যে অঞ্চলের মধ্য দিয়া তিনি গিয়াছিলেন, সেখানে কোনরূপ হিংসাত্মক আন্দোলন কোনদিন হয় নাই। সে অঞ্চলে তখন কোন হিংসাবাদী দলও কর্মতৎপর

ছিল না। তেলঙ্গানায় দুই মাসে পাইয়াছিলেন ১২ হাজার একর; আর এই শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে দুই মাসে পাইলেন ১৮ হাজার একর। আশঙ্কাকারীদের সংশয় দূর হইল।

বিনোবাজীর দিল্লীর কাজ শেষ হইলে উত্তরপ্রদেশের সর্বোদয়প্রেমী কর্মিগণ তাঁহাকে উত্তরপ্রদেশের ব্যাপক ক্ষেত্রে ভূদানযজ্ঞের পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। বিনোবাজী তাঁহার আশ্রমে আর প্রত্যাবর্তন না করিয়া উত্তরপ্রদেশে সেরূপ পদব্রজেই রওনা হইলেন এবং সেখানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সাধারণ নির্বাচন ছিল; এবং সেখানকার অধিকাংশ কর্মী সাধারণ নির্বাচনে ৩ মাস কাল ব্যস্ত থাকেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি জনসাধারণের নিকট হইতে প্রভূত সাড়া ও সহযোগিতা পাইতে থাকেন এবং ছয় মাসে এক লক্ষ একর ভূমিদান প্রাপ্ত হন। পরবর্তী (১৯৫২ সালের) সর্বোদয় সম্মেলন তাঁহার উপস্থিত হওয়ার সুবিধার জন্য তাঁহার পরিক্রমা-পথে বেনারসের নিকটবর্তী সেবাপুরী আশ্রমে ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়। তখন পর্যন্ত ছয় মাসে তিনি এক লক্ষ একর ভূমি পাইয়াছিলেন। সেবাপুরী সম্মেলনে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয় যে, ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন সারা ভারতে প্রবর্তন করা হইবে এবং প্রথম কিস্তি-স্বরূপ দুই বৎসরে সারা ভারতে ২৫ লক্ষ একর ভূমি সংগ্রহ করা হইবে। ভারতের গ্রাম-সংখ্যা পাঁচ লক্ষ। প্রতি গ্রামে একটি করিয়া ভূমিহীন কৃষক পরিবারকে পাঁচ একর করিয়া জমি দিয়া উহাকে 'সর্বোদয় পরিবার' নামে আখ্যাত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ২৫ লক্ষ একর ভূমির আবশ্যক হয়। এই হিসাবের ভিত্তিতে ২৫ লক্ষ একর ভূমি সংগ্রহের সঙ্কল্প করা হয়। বিনোবাজীর অনুমোদনক্রমে সর্বসেবা সংঘ প্রতি প্রদেশে প্রাদেশিক ভূদানযজ্ঞ সমিতি গঠন করিয়া দিলেন। সারা ভারতে ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন প্রবর্তিত করা হইল।

বিনোবাজী তেলঙ্গানা ভ্রমণের সময় দৈনিক গড়ে দুইশত একর, দিল্লী যাইবার পথে তিনশত একর, উত্তরপ্রদেশে সেবাপুরী সম্মেলন পর্যন্ত ছয় মাসে দৈনিক গড়ে পাঁচশত একর এবং সেবাপুরী সম্মেলনের পর দৈনিক গড়ে এক হাজার একর করিয়া ভূমিদান পাইয়াছিলেন। সর্বশ্রেণী ও সর্ব-

স্তরের লোক তাঁহাকে ভূমিদান দিয়াছেন। হিন্দুরা দিয়াছেন, মুসলমানেরা দিয়াছেন এবং অন্য ধর্মাবলম্বীরাও দিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরাও অতীব শ্রদ্ধাভক্তির সহিত দিয়াছেন। জমিদার ও বড়-বড় জোতদার দিয়াছেন, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কৃষকও দিয়াছেন। এমন-এমন দরিদ্র কৃষক শ্রদ্ধার সহিত ভূদানযজ্ঞে তাঁহাদের ক্ষুদ্র আহুতি দান করিয়াছেন, যাহা বিনোবাজীর কাছে মধুর স্মৃতি হইয়া রহিয়াছে। উহার উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"এইযজ্ঞে কতিপয় 'শবরী' আপন-আপন 'কুল' দান করিয়াছেন এবং কতিপয় 'সুদামা' নিজেদের 'তণ্ডুল' দান করিয়াছেন। ইহা আমার নিকট চিরস্মরণীয় ভক্ত-গাঁথা হইয়া রহিয়াছে।" কংগ্রেস, সমাজতন্ত্রী দল ও কৃষক-মজদুর-প্রজা দল (বর্তমানে সম্মিলিত হইয়া প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টি) ও ভারতীয় জন-সংঘ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলসমূহ ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন সমর্থন করেন।

বর্ষায় তিনি বেনারসের কাশী-বিদ্যাপীঠে অবস্থান করেন। ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৫২) পুনরায় তিনি পরিক্রমা আরম্ভ করেন ও দুইদিন উত্তর-প্রদেশে ভ্রমণ করত উক্ত প্রদেশের পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রাতে বিহারে প্রবেশ করেন। তখন পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশে তিন লক্ষাধিক একর ভূমি সংগৃহীত হইয়াছিল। বিহারেও আশানুরূপভাবে ভূমি পাওয়া যাইতে লাগিল। দুইবৎসরের মধ্যে (অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সারা ভারতে-যে ২৫ লক্ষ একর ভূমিদান প্রাপ্তির সংকল্প করা হয় তন্মধ্যে বিহারের ভাগে ছিল ৪ লক্ষ একর। কথা ছিল, বিনোবাজী বিহারে প্রায় ৬ মাস পরিভ্রমণ করিয়া ১৯৫৩ সালের ৭ই-মার্চ তারিখে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের নিকটবর্তী স্থান দিয়া পশ্চিমবাংলায় প্রবেশ করিবেন এবং ৭০ দিন ভ্রমণের পর বাঁকুড়া জেলার প্রান্তে বাংলার ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া ১৬ই মে (১৯৫৩) বিহারের মানভূম জেলায় প্রবেশ করিবেন। বিহারে আরও একমাস কাল ভ্রমণ করত বিহারের পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিবেন এবং অতঃপর উড়িষ্যায় ভ্রমণ আরম্ভ করিবেন। কিন্তু বিহারে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি তাঁহার ভ্রমণ-পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন করিলেন। তিনি সংকল্প করিলেন যে, বিহারের ভূমি-সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বিহার ত্যাগ করিবেন না। তিনি

বিহারের কর্ষণযোগ্য ভূমির এক-ষষ্ঠাংশ ৩২ লক্ষ একর ভূমিদান বিহারের নিকট চাহিলেন। বিনোবাজীর এই সঙ্কল্পের পিছনে কি যুক্তি ছিল তাহা বুঝা আবশ্যক। এইসম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"ভূমি-সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে উহা (চিন্তাধারার বিপ্লব) আনিবে। এইজন্য আমি সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করিতেছি এবং আরও কিছুলোক ভ্রমণ করিতেছেন। কিন্তু আমি অনুভব করিয়াছি যে, এক প্রদেশে ব্যাপকভাবে উহার প্রয়োগ করিয়া কিরূপে সমস্যার সমাধান করা যায়, তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। এইজন্য বিহার হইতে আমি ৩২ লক্ষ একর জমি চাহিয়াছি।" উপরন্তু উক্তযুক্তি অনুসরণ করিয়া প্রদেশের মধ্যে কোন একটি জেলাতে কেন্দ্রীভূত ও আত্যন্তিক-ভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত করা হয়। ভগবান বুদ্ধের বিচরণভূমি বলিয়া গয়া জেলাকে ঐরূপ আত্যন্তিক ও কেন্দ্রীভূত কাজের জন্য বাছিয়া লওয়া হয়। উপরন্তু বিহারে যত প্রকারের ভূমি আছে সেই সমস্ত প্রকারের ভূমি গয়া জেলায় আছে। সমতল ভূমি, উঁচু-নীচু ঢেউ-খেলানো ভূমি, বনাকীর্ণ, পার্বত্য, বালুপ্রধান ও কংকরময় ভূমি সবই গয়া জেলায় আছে। খুব মূল্যবান ভূমি আছে, আবার নিতান্ত কম মূল্যেরও ভূমি সেখানে আছে। তাই ভূমির দিক্ হইতে গয়া জেলা বিহারের প্রতিনিধিস্থানীয়। গয়া জেলাকে আত্যন্তিক কাজের জন্য নির্বাচন করিবারও ইহা প্রধান কারণ এবং ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে আগত কর্মিগণ সেখানে সমবেত হইয়া কাজ করিতে থাকেন।

১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে বিনোবাজী অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখন তিনি মানভূম জেলায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। অসুখের কারণে মানভূম জেলার চাণ্ডিল গ্রামে তাঁহার প্রায় তিনমাস কাল বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হয়। তাই এই বৎসরের সর্বোদয়-সম্মেলনের অনুষ্ঠান চাণ্ডিলেই করিতে হয়। চাণ্ডিল সম্মেলনে এই সংকল্প গ্রহণ করা হয় যে, সেবাপুরী সম্মেলনের সঙ্কল্পানুসারে দুইবৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সারা ভারতে ২৫ লক্ষ একর ভূমিদান সংগ্রহ করা তো হইবেই, উপরন্তু ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে উহার মোট কর্ষণযোগ্য ভূমির এক-ষষ্ঠাংশ ৫ কোটী একর ভূমি ভূদানযজ্ঞে দানস্বরূপ সংগ্রহ করা হইবে।

সেই উদ্দেশ্যে আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য—অন্তত এক বৎসরের জন্য অনন্যকর্মা হইয়া একাগ্রভাবে ভূদানযজ্ঞের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য কর্মীদের নিকট আবেদন করা হয়। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ৫ কোটী একর পরিমাণ ভূমিদান সংগ্রহ করিয়া ভারতের ভূমি-সমস্যা সমাধান সার্থক করিয়া তুলিবার সংকল্প বিশেষ অর্থপূর্ণ। ১৭৫৭ সালে পলাশী-যুদ্ধে ভারত পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। ১৯৫৭ সালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের স্বরাজের পূর্ণতা প্রাপ্তি। এই সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"আমি মনে করি অর্থ-নৈতিক ক্রান্তি অনিবার্য। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ হইয়াছিল, ১৮৫৭ সালে বিপ্লব এবং এক্ষণে ১৯৫৭ সালে আর্থিক ও সামাজিক ক্রান্তি না হইয়া যায় না।"

সেবাপুরী সর্বোদয় সম্মেলনে দুই বৎসরের মধ্যে ভূদানযজ্ঞে ২৫ লক্ষ একর ভূমি সংগ্রহ করিবার সংকল্প করা হইয়াছিল। দুই বৎসর পরে গত এপ্রিল মাসে (১৮—২০শে এপ্রিল, ১৯৫৪) বুদ্ধগয়ায় সর্বোদয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় পর্যন্ত সারা ভারতে ২,৩৭,০২২ জন দাতার নিকট হইতে ২৮,২৫,১০১ একর ভূমি সংগৃহীত হয়। এমতে সেবাপুরী সম্মেলনের সংকল্প পূর্ণ হয়, যদিও প্রত্যেক প্রদেশের জন্য যে কোটা নির্দিষ্ট ছিল তাহা কতিপয় প্রদেশে পূর্ণ হয় নাই। তথাপি দুই বৎসরের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক দাতার নিকট হইতে এত ভূমি পাওয়া এক অভাবনীয় ব্যাপার। ইহা ছাড়া বহু সমগ্র গ্রামদান পাওয়া যায়। অর্থাৎ গ্রামে বেশী হউক আর কম হউক যাঁহাদের যে-ভূমি ছিল তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের সমস্ত ভূমি ভূদানযজ্ঞে অর্পণ করেন। এরূপে ভূদানযজ্ঞের প্রথম পর্যায় সফলভাবে অতীত হয়। এখন পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৫৭ সালের মধ্যে ৫ কোটী একর ভূমিপ্রাপ্ত হইবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কোন কোন প্রদেশ এই দৃষ্টি লইয়া ইতিপূর্বেই কর্মতৎপর হইয়াছিল। বুদ্ধগয়া সম্মেলনের পর হইতে সারা দেশে এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া কার্য আরম্ভ হইতে থাকে। উপরন্তু বুদ্ধগয়া সম্মেলনের পর হইতে ভূমি-বিতরণের

দিকে জোর দেওয়া হয় ও ইতিপূর্বে যে-জমি পাওয়া গিয়াছে তাহা সুব্যবস্থিতভাবে এবং তাড়াতাড়ি বিতরণ করিয়া দিয়া গ্রামরাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিবার কাজও তৎপরতার সহিত করা হইতে থাকে।

বিহারে দীর্ঘ ২৭ মাস পাদ-পরিক্রমা করিয়া উড়িষ্যায় যাইবার পথে বিনোবাজী পশ্চিমবঙ্গ হইয়া যান। বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া পদযাত্রা করিয়া উড়িষ্যায় যাইতে তাঁহার ২৫দিন অতিবাহিত হয়। ১৯৫৫ সালের ১লা জানুয়ারী অতি প্রত্যুষে তিনি বাঁকুড়া জেলার শালতোড়ায় শুভ পদার্পণ করেন। তাঁহার পরিক্রমার সময় বাঁকুড়া জেলার জনগণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ত জাগৃতি পরিলক্ষিত হয়। ২৬শে জানুয়ারী তিনি উড়িষ্যায় প্রবেশ করেন। পূর্বেই সেখানে ভূদানযজ্ঞের কাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। তখন পর্যন্ত উড়িষ্যায় ৪২ হাজার দাতার নিকট হইতে মোট ১ লক্ষ ২৫ হাজার একর ভূমি ও ৮৫টি গ্রামদান পাওয়া গিয়াছিল। সেখানকার আন্দোলনের অগ্রগতি, বিশেষত গ্রামদানের গতি লক্ষ্য করিয়া উড়িষ্যায় যাইবার পূর্বেই বিনোবাজী এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"বিহারে ভূমি-প্রাপ্তি, উড়িষ্যায় ভূমি-ক্রান্তি এবং অন্য সর্বত্র মুক্ত ভ্রমণ।" তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। বিনোবাজী উড়িষ্যায় যাইবার পর হইতে সমগ্র প্রদেশে বিশেষ করিয়া কোরাপুট জেলায় ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন এক নব-পর্যায়ে উপনীত হয়। সেখানে গ্রামদানের প্রবাহ চলিতে থাকে। ভূমিদানের চরম পরিণতি সর্বস্ব গ্রামদানে। কারণ তাহাতে ব্যক্তিগত মালিকানা ঘুচিয়া যায় এবং গ্রাম এক পরিবারে পরিণত হইয়া 'গ্রাম-পরিবারের' সৃষ্টি করে। যেদিন (২৮শে মে, '৫৫) তিনি কোরাপুট জেলায় প্রবেশ করেন, সেদিন পর্যন্ত উড়িষ্যায় দানপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৪১ হাজার একর এবং দাতার সংখ্যা ছিল ৫৯ হাজার ৩ শত। তন্মধ্যে এক কোরাপুট জেলায়ই ৯ হাজার দাতা ৫৯ হাজার একর জমি দান করিয়াছিলেন। সর্বস্বদানী গ্রাম পাওয়া গিয়াছিল ৯১ খানা। ২০শে আগষ্ট ১৯৫৫ পর্যন্ত উড়িষ্যায় মোট ৪৯৮টি গ্রামদান পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে কোরাপুট জেলার গ্রাম-দানের সংখ্যাই প্রায় ৪০০, এবং ঐদিন পর্যন্ত উড়িষ্যায় প্রাপ্ত জমির পরিমাণ

মোট ২ লক্ষ ৯ হাজার ৬৮১ একর।*

১৯৫৫ সালে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে পুরীতে সপ্তম-বার্ষিক সর্বোদয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে ১৯৫৭ সালের মধ্যে ভূমি-ক্রান্তি সফল করিবার সংকল্পের পুনরুক্তি করা হয়। উপরন্তু সর্বোদয় তথা অহিংসায় নিষ্ঠাবান সকল ব্যক্তির প্রতি সর্বসেবা সংঘ সবিনয় আবেদন জানান যে, অহিংস প্রক্রিয়ার ঐ কঠিন পরীক্ষার সময় তাঁহারা যেন ১৯৫৭ সালের মধ্যে ভূমি-ক্রান্তি সফল করিবার জন্য অন্য সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সমগ্র বুদ্ধি, শক্তি ও কার্যকুশলতা ভূদানযজ্ঞের কাজে সমর্পণ করেন। ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত সারা ভারতে ৪ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬৫৯ জন দাতার নিকট হইতে মোট ৪০ লক্ষ ১৪ হাজার ৬২৯ একর ভূমিদান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২ লক্ষ ১১ হাজার ২০৪ একর জমি ৭২ হাজার ৩৫২টি পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

উড়িষ্যার পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া বিনোবাজী বর্তমানে অন্ধ্র প্রদেশে পাদ-পরিক্রমা করিতেছেন। তিনি গত ১লা অক্টোবর (১৯৫৫) অন্ধ্র প্রদেশের বাঁথালি গ্রামে প্রবেশ করেন। অন্ধ্রবাসীরা সেখানে বিরাট সমারোহের সঙ্গে তাঁহাকে নিজেদের মধ্যে অভ্যর্থনা করিয়া লন।

ভূদানযজ্ঞের পঞ্চসোপান (ভূদান-আরোহণ)

বিনোবাজী বলেন, ভূদানযজ্ঞের পঞ্চ সোপান। ভূদানযজ্ঞ এক সোপান হইতে অন্য সোপানে উন্নীত হইতে হইতে বিনোবাজীর উড়িষ্যা ভ্রমণের সময় উহা পঞ্চম সোপানে আরূঢ় হয়। তিনি ঐ পঞ্চসোপানের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ---

(১) তেলঙ্গানায় ভূমিহীন দরিদ্র ও ভূমির মালিকদের মধ্যে বিদ্বেষ, বিবাদ ইত্যাদির ফলে সেখানে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহার

---

*—১৯৫৫ সালের বিনোবা-জয়ন্তী উপলক্ষে সমগ্র প্রদেশে সর্বস্বদানী গ্রামের সংখ্যা ১০০০ পর্যন্ত করিবার জন্য উড়িষ্যার কর্মিগণ এক কার্যক্রম নির্ধারিত করিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন এবং তদুপলক্ষে প্রাপ্ত গ্রামদান-সমূহ এক বিশেষ সমারোহে বিনোবাজীর হস্তে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

প্রতিকার করা অত্যন্ত জরুরী ছিল। সেই অবস্থায় সেখানে ভূদানযজ্ঞ আরম্ভ করা হয় এবং ভাল সাড়া পাওয়া যায়। সেখানকার ভয়াবহ পরিস্থিতিও প্রশমিত হয়। তাহার প্রভাব সমস্ত দেশের উপর পড়ে এবং দেশের চিন্তাধারায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। উহাই ভূদানযজ্ঞের প্রথম সোপান।

(২) তেলেংগানার হাঙ্গামায় ভূমির মালিকগণ ও তাঁহাদের পক্ষীয় হাজার হাজার লোক নিহত হইয়াছিল। সেখানে লুটতরাজ, ডাকাতি ও অগ্নিসংযোগ অবারিত গতিতে চলিতেছিল। অনেকে মনে করিলেন, সেই অবস্থায় সেখানে ভূমির মালিকদের নিকট হইতে অনুকূল সাড়া পাওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু সমগ্র দেশের পক্ষে ভূদানযজ্ঞ উপযোগী কিনা—বিশেষত যেখানে স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান অর্থাৎ যেখানে কোন হিংসাত্মক আন্দোলন নাই সেখানেও ভূদানযজ্ঞের আহ্বানে সাড়া পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ আছে। তাই স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান এমন এক উপযুক্ত ক্ষেত্রে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখার প্রয়োজন ছিল। বিনোবাজীর দিল্লী যাইবার পথে ঐ পরীক্ষা চলিল ও উহা সফল হইল। সমগ্র দেশের দৃষ্টি উহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। ভূদানযজ্ঞের কথা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। এইরূপে ভূদানযজ্ঞের দ্বিতীয় সোপান রচিত হয়।

(৩) অতঃপর কর্মীদের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইল—যাহাতে তাঁহারা আত্মবিশ্বাস লইয়া দেশব্যাপী আন্দোলন চালাইয়া সফলকাম হইতে পারেন। দুই বৎসরের মধ্যে সারা দেশে ২৫ লক্ষ একর ও তন্মধ্যে যুক্তপ্রদেশে ৫ লক্ষ একর ভূমিদান সংগ্রহ করিবার সংকল্প সেবাপুরী সর্বোদয় সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়। ঐ দুই সংকল্পই পূর্ণ হয় এবং তাহাতে কর্মীদের মধ্যে আত্মনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠালাভ করে। এইরূপে ভূদানযজ্ঞ তৃতীয় সোপানে আরূঢ় হয়।

(৪) দেশে যে পরিমাণ ভূমি আছে তাহার এক-ষষ্ঠাংশ ভূমি পাওয়া গেলে তবেই সকল ভূমিহীন দরিদ্রকে ভূমি দেওয়া যাইতে পারিবে। প্রথমে একটি প্রদেশে আত্যন্তিকভাবে কাজ চালাইয়া যদি উহার এক-ষষ্ঠাংশ ভূমি সংগ্রহ করিতে পারা যায় তবে অন্যান্য প্রদেশেও উহার প্রভাব পড়িবে। তখন দেশের সর্বত্র এক-ষষ্ঠাংশ করিয়া ভূমিদান সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হইবে।

এই দৃষ্টিতে বিহারের এক-ষষ্ঠাংশ ভূমি অর্থাৎ ৩২ লক্ষ একর ভূমি সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করা হয়। উহার অধিকাংশ ভূমি অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ২৩ লক্ষ একর ভূমি সংগৃহীত হইয়া গিয়াছে। কর্মীরা এক্ষণে ভূমি-বিতরণের কাজে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকায় ভূমিদান-প্রাপ্তির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারিতেছেন না। বিহারে যত ভূমিদান পাওয়া গিয়াছে তাহার পরিমাণ অপেক্ষা কত লোক ভূমিদান দিয়াছেন তাহারই গুরুত্ব সর্বাধিক। সেখানে ৩ লক্ষ লোক ভূমিদান দিয়াছেন। একটি প্রদেশে কি করিয়া যে লক্ষ-লক্ষ লোক লক্ষ-লক্ষ একর ভূমি দান করিয়া দিতে পারে সে-দৃশ্য বিহারে দেখা যায়। লক্ষ-লক্ষ লোক অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করেন। বিহারে যে-দান পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশ সাত্ত্বিক দান। ইহা ভূদানযজ্ঞের চতুর্থ সোপান।

(৫) ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানাবোধের বিলোপ হইলে তবেই ভূমি-ক্রান্তি সাধিত হইবে। সমগ্র গ্রামদানে ব্যক্তিগত মালিকানা চলিয়া যায় এবং গ্রামই ভূমির মালিক হয়। সারা গ্রাম এক পরিবারের মত চলিতে থাকে। উহাকে বিনোবাজী "গ্রাম-পরিবার" আখ্যা দিয়াছেন। বিনোবাজী উড়িষ্যার কোরাপুট জেলায় যখন পাদ-পরিক্রমা আরম্ভ করেন তখন সেখানে গ্রামদান আন্দোলন অপূর্বভাবে সফল হইতে থাকে। ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসের শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যায় ৫ শতের অধিক সমগ্র গ্রামদান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কোরাপুট জেলায়ই ৪ শতের কিছু অধিক। ভূদানযজ্ঞ ষষ্ঠাংশ দান হইতে সর্বস্বদানে উন্নীত হয়। এইরূপে ভূদানযজ্ঞ উড়িষ্যায় পঞ্চম সোপানে আরূঢ় হয়।

বিনোবাজী ভূদানযজ্ঞের পঞ্চসোপানের নামকরণ করিয়াছেন। প্রথম সোপানে এক স্থানীয় অশান্তি দমিত হয়। এজন্য তিনি উহার নাম দিয়াছেন—"অশান্তিদমন"। দ্বিতীয় সোপানে সমগ্র দেশের দৃষ্টি ভূদান-যজ্ঞের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এজন্য উহার নাম দেওয়া হইয়াছে "ধ্যানাকর্ষণ"। তৃতীয় সোপানে কর্মীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়। তাই উহার নামকরণ করা হইয়াছে—"নিষ্ঠানির্মাণ"। চতুর্থ সোপানে কোন এক বিশেষ প্রদেশে কিভাবে এক-ষষ্ঠাংশ ভূমি সংগ্রহ করিতে পারা যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া

দেখা হয়। এজন্য বিনোবাজী উহাকে "ব্যাপক-ভূমিদান" আখ্যা দিয়াছেন। পঞ্চম সোপানে গ্রামকে এক পরিবারে পরিণত করিবার প্রযত্ন করা হয়। এজন্য উহার নাম দেওয়া হইয়াছে—"ভূমি-ক্রান্তি"।

বিনোবাজী তাই বলিয়াছেন, ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন নহে, উহা 'আরোহণ'।

ইহা যে বাপুরই সেই দৃশ্য

বিদেশী শাসনের অবসান হওয়ায় আমরা যে স্বাধীনতালাভ করিয়াছি তাহা মাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা। উহা সম্পূর্ণ স্বরাজ নহে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা একটি সুযোগ মাত্র। ঐ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে তবে দেশ সম্পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ১৮ দফা রচনাত্মক কার্যক্রমের মধ্যে এই স্বরাজের চিত্রই আঁকিয়াছিলেন। অর্থনৈতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠা উক্ত ১৮ দফা গঠনমূলক কার্যের অন্যতম। কিন্তু অবস্থার পরিণতি এইরূপ হইয়াছে যে, ভূমি-সমস্যার সমাধান তথা অর্থনৈতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠা আজকালের যুগ-ধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মহাত্মা গান্ধীর সেই অসমাপ্ত কার্য ভগবান বিনোবাজীর হস্তে সঁপিয়া দিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে যে বিভূতির প্রকাশ আমরা দেখিয়াছিলাম, বিনোবাজীর মধ্যে অনুরূপ বিভূতির বিকাশ দেখা যাইতেছে এবং মনে হইতেছে যে, গান্ধীজীর আত্মা বিনোবাজীর মাধ্যমে কাজ করিতেছে। কৃপালনীজী বিহারে বিনোবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং তিনিও ঐরূপ অনুভব করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"বাপুর সঙ্গে চম্পারণে থাকিয়া যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, এখানে বিনোবাজীর কাছে আসিয়া সেই দৃশ্যই দেখিতেছি। বাপু যেভাবে কাজ করিতেন, বিনোবাজীও সেইভাবে কাজ করিতেছেন। আমার কাজ তো ঐরূপ নহে; কারণ আমার প্রকৃতি ভিন্ন রকমের। কিন্তু যে-মনোভাব লইয়া, যে-পদ্ধতিতে ও যে-ধাঁচে বাপু কাজ করিতেন, বিনোবাজীও সেইরূপ করিতেছেন। গান্ধীজী যেভাবে গ্রামবাসী ভাইদের সহিত কথাবার্তা বলিতেন, বিনোবাজীও সেইভাবে তাঁহাদের সহিত

কথাবার্তা বলিয়া থাকেন। এইরূপ মনে হইতেছে ও আশাও হইতেছে যে, বাপুর সেই আত্মা পুনরায় আমাদের মধ্যে আসিয়া কাজ করিতেছে। এতদিন পর্যন্ত মনে হইতেছিল যে. তিনি যাহা-কিছু শিখাইয়াছিলেন, তিনি চলিয়া যাওয়ার পর লোকে সে-সবই ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এইসব কাজ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, মহাত্মার আত্মা বিনোবার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে কাজ করিতেছে এবং গান্ধীজীরই কাজ চালু রহিয়াছে—উহা বন্ধ হয় নাই। শুধু বিদেশী-শাসনের অবসান ঘটানোই তাঁহার কাজ ছিল না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা রাজনীতিজ্ঞ তাঁহারা বিদেশী-শাসনের অবসানকে ক্রান্তি বলিয়া ভাবিতেন। কিন্তু তাঁহার কাছে উহা ক্রান্তির এক পদক্ষেপ মাত্র ছিল। তিনি স্বাধীনতার সাহায্যে দারিদ্র্য-সমস্যা দূর করিতে চাহিয়াছিলেন।"

সমগ্র গ্রামদান বা ভূমির গ্রামীকরণ

আন্দোলনের প্রথম দিকে বিনোবাজী বলিয়াছিলেন, "আমি ছোট পরিবার চাই না তাই বড় পরিবার সৃষ্টি করিতে যাইতেছি। আমি সারা গ্রামকে এক পরিবাররূপে গড়িয়া তুলিতে চাই।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন—"এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমার আন্দোলন অগ্রসর হইতেছে এবং সফলতা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলিতে থাকিবে।" অতঃপর ১৯৫৩ সালের মধ্যভাগে রাঁচিতে অনুষ্ঠিত এক কর্মী-শিবিরে বিহার প্রদেশের কর্মীদিগের কাছে তিনি ভূমি-ব্যবস্থার অন্তিম চিত্র সম্বন্ধে বলেন,—

"আমাদের অন্তিম অবস্থা এইরূপ হইবে। ভারতবর্ষে যত জমি আছে সবই একত্রিত করিয়া আবাদ করা হইবে এরূপ নহে। ব্যক্তির হাতে জমি থাকিবে কিন্তু গ্রাম-পঞ্চায়েৎ জমির মালিক হইবে। প্রত্যেক পরিবারকে ৫ একর করিয়া জমি আবাদ করিবার জন্য দেওয়া হইবে এবং উদ্বৃত্ত জমি সামূহিক থাকিবে। খাজনা সামূহিক জমির ফসল হইতে দেওয়া হইবে। শিক্ষা, চিকিৎসা-ব্যবস্থাদি প্রভৃতির ব্যয় সামূহিক জমি হইতে মিটানো হইবে। এইরূপে গ্রামের সার্বজনিক কার্যাদি সবই সামূহিক জমি হইতে হইবে এবং খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রত্যেকের হাতে কিছু-কিছু জমি দেওয়া হইবে।

প্রতি আট-দশ বৎসর অন্তর নূতন করিয়া জমির পুনর্বণ্টন হইবে। যদি কাহারও সংসারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় তবে তাহাকে বেশী জমি দেওয়া হইবে এবং যদি কাহারও ঘরে সংখ্যা কম হয় তবে তাহাকে কম জমি দেওয়া হইবে। ঐ সময়ের জন্য ঐ ব্যক্তি মালিক থাকিবে অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে তাহার নিকট হইতে কোন জমি ছাড়াইয়া লওয়া যাইবে না। প্রত্যেকে যে-কাজ করিবে তাহা এই মনে করিয়া করিবে যে, উহার দায়িত্ব তাহারই এবং ঐ জমি তাহারই। ঐরূপভাবে সামূহিক জমিও তাহাদের—এরূপ মনে করিয়া লোকে ঐ জমিতে কাজ করিবে। সমগ্র জমি আমাদের। আমাদের প্রয়োজন বৃদ্ধি হইলে আমরা ঐ জমি হইতে আরও জমি পাইব; আবার আবশ্যক হইলে আমাদের কাছ হইতে জমি লওয়াও যাইবে—এরূপ মনোভাব থাকিবে। যদিও পিতাপুত্রের মধ্যে সম্বন্ধ অটুট তবু কোন বাপ এইরূপ বলে না যে, আমি আমার পুত্রের মালিক। বাপ বলে যে, মালিক তো ভগবান এবং আমরা দুইজনই তাঁহার সেবক। অর্থাৎ তাহার সন্তানের প্রতি মমত্ব আছে বটে কিন্তু সে তাহার মালিক নহে। ঐরূপ জমির প্রতি মমত্ব থাকিবে বটে কিন্তু তাহার উপর মালিকানা থাকিবে না। জমি বিক্রি করা যাইবে না। কেহ কি নিজের ছেলেকে বিক্রি করে? ছেলেকে কাহারও সাহায্যার্থে দেওয়া যাইতে পারে। জমির মূল্য পয়সায় হয় না। উহা অমূল্য বস্তু।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র গ্রামদানের কল্পনা আরম্ভ হইতেই বিনোবাজীর মধ্যে গভীরভাবে ছিল। কিন্তু তিনি প্রথম হইতে সমগ্র গ্রামদানের উপর জোর দেন নাই। কারণ মহান ভাবধারা ব্যক্ত করা এক জিনিস আর উহা বাস্তবে পরিণত করা অন্য জিনিস। আন্দোলনের অগ্রগতি হইতে হইতে উহার জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হওয়া চাই। সময় ও অবস্থা বুঝিয়া তিনি উত্তরপ্রদেশের মঙগরোট গ্রামের অধিবাসীদের নিকট সমগ্র গ্রামদানের কথা বলিলেন এবং তাঁহারা সর্বস্বদানস্বরূপ মঙগরোট গ্রাম দান করিলেন। উহাই প্রথম সমগ্র গ্রামদান। তৎপরে বিহারে ১৩টি গ্রাম এবং উড়িষ্যায় ২৫টি সমগ্র গ্রামদান পাওয়া যায়। উড়িষ্যায় সমগ্র গ্রামদানের সংখ্যা ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিনোবাজী বলিয়াছিলেন যে, উড়িষ্যায় তাঁহার ভ্রমণের উদ্দেশ্য হইবে ভূমি-ক্রান্তি।

সমগ্র গ্রামের সর্বস্বদানের দ্বারা ভূমি-ক্রান্তি সাধিত হয়। বিনোবাজীর উড়িষ্যা ভ্রমণকালে কোরাপুট জেলায় সমগ্র গ্রামদানের প্রবাহ চলিতে থাকে। ইহা ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলনের মহত্তম সম্ভাবনার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিতেছে।

সর্বস্বদানী গ্রামের ভূমি-ব্যবস্থা কিরূপ হইবে এবং কিভাবে ঐ গ্রামে পুনর্নির্মাণের কাজ চলিতে থাকিবে তাহা বিনোবাজী কোরাপুট জেলায় ভ্রমণের সময় বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া গ্রামবাসীদিগকে বুঝাইয়া দেন—"জমির মালিক ভগবান। গ্রাম হইবে ভগবানের পক্ষ হইতে জমির ট্রাষ্টি। আইনেও কোন ব্যক্তিকে জমির মালিক বলিয়া মানা হইবে না, গ্রামকেই জমির মালিক বলিয়া মানা হইবে। পরিবারে কতজন লোক আছে তাহা দেখিয়া মাথাপিছু ১ একর করিয়া জমি প্রত্যেক পরিবারকে চাষ করিবার জন্য দেওয়া হইবে। প্রত্যেক ৫ বা ১০ বৎসর পরে পরিবারের লোক-সংখ্যা কত দাঁড়ায় তাহা দেখিয়া তদনুসারে জমির পুনর্বিতরণ করা হইবে। গ্রামে কিছু সামূহিক জমি থাকিবে। ঐ জমির আয় হইতে গ্রামের সমস্ত জমির খাজনা দেওয়া ও গ্রামের উন্নতিমূলক কার্যাদি করা হইবে। কয়েক বৎসর পরীক্ষার পর যদি গ্রামের লোক চাহেন তবে তাঁহারা গ্রামের সমস্ত জমিকে সামূহিক-জমি করিয়া লইতে পারিবেন। এখন কেবল সুবিধার জন্য তাঁহারা পৃথক-পৃথকভাবে চাষ করিবেন। কাহারও ক্ষেতে যদি খুব বেশী কাজ পড়িয়া যায় তবে গ্রামের সমস্ত লোক মিলিয়া ঐ কাজ করিয়া দিবেন। যদি কেহ দুঃখকষ্টে পড়ে কিংবা কাহারও জমিতে ফসল কম হয় তবে তাহাকে সাহায্যদান করা হইবে। কেহ কাহাকেও ঋণ দিতে পারিবেন না। বরং যাঁহার অভাব হইবে তাঁহাকে সাহায্য দেওয়া হইবে। কারণ সমগ্র গ্রাম এক পরিবারস্বরূপ বাস করিবে।

"সঙ্গে সঙ্গে গৃহশিল্প প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং গ্রাম স্বাবলম্বী হইয়া পয়সার মায়া হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবে। প্রথম কাজ হইবে—গ্রামবাসীরা মিলিত হইয়া স্থির করিবেন যে, তাঁহাদের গ্রামে বাহির হইতে কোন বস্ত্র আসিবে না। তুলাচাষ হইতে আরম্ভ করিয়া বস্ত্রবয়ন পর্যন্ত সমস্ত কাজ গ্রামেই করা হইবে। তাহার দ্বারা গ্রামের সকলে কাজ পাইবেন

এবং গ্রামের লক্ষ্মী গ্রামেই থাকিয়া যাইবে। উপরন্তু গ্রামের জন্য অন্য যেসব জিনিসের প্রয়োজন তৎসমস্তই গ্রামে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। গ্রামে কাহারও কোন নিজস্ব দোকান থাকিবে না। গ্রামের পক্ষ হইতে একটি দোকান থাকিবে। তাহার মাধ্যমে প্রয়োজনমত বাহিরের জিনিস ক্রয় করা হইবে এবং গ্রামে প্রয়োজনাতিরিক্ত যেসব জিনিস উৎপন্ন হইবে তাহা বাহিরে বিক্রয় করা হইবে।

"গ্রামের সমস্ত বালক-বালিকা সমান শিক্ষা পাইবে। শিক্ষক সকালে এক ঘণ্টা বালক-বালিকাদের এবং সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা বয়স্কদের শিক্ষা দিবেন এবং সারাদিন নিজের কাজ করিবেন। ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিল্প তথা ব্রহ্মবিদ্যা উভয়ই চাই। তাহাতে হাতের কাজ মিলিবে এবং বুদ্ধির ঠিকমত বিকাশ হইবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গ্রামের সকলে একস্থানে মিলিত হইবেন। তথায় গীতা, রামায়ণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ হইবে এবং গ্রামের উন্নতি সম্পর্কে সকলে আলোচনা করিবেন। আজকাল মদ্য, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি পান-দোষের জন্য গ্রামের অবস্থা খুব খারাপ হইয়াছে। এইজন্য সকল গ্রামবাসী মিলিত হইয়া ভগবানের নাম করিয়া সংকল্প করিবেন যে তাঁহারা মদ, বিড়ি প্রভৃতি ত্যাগ করিবেন। গ্রামে যাহার ঋণ আছে তাহা মকুব করিবার জন্য, অন্ততপক্ষে সুদ ছাড়িয়া দিবার জন্য মহাজনকে অনুরোধ করা হইবে। ভবিষ্যতে যদি কাহারও ঋণ করিবার প্রয়োজন হয় তবে গ্রামের তরফ হইতে ঋণ করা হইবে। সরকারের নিকট হইতেও ঋণ লওয়া যাইতে পারিবে। গ্রামের সকল বিবাহের ব্যবস্থা গ্রামের পক্ষ হইতেই করা হইবে—কোন পরিবার বিশেষের পক্ষ হইতে নহে। এই কারণে বিবাহের জন্য কোন ঋণ করিবার প্রশ্ন উঠিবে না।"

"সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ ইত্যাদি সমস্ত ভেদভাব দূর করা হইবে। প্রত্যেক মানুষকে পরমেশ্বরের পুত্র বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং সেই দৃষ্টিতে সকলের সমান অধিকার থাকিবে। সকল রকম শিল্প তথা সকল রকম সমাজহিতকর কাজের সমান সামাজিক, নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠা থাকিবে। গ্রামের জমিতে সকলের সমান অধিকার গণ্য করা হইবে এবং আদর্শ এই হইবে যে, প্রত্যেকে কিছুসময় ক্ষেতে কাজ

করিবেন। কারণ কৃষিকার্য ব্যতীত মানবজীবনের পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব নহে। গ্রামের তাঁতি, চামার, কামার প্রভৃতি সকলে গ্রামের লোকের প্রয়োজনমত তাঁহাদের কাজ করিয়া দিবেন। উহার হিসাব রাখা হইবে না। বর্ষান্তে যখন ফসল উঠিবে তখন কৃষক ফসলের কিছু অংশ উঁহাদের প্রত্যেকের ঘরে দিয়া আসিবেন। গ্রামে প্রথমে এইরূপই হইত। এইভাবে "বসুধৈব-কুটুম্বকম্"-এর আরম্ভ গ্রাম-পরিবার হইতেই হইবে।"

সর্বস্বদানী গ্রামের ভূমি-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা চলিয়া যায় বটে কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার সুবিধা গ্রামবাসীদের থাকিয়া যায়। অর্থাৎ তাহারা পৃথক-পৃথকভাবে জমি চাষ করিতে পায়। সমগ্র গ্রামদানের কথায় বিনোবাজী বলেন যে, ভূদানযজ্ঞের প্রথম পদক্ষেপে বলা হয়, গ্রামে কেহ ভূমি-হীন থাকিবে না এবং উহার অন্তিম পদক্ষেপে বলা হয়, গ্রামে ভূমির মালিক কেহ থাকিবে না।

বিনোবাজী বলেন যে, সমগ্র গ্রামদানের সুফল চারি প্রকার—(১) আর্থিক, (২) সংস্কৃতিগত, (৩) নৈতিক ও (৪) আধ্যাত্মিক। উহার ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যে ঃ—

(১) আর্থিক দিক—"সমগ্র গ্রামদানের প্রথম সুফল হইতেছে—আর্থিক-ক্রান্তি। ব্যক্তিগত মালিকানার লোপ হইয়া গ্রামের সমস্ত জমি এক হইয়া যাইলে গ্রামের লক্ষ্মী বৃদ্ধি পাইবে। কারণ, (ক) গ্রামের জন্য কোন্ ফসল কতটা পরিমাণ প্রয়োজন তাহার পরিকল্পনা করিয়া চাষ-আবাদের ব্যবস্থা হইবে, (খ) কৃষির উন্নতির জন্য সমবেত প্রচেষ্টা করা হইবে, (গ) সরকারী বা বাহিরের অন্যান্য সাহায্য পাওয়া সহজসাধ্য হইবে ও (ঘ) ব্যক্তিগতভাবে কাহারও ঋণ করার প্রয়োজন হইবে না। মোট কথায় ইহাতে গ্রাম-পরিকল্পনার বিশেষ সুবিধা হইবে। এরূপে গ্রামের আর্থিক-ক্রান্তি সাধিত হইবে।

(২) সাংস্কৃতিক দিক—"গ্রাম এক পরিবারের মত হইলে পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও সহানুভূতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। নিজের সুখে বা নিজের দুঃখে অন্যে অংশভাগী হইলে সুখ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও দুঃখের তীব্রতা হ্রাস পায়। তাই সমগ্রদানী গ্রামের অধিবাসীদিগের সুখ বাড়িবে ও দুঃখ কমিবে।

উপরন্তু ঐ সমগ্রদানী গ্রামের পরিবারকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি দূরীভূত হইলে গ্রামবাসীদিগের মনোভাব খেলোয়াড়-দলের মত হইয়া উঠিবে। কোন খেলোয়াড় একা না খেলিয়া যদি দলের সকলের সঙ্গে ও সহযোগে খেলে তবে সে তাহাতে সর্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ পায়। গণনৃত্যে নর্তকের অবস্থাও তদ্রূপ হয়। তাই সমগ্রদানী গ্রামের লোক এক পরিবারের মত সহযোগে থাকিবেন বলিয়া সর্বাপেক্ষা বেশী সুখ পাইবেন এবং দুঃখের কারণ ঘটিলে দুঃখ কম বোধ করিবেন।

(৩) নৈতিক দিক—"গ্রামীকরণের ফলে গ্রামবাসীদিগের নৈতিক মান উন্নীত হইবে।" বিবাদ-বিসম্বাদ, চুরি, উৎকট আচরণ প্রভৃতি চলিয়া যাইবে। কেহ কি নিজের ঘরে চুরি করে? মানুষ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য পৃথক-পরিবার ও পৃথক-সম্পত্তি সৃষ্টি করিয়াছে। এই ব্যক্তিগত স্বামীত্ব-বোধের দরুণ সমাজে নৈতিক অধঃপতন হইয়াছে। এক ভিক্ষুক দুই-চারিটি পয়সা এবং সামন্যে এক টুকরা সাবান তাহার একটি ছেঁড়া থলিতে সযত্নে বাঁধিয়া রাখিত। সেরূপ কেহ বা কয়েক আনা, কেহ বা কয়েক টাকা আর কেহ বা সহস্র-সহস্র টাকা নিজ-নিজ থলিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এইভাবে লোকের মন সংকীর্ণ হইয়াছে এবং তাহারা নিজেদের ঘর ছোট করিয়া বাঁধিয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের পরিবারের ধারণাকে অতি সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই পৃথিবীর সকল বিবাদ-বিসম্বাদের মূলে রহিয়াছে। যখনই ভূমি ও সম্পত্তির মালিকানা ঘুচিয়া যাইবে তখনই লোকের ও সমাজের নৈতিক মান উন্নীত হইবে সন্দেহ নাই। ইহাই সমগ্র গ্রামদানের সর্বোৎকৃষ্ট সুফল। তখন সমগ্র জগৎ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে। আজ সারা জগৎ দুঃখার্ত। পরস্পরের স্বার্থ-সংঘর্ষ হইতেছে দুঃখের হেতু। ইহার ফলে হিংসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। যদি গ্রামের ভূমি ও সম্পত্তি গ্রামেরই হইয়া যায় তবে জগৎ নৈতিক মান উন্নয়নের একটি পথ খুঁজিয়া পাইবে।

(৪) আধ্যাত্মিক দিক—"আধ্যাত্মিক দিকের বিষয় সর্বশেষে বলা হইতেছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার গুরুত্ব কম নহে। লোকে যখন বলে তখন 'ইহা আমার ঘর', 'উহা আমার ভূমি'—এইভাবে বলিয়া থাকে।

এই 'আমি', 'আমার'-বোধ মানুষকে আসক্তির দাস করিয়া রাখিয়াছে। যখন মানুষ এই 'আমি', 'আমার'-বোধ হইতে মুক্ত হইবে এবং ইহা উপলব্ধি করিবে যে জগতে যাহা কিছু আছে তাহা সকলেরই জন্য এবং জগতে এমন কিছু নাই যাহা 'আমি'-র ভোগের জন্য, তখন সে অচিরে মুক্তিলাভ করিবে। প্রত্যেকের মন আজ বন্ধনে আবদ্ধ। কারণ সে 'আমি', 'আমার'-বোধ ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। এই কারণেই মুনি-ঋষিরা মুক্তির যে-পথ প্রদর্শন করিয়াছেন সেই পথে চলিয়াও সুখ বা মুক্তি মিলিতেছে না। ইহা প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে, যদি মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া—গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তবে 'আমি', 'আমার'-বোধ চলিয়া যাইবে। কিন্তু এইরূপ নিষেধাত্মক পথে মুক্তিলাভ হইতে পারে না। সাধারণ কথায় যাহাকে ঘর বলা হয় তাহাকে যদি আমরা আমাদের প্রকৃত ঘর বলিয়া মানিতে রাজী না হই তবেই আমাদের মুক্তির পথ সুগম হইবে। আমাদের এই জ্বলন্ত বিশ্বাস থাকা চাই যে, সারা গ্রাম আমাদের ঘর এবং যে-ঘরে আমরা সাধারণত বাস করি এবং যাহাকে আমরা আমাদের নিজেদের ঘর বলিয়া মনে করি তাহা সকলের জন্য। 'আমি কাহারও জন্য নহি' এবং 'কেহ আমার জন্য নহে'— এই ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব নহে। 'আমি সকলের' এবং 'সকলে আমার'—এই বোধ জাগ্রত হইলে তবেই মুক্তিলাভ হইবে।

"অতীতে মুক্তিলাভের জন্য 'কিছুই আমার নহে'—এই ভাব সাধন করিবার বহু প্রযত্ন করা হইয়াছে। তাই সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার এবং লোকসংস্পর্শ হইতে দূরে গিয়া নির্জনে বাস করার ঝোঁক এই দেশে রহিয়াছে। এরূপ মনে করা হয় যে, ইহাই মুক্তির সহজতম উপায়। কিন্তু মুক্তিলাভের এরূপ কোন সোজা রাস্তা নাই। মানুষ সব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় বটে কিন্তু শেষে লেংটির উপরও তাহার আসক্তি থাকিয়া যায়। উহাতে কোন কাজ হয় না। অতএব আমাদের ইহা অনুধাবন করিতে হইবে যে, আমাদের যাহা কিছু আছে তাহা সবই গ্রামের। এমন কি আমরা নিজেরাও গ্রামের এবং গ্রাম আমাদের। এই বিশ্বাসের বলে অচিরে মুক্তি-লাভ হইয়া থাকে।"

প্রেম ও আত্মত্যাগবৃত্তির বিকাশ

আপাতদৃষ্টিতে জগৎ স্বার্থপর বলিয়া মনে হয়। যেদিকে তাকান যায়—স্বার্থপরতা, ঈর্ষা ও হিংসার লীলা। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে স্বার্থের সংঘর্ষ ও পরস্পরের প্রতি কেবল ঈর্ষা ও হিংসার বিকট প্রকাশ। এই অবস্থায় এত অল্প সময়ের মধ্যে সমস্যার তুলনায় নিতান্ত কম হইলেও এত বিরাট পরিমাণ ভূমি ভূদানযজ্ঞে প্রাপ্ত হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল?

মানুষের মধ্যে যেমন লোভ, হিংসা ও ঈর্ষা দেখা যায় তেমনি সাথে সাথে তাহার মধ্যে আত্মত্যাগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিও বিদ্যমান রহিয়াছে দেখা যায়। নিজের জীবনে ধীরে ধীরে হিংসা, ঈর্ষা ও লোভের ক্ষয়সাধন করিয়া অহিংসা ও প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রযত্ন মানুষ করিয়া আসিয়াছে। মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য এইখানেই। পশু প্রারম্ভে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। কিন্তু হিংসা-শক্তির ক্ষয় ও প্রেম-শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া মানুষ নিজের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। এইখানেই মানব সভ্যতার প্রকৃত বিকাশ সাধিত হইয়াছে। আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে মানুষের যে নমুনা এখনও দৃষ্টিগোচর হয়, আন্দামানের গহন বনে জরওয়াজ নামক মনুষ্য জাতির যে-হিংস্র মূর্তি দেখা যায় তাহা হইতে উপরোক্ত উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে কোন কোন মানুষ প্রেম ও আত্মত্যাগ বৃত্তিতে এতদূর পর্যন্ত উন্নীত হইয়াছেন, যাঁহাদিগকে 'নরনারায়ণ', 'ঈশ্বরের অবতার' পর্যন্ত আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে। ইহা বিশেষ ক্ষেত্র।

কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে প্রেম ও অহিংসা প্রতিষ্ঠায় মানবসভ্যতার বিকাশ এখন পর্যন্তও পরিবারের স্তরে সীমাবদ্ধ আছে। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে ত্যাগ ও প্রেমের বিকাশ সদাই দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা নিজের পরিবার-পরিজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। লোকে নিজের পরিবার-স্বজনের জন্য কতই না ত্যাগ করে, কতই না দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকে। ঘরে ঘরে প্রেম ও ত্যাগের অনুপম মনোবৃত্তি ছড়াইয়া রহিয়াছে। মাতা-পিতা পুত্র-কন্যার জন্য, সন্তান মাতা-পিতার জন্য, স্ত্রী স্বামীর জন্য ও স্বামী স্ত্রীর জন্য

যে-আত্মত্যাগ ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া থাকে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যদি মানুষ সারা গ্রামকে নিজের পরিবার বলিয়া গণ্য করিতে পারে—যদি মানুষ দরিদ্রকে নিজের পরিবারের একজন ও দরিদ্র ভূমিহীনকে নিজের পরিবারের অন্যতম অংশীদার বলিয়া গণ্য করিতে পারে তবেই ভূদান-যজ্ঞ অবিলম্বে পূর্ণ সফলতা লাভ করিবে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানুষ যত সংস্থা সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তন্মধ্যে পরিবার-সংস্থা মহত্তম। এখানে মানুষ অন্যের জন্য ত্যাগ ও দুঃখকষ্ট বরণ করিতে শিক্ষা করিয়াছে। অন্যের মধ্যে নিজেকে বিকশিত ও সম্প্রসারিত করিতে শিক্ষা করিয়াছে। অন্যকে নিজের বিকাশ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করিয়াছে। কিন্তু মানবসভ্যতার প্রগতি ঐখানেই বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। কারণ মানুষ পরিবারের মধ্যে আত্মত্যাগ ও আত্মবিকাশের যে শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহাকে পরিবারের মধ্যে, নিজ পুত্র-পরিজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে—তাহাকে গ্রাম বা সমাজে সম্প্রসারিত করে নাই। তাই ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য মানবসভ্যতাকে—প্রথমত ভারতীয় সভ্যতাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা। ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য—পরিবারের পরিধির ধারণাকে সম্প্রসারিত করা, প্রেম ও ত্যাগের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা; গ্রামকে—সারা সমাজকে নিজের পরিবার বলিয়া গণ্য করা ও দরিদ্রকে—দরিদ্রভূমিহীনকে নিজের ষষ্ঠ পুত্র বলিয়া গণ্য করা। তাই বিনোবাজী বলিয়াছেন—"আমি কেবল এইমাত্র চাহিতেছি যে, আপনারা আপনাদের সন্তানের প্রতি যেমন স্নেহ পোষণ করেন সেইরূপ স্নেহমমতা যেন অন্যের সন্তান-সন্ততির প্রতিও পোষণ করেন।" মানুষের আত্মার শক্তি, মানুষের প্রেম ও আত্মত্যাগের শক্তি অপরিসীম। কিন্তু বর্তমানে নিজের পরিবার-পরিজনের সীমার বাহিরে তাহা সুপ্ত। এই সুপ্ত শক্তিকে কিরূপে জাগ্রত করা সম্ভব?

এই সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে প্রথমে জনমানসে চিন্তা-বিপ্লব বা বিচার-বিপ্লব আবশ্যক। ব্যক্তিগত সম্পত্তি-বোধের ভিত্তির উপরই বর্তমান সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। তাই এই বিচার-বিপ্লব হইবে—জন-মানস হইতে স্বামিত্ববোধ দূর করায়। কিরূপে এই বিচার-বিপ্লব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে?

যেমন আত্মার শক্তি অপরিসীম তেমনি বিচার বা চিন্তার শক্তিও অপরিসীম। কোন চিন্তাধারা কোন এক মানুষের অন্তরে এমন লাগিয়া যায় যে, উহা তাহার জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে। দেখা যায় কোন কোন শ্রেষ্ঠ মানুষের বিচারধারায় এমন শক্তি নিহিত থাকে যে, তাহা অন্য মানুষের জীবনে—শুধু তাহা নহে সমগ্র সমাজজীবনেই আমূল পরিবর্তন আনিয়া দেয়। ইহার জন্য বিচারধারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। ভূদানযজ্ঞের অন্তর্নিহিত বিচারধারা সত্যের ভিত্তির উপর আধারিত ও উহা ভারতীয় সমাজের বর্তমান অবস্থায় যাহা আশু প্রয়োজন তাহারই অনুকূল। এই বিষয়টি আরও একটু পরিষ্কারভাবে বুঝিয়া লওয়া যাউক। সাধারণভাবে ধর্ম-প্রচার করা এবং ক্রান্তি (যাহাকে বিনোবাজী ধর্ম-চক্র-প্রবর্তন বলেন) সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা করা—দুইটি পৃথক ব্যাপার। মুনি-ঋষিগণ তো সর্বদা ধর্ম-শিক্ষা দিয়া থাকেন ও তাহা প্রচারও করিয়া থাকেন। কিন্তু সময়ের প্রয়োজন কি, যুগের দাবী কি—তাহা চিনিয়া লইয়া তাহার সহিত ধর্ম-বিচার যুক্ত করিয়া দেওয়া ভিন্ন কথা। উহাই ক্রান্তির পথ। উহাই ধর্মচক্র-প্রবর্তনের পদ্ধতি। অর্থাৎ সৎ-পুরুষ আসেন এবং নিত্য প্রয়োজনের জন্য ধর্ম-প্রচার করেন। ইহা চিরদিনই হইতেছে। তাহাতে ব্যাপকভাবে কোন হৃদয় পরিবর্তন হয় না। কিন্তু যখন কোন ধর্ম-বিচার যুগের দাবীর সহিত যুক্ত হয় তখন হৃদয়-পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। তাই গান্ধীজী দেশকে সাম্প্রদায়িক অহিংসার পথে লইয়া যাইতে সক্ষম হন। বিরোধীর সহিত সপ্রেম আচরণ করা ও অহিংসার পথে দ্বন্দ্ব করা পুরাতন কথা। কিন্তু তখন যুগের দাবী ছিল স্বরাজ। তাই তিনি যদি উহাকে স্বরাজের সহিত যুক্ত না করিতেন তবে তিনি আর কয়জন অনুগামী পাইতেন? ইংরেজ বিরাট শক্তিশালী ও অস্ত্রবলে বলীয়ান ছিল। আমরা নিরস্ত্র। তাই অহিংসপন্থায় ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করা সমীচীন ছিল। কিন্তু শুধু তাহাতেই হইত না। দেশের পরিস্থিতিও উহার অনুকূল ছিল। ঐভাবে আন্তরিক ধর্ম-বিচারের বল ও পরিস্থিতির বল—এই উভয়কে যুক্ত করিয়া তিনি দেশকে অহিংসা শিক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদ্রূপ ভূমিহীন দরিদ্রের আজ ভূমি চাই। কেবলমাত্র এই দেশে নহে—সারা দুনিয়ায়—বিশেষত

এসিয়া মহাদেশে। জমি না পাইলে কিছুতেই তাহারা শান্ত থাকিবে না—পরিস্থিতি এই। ইহার সঙ্গে আজ এক ধর্মবোধ জাগ্রত হইতেছে—ভূমিতে সকলের সমান অধিকার। ক্ষুধার্ত ভূমিহীন প্রতিবেশীকে ভূমি দেওয়া চাই। সকলকেই উৎপাদক-শ্রম করিতে হইবে, তবেই প্রকৃত শান্তিময় সাম্য আসিবে। উৎপাদক-শ্রমের মর্যাদার প্রতিষ্ঠা চাই। যদি পাঁচশত, হাজার বৎসর পূর্বে এই ধর্মবিচার প্রচার করা হইত তবে কেহ তাহা শুনিত না। কিন্তু আজিকার পরিস্থিতি এই ধর্ম-বিচার শুনিবার ও অনুসরণ করিবার অনুকূলে। এই ধর্ম-বিচারের শক্তি ও বর্তমান পরিস্থিতির শক্তি একসঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। বাহিরের পরিস্থিতির ফলে ধর্মবিচার সহজে হৃদয়ে ক্রিয়া করে ও তাহাতে হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। আবার হৃদয় পরিবর্তিত হইলে উহার ফলস্বরূপ বাহিরের পরিস্থিতিও প্রভাবিত হয়। একে অন্যের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করিতে থাকে। যেমন ফল হইতে বীজ, আবার বীজ হইতে ফল।

কিন্তু এই বিচারধারা সমাজে ব্যাপকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আর একটি জিনিসের প্রয়োজন। এই বিচারধারা কে প্রবর্তন করিতেছেন? একমাত্র উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ জীবনই অন্য জীবনকে শোধন ও উন্নীত করিতে পারে। যদি পৃথিবীতে একজন মাত্র খাঁটি সত্যাগ্রহী থাকেন, তবে তাঁহার প্রভাব সারা পৃথিবীর উপর পড়িয়া থাকে এবং সারা পৃথিবীর হৃদয় তাঁহার প্রভাবে দ্রবীভূত হইয়া থাকে। তবে তাঁহার হৃদয়ে সারা দুনিয়ার প্রতি প্রেম থাকা চাই। আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন মানুষের আবির্ভাব হয়—জগত্-কল্যাণই যাঁহারে একমাত্র কাম্য ও লক্ষ্য, যাঁহার জীবনে অন্যের সুখ-বিধানের জন্য আত্মত্যাগ ভিন্ন আর কিছু নাই, যাঁহার প্রেম সর্বব্যাপী হইয়াছে এবং যিনি 'আত্মৌপম্য'-বুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ যিনি সর্বজীবের সুখ-দুঃখ নিজেরই সুখ-দুঃখ বলিয়া অনুভব করেন এবং যিনি সর্বত্র সমবুদ্ধি-সম্পন্ন—সোজা কথায় যিনি প্রকৃত সত্যাগ্রহী। এরূপ মানুষকে আমরা মহাপুরুষ, মহাত্মা ইত্যাদি আখ্যা দিয়া আমাদের অন্তরের পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকি। এরূপ মানুষের আহ্বানে, তাঁহার দর্শনে, তাঁহার বাণী শ্রবণে আমাদের অন্তর্নিহিত ত্যাগবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হয়, আমাদের সুপ্ত

আত্মশক্তি জাগ্রত হয়, আমাদের অন্তরস্থিত সংকীর্ণতার বন্ধন ছিন্ন হয় ও আমাদের অন্তরের নির্বাপিত আলো প্রজ্বলিত হয়। তিনি যে চিন্তাধারা মানুষকে গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন তাহা মানুষের জীবনে অচিরে অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। তিনি ত্যাগ বা দুঃখ-কষ্ট বরণের জন্য আহ্বান করিলে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে মানুষ ত্যাগ-ব্রতে উদ্বুদ্ধ হইয়া সমাজ-কল্যাণের পথে অগ্রসর হয় এবং সমাজে ক্রান্তি (বিপ্লব)* আনয়ন করে। এমন

---

* হিন্দীতে 'বিপ্লব' শব্দের পরিবর্তে 'ক্রান্তি' শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাংলা ভাষায় 'বিপ্লব' অর্থে 'ক্রান্তি' শব্দের ব্যবহার এখনও করা হয় নাই। আমার মনে হয় বাংলা ভাষায়ও 'বিপ্লব' শব্দের পরিবর্তে 'ক্রান্তি' শব্দ প্রচলিত হওয়া উচিত। করাণ ঐ দুইটি শব্দের অর্থের তুলনা করিলে বুঝা যাইবে যে 'ক্রান্তি' শব্দই সঠিক ভাব-ব্যঞ্জক। 'বিপ্লব' শব্দ 'প্লু' ধাতু হইতে উদ্ভূত। উহার অর্থ 'প্লবন' বা 'প্লাবন'। উহার ভাব negative বা নঞ বোধক। 'বি' উপসর্গের যোগে উহার negative ভাব (নঞ্) আরও ভালভাবে ফুটিয়া উঠে ও ধ্বংসাত্মক ভাব সূচিত হইয়া থাকে। কারণ 'বি' উপসর্গ 'বিশেষ' 'বৈরূপ্য' ও 'নঞ্' বাচক। উপরন্তু উহাতে হিংসার অস্তিত্বের আভাসও আসে। এজন্য 'বিপ্লবের' আভিধানিক অন্যান্য অর্থ— 'উপদ্রব', 'বিদ্রোহ', 'অস্ত্র-কলহ', 'অব্যবস্থা' ইত্যাদি। অন্যদিকে 'ক্রান্তি' শব্দ 'ক্রম্' ধাতু হইতে উদ্ভূত। উহার অর্থ হইতেছে 'গতি'। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সূর্যের গতি-পথকে 'ক্রান্তি' বলে। সূর্যের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে যাওয়ার নাম 'সংক্রমন' বা 'সংক্রান্তি'। খ-গোল মধ্যবর্তী সূর্য-গমনার্থ তির্যগ গোল রেখার নাম ক্রান্তি। এই রেখায় সূর্যের বার্ষিক গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই গতির ফলে এক ঋতুর পর অন্য ঋতুর উদয় হয়, পুরাতন বর্ষের পর নূতন বর্ষের আবির্ভাব হয়; বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতে হইতে অয়নাংশ অতিক্রান্ত হইয়া থাকে এবং অতঃপর যুগ পরিবর্তন হয়। তাই ক্রান্তি শব্দের সাধারণ অর্থ—এক অবস্থা হইতে বিরাট পরিবর্তনের দ্বারা অন্য অবস্থা প্রাপ্তি। এক অবস্থা অতিক্রম করিয়া অন্য অবস্থায় উপনীত হওয়ার ভাব ইহাতে আছে। বিনাশ সাধন করা ইহার ভাবার্থে নাই অর্থাৎ ইহা positive (বিধায়ক)। সূর্যের ক্রান্তির দ্বারা প্রথমে ঋতু পরিবর্তন পরে বর্ষ পরিবর্তন, বর্ষের পর বর্ষ যাইতে যাইতে অয়নাংশ পরিবর্তন ও সর্বশেষে যুগ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তেমনি ক্রান্তি প্রথমে মানুষের চিন্তায়, পরে বাক্যে ও পরে কার্যে উদিত হয়। ক্রান্তিকারক কার্য প্রথমে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিতে ও পরে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিতে বিকাশ হয় এবং অবশেষে

একজন মহামানব সম্প্রতি আমাদের মধ্যে ছিলেন তিনি হইতেছেন—মহাত্মা গান্ধী। তাঁহার আহ্বানে সারা ভারত ত্যাগ-মন্ত্রে ও দুঃখ-কষ্ট বরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া উথলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগামী আচার্য বিনোবা ভাবের মধ্যে অনুরূপ বিভূতির বিকাশ হইয়াছে। তাই তাঁহার প্রবর্তিত বিচার এত অল্পদিনের মধ্যে সর্বশ্রেণীর সর্বস্তরের লোক গ্রহণ করিতে আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছে। দেশের বালক-বালিকারা পর্যন্ত ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কে জানিয়া গিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে দেশের অনেক স্থানে উহা ক্রান্তিকারক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের বিরাট সমস্যার তুলনায় নিতান্ত অল্প হইলেও অল্পদিনের মধ্যে লোকে প্রেমভরে তাঁহার হস্তে ৪০ লক্ষ একরের উপর ভূমি সঁপিয়া দিয়াছে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে মনন ও অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই যে মহাত্মা ও মহাপুরুষের কথা উপরে বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তিনি কে? আত্মা অনন্ত গুণসম্পন্ন। আত্মা অনন্ত শক্তিতে ভরা। সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজনের তাগিদে সমাজের সেই পরিস্থিতি-উদ্ভুত সমস্যার সমাধানের জন্য আত্মার এমন এক গুণ বা শক্তির বিকাশ হওয়ার আবশ্যকতা আসে যাহার আবির্ভাব পূর্বে হয় নাই। তখন আত্মার সেই বিকাশ সাধিত হয় এবং মানুষের হৃদয়ে সেই শক্তি বা গুণের আবির্ভাব হয়। ইহার অন্ত নাই। যখনই প্রয়োজন আসিবে তখনই আত্মায় তদুপযোগী গুণের বিকাশ সাধিত হইবে এবং সমাজের কাজ চলিতে থাকিবে। এ পর্যন্ত আত্মার যত গুণ বা শক্তির বিকাশ হইয়াছে তাহাই শেষ, আর কোন নূতন গুণ বা শক্তির বিকাশ হইবে না—এরূপ মনে করা সংকীর্ণতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। আত্মার গুণ বা শক্তির ঐ আবির্ভাবকে বিনোবাজী অবতার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যে যুগপুরুষের মাধ্যমে ঐ গুণ বা শক্তির আবির্ভাব ও বিকাশ হয় তিনি প্রকৃতপক্ষে অবতার নহেন; তিনি নিমিত্তমাত্র। তাই বিনোবাজী বলিয়াছেন "অবতারের অর্থ এই যে—মানবের হৃদয়ে শক্তির আবির্ভাব হওয়া। যেখানে

উহা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য বাংলা ভাষায়ও বিপ্লবের স্থলে ক্রান্তি শব্দ ব্যবহার করা শ্রেয়ঃ। তাই এই পুস্তিকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপ্লবের স্থলে 'ক্রান্তি' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

সত্যনিষ্ঠার আবির্ভাব হইল সেখানে উহা রামচন্দ্রের রূপ গ্রহণ করিল। যেখানে নিষ্কাম কর্মযোগ প্রকাশিত হইয়াছিল সেখানে উহা শ্রীকৃষ্ণের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। বুদ্ধের মধ্যে করুণা মূর্তিমতী হইল; তাই আমরা বুদ্ধকে অবতার বলিয়া মান্য করিলাম। ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হইয়া আমরা মনুষ্যকে অবতার বলিয়া মান্য করিয়া থাকি। দেখিবার মত কিছু ইন্দ্রিয়ের জন্য আবশ্যক হয়। এইজন্য উহা রূপ সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে রাম, কৃষ্ণ বা বুদ্ধ অবতার নহেন। সত্যনিষ্ঠা, নিষ্কাম কর্মযোগ এবং ভূতদয়ার অবতার সেই সেই ক্ষেত্রে হইয়াছিল। যেখানে এরূপ মানবতার শক্তি আবির্ভূত হইয়াছিল সেখানেই অবতার হইয়াছিল। কিন্তু মানুষ তাহাতে মূর্তিপূজা আরোপ করিল। উহাতে উপাসনার সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু শরীর অবতার নহে; মানব হৃদয়ে আবির্ভূত ভাবাবলীই হইতেছে অবতার। যেমন-যেমন আধ্যাত্মিক বিকাশ হইতে থাকিল তেমন-তেমন উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ অবতারের আবির্ভাব হইতে লাগিল। উহাই সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়া। ইংরেজ ভারতবর্ষে আসিয়া তাহাদের শাসন কায়েম করিল। তাহারা এক চমকপ্রদ ব্যাপার দেখাইল। সমগ্র দেশকে নিরস্ত্র করিয়া দিল। তখন দেশের সম্মুখে এক সমস্যা দেখা দিল। হয় সারা দেশকে চিরদিন ইংরেজের গোলাম হইয়া থাকিতে হইবে, না হয় তাহাকে এমন শক্তি আবিষ্কার করিতে হইবে যে-শক্তিবলে বিনা অস্ত্রে সংকটের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব হইবে ও দেশকে মুক্ত করিতে পারা যাইবে। পরিস্থিতি বশত যখন এমন প্রয়োজন দেখা দিল তখন অহিংস প্রতিকার ও সত্যাগ্রহের আবিষ্কার হইল। মহাত্মা গান্ধী উহার নিমিত্তমাত্র হইলেন। আমি কয়েকবার একথা বলিয়াছি যদি মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব না হইত তবে তাঁহার স্থলে অন্য কাহারও আবির্ভাব হইত। কিন্তু ঐ শক্তির আবিষ্কার হইতেই উহা হইত। প্রয়োজন ছিল—ঐ শক্তিরই আবির্ভাবের। কেননা পরিস্থিতি ও কালের চাহিদা ছিল তাহাই। লোকে দেখিল যে, অহিংসা এক বিরাট শক্তি যাহার সহায়ে এত বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত বিরোধ করিতে পারা সম্ভব হইল এবং উহাকে ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইল। উহা হইতে এক চমৎকার ব্যাপার এই হইল যে, অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।

অত্যাচারী আর অত্যাচারী রহিল না। উভয়ে পরস্পরের বন্ধু হইল। এই প্রকারের শক্তির আবির্ভাব হইল এবং তাহার দ্বারা আমরা স্বাধীনতা লাভ করিলাম। স্বাধীনতার জন্য অনেক দেশই অনেক প্রকার প্রযত্ন করিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষের ইহা বিশেষ আবিষ্কার। কারণ ইহাতে মানব-হৃদয়ে নব-শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর এখন ভারতের আর্থিক স্বাধীনতা, দরিদ্রতা নিবারণ ও সাম্যযোগ প্রতিষ্ঠার কার্য উপস্থিত হইয়াছে। এই জন্য আর্থিক ক্ষেত্রে তদুপযোগী শক্তির আবিষ্কার হওয়া প্রয়োজন হইয়াছে এবং সেই শক্তির আবির্ভাব হইতেছে।" সেই শক্তির নাম 'সর্বোদয়'। সর্বোদয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য যে বুনিয়াদী শক্তির প্রয়োজন তাহা আজ সন্ত বিনোবাজীর মাধ্যমে বিকশিত হইতেছে। এখানে বিনোবাজী নিমিত্তমাত্র। তাই একথা বলা ঠিক হইবে না যে যাহা এ পর্যন্ত হয় নাই তাহা ভবিষ্যতে কিরূপে হইবে?

এই বিষয়টি আরও একভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যখনই ঐরূপে আত্মার শক্তির আবির্ভাব হইবার প্রয়োজন হয় তখনই ভগবান তাহা এক মন্ত্ররূপে প্রদান করিয়া থাকেন। বিনোবাজী বলেন যে, মন্ত্রের অবতার প্রকৃত অবতার। যে বিশিষ্ট মনুষ্যের মাধ্যমে ঐ মন্ত্র ফলবতী হইয়া থাকে তাঁহাকে আমরা অবতার বলিয়া মানিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি নিমিত্তমাত্র অবতার।

যখন ইহা বুঝা গেল যে, দেশের সকল দুঃখের মূলে পরাধীনতা এবং কেবলমাত্র ছোট ছোট দুঃখ দূর করিলে চলিবে না তখন দাদাভাই নৌরজী স্বরাজের মন্ত্র দেশের সম্মুখে রাখিলেন। তখন হইতে ঐ মন্ত্রের সাধনা হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এক বিরাট শক্তিশালী জাতি এই দেশ শাসন করিতেছিল। তাহাদের হাতে অস্ত্র ছিল। আর এই দেশকে তাহারা নিরস্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল। তাই মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িক অহিংসার ভিত্তিতে 'ভারত ছাড়' মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। উহা বিরাট গণ-আন্দোলনে পরিণত হইল। সরকার উহাকে দমন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। মনে হইয়াছিল যে, আন্দোলন দমিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হইল না। মন্ত্রকে কখনও দমন করা যায় না। উহার পশ্চাতে দর্শন থাকে ও

শক্তি থাকে। উহা সূর্য-কিরণের ন্যায় সর্বত্র পৌঁছায় ও সকলের হৃদয়ে প্রবেশলাভ করে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ঐ মহান্ মন্ত্রোচ্চারণের পাঁচ বৎসর পরে ইংরেজকে ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইল। মন্ত্র ফলবতী হইল ও আমরা স্বরাজ লাভ করিলাম। এক মন্ত্রের পূর্তি হইল এবং ভগবান আমাদিগকে অন্য মন্ত্র প্রদান করিলেন। সমাজের কাজ এইরূপে চলিতে থাকে।

এরূপে মন্ত্রের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—"পরমেশ্বর এক পরমতত্ত্ব। ঐ তত্ত্ব হইতে মন্ত্র স্ফুরিত হইয়া থাকে। মন্ত্র হইতে মহাপুরুষগণ প্রেরণা পাইয়া থাকেন। মহাপুরুষদের বিচার সমাজকে চেতনা দান করিয়া থাকে। পরমেশ্বর প্রেরণার ক্ষেত্র ও মন্ত্রের মূল। মন্ত্ররূপে পরমতত্ত্ব প্রকটিত হইয়া থাকে। এক অবতারের কাজ পূর্ণ হইয়া গেলে দ্বিতীয় অবতার আসিয়া থাকে। তাহাতে সংসার সকল সময়ের জন্য সতেজ থাকে। ইহা ঈশ্বরের লীলা। রামচন্দ্রের সময় এক মন্ত্র আসিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সময় দ্বিতীয় মন্ত্র আসিল। বুদ্ধের সময় তৃতীয় মন্ত্র আসিল। এইভাবে মন্ত্রের পর মন্ত্র পাওয়া গেল ও পৃথিবীর উন্নতি হইতে থাকিল।

"এক মন্ত্র অন্য মন্ত্রের জন্ম দিয়া চলিয়া যায়। এইভাবে বীজ হইতে ফল হয় এবং ফল হইতে বীজ হয়। এক বীজ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং আর একটি বীজ অংকুরিত হয়। এইরূপে এক মন্ত্র পূর্ণ হয় তখন অন্য মন্ত্রের আবির্ভাব হয়। পৃথিবীতে কোন জিনিসের নাশ হয় না। ইহা বিজ্ঞানের শিক্ষা। স্বরাজমন্ত্ররূপ অবতারের পূর্তি হইয়া গেল। তখন মহাত্মা গান্ধী আর একটি মন্ত্র দেশকে প্রদান করিলেন। তিনি ঐ মন্ত্র পূর্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। উহার নাম "সর্বোদয়"। ঐ মন্ত্রের বীজ স্বরাজ-আন্দোলনের মধ্যে বপন করা ছিল। স্বরাজ-প্রাপ্তির পর উহা অংকুরিত হইয়াছে।"

সর্বোদয়ের রূপ বিরাট ও ব্যাপক। উহার এক-এক ভাগ লইয়া আমরা কাজ করিতে পারি। ভূমি-সমস্যা সর্বোদয়ের বুনিয়াদ। আজ বিনোবাজী ভূদানযজ্ঞের মন্ত্র দেশকে দিয়াছেন।

ভারতে আত্মজ্ঞানের বিকাশ

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় গভীরভাবে বুঝা আবশ্যক। ভূদানযজ্ঞ সত্যের উপর আধারিত এক মহান বিচার বা সিদ্ধান্ত এবং সেই বিচার দেশের বর্তমান জরুরী প্রয়োজনের অনুকূল। উপরন্তু উহার প্রবর্তক ও প্রচারক আত্মত্যাগী ও বিশ্বপ্রেমিক এক সন্ন্যাসী মহাপুরুষ। কেবলমাত্র এই তিনটি কারণ যুগপৎ বিদ্যমান থাকায়ই কি এত অল্পদিনের মধ্যে ভূদানযজ্ঞের এতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছে? অথবা এই তিন কারণ ছাড়া এমন আর কিছু আছে যাহার জন্য ইহা সম্ভব হইতে পারিয়াছে?—হ্যাঁ, তাই। ভারতের চরিত্রে এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যেজন্য ভারতীয় জনগণ ভূদানযজ্ঞকে এমন সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছে। তাহা হইতেছে এই যে. ভারতের হৃদয় অর্থাৎ ভারতীয় মানুষের হৃদয় নির্মল ও অবিকৃত আছে। মহাত্মা গান্ধী একথা বলিতেন, বিনোবাজীও এই কথা বলেন। এইজন্য ভূদানযজ্ঞের বিচার জনসাধারণকে এত সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে বুঝানো সম্ভব হইয়াছে এবং উহা এত সহজে গণহৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে। হৃদয় পবিত্র ও অবিকৃত থাকার লক্ষণ কি? আমরা মস্তিষ্কপ্রসূত বুদ্ধির দ্বারা কোন বিষয় বুঝিয়া থাকি। কিন্তু কোন সৎ বিচার বুঝিলে বা উহার সম্বন্ধে জ্ঞান হইলেই মানুষমাত্রই তদনুসারে আচরণ করে না। কেবলমাত্র যাহার হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্মল সেই ব্যক্তিই উহার সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ আচরণ করিতে থাকে। এতদিন যে সে-ব্যক্তি তদ্রূপ আচরণ করে নাই তাহার একমাত্র কারণ এই যে, এতদিন ঐ সম্পর্কে তাহার জ্ঞানের অভাব বা অজ্ঞতা ছিল। কিন্তু যাহার হৃদয় নির্মল ও স্বচ্ছ নহে সেই ব্যক্তিকে উহা বুঝাইলে সে বুদ্ধি দিয়া উহা বুঝিবে কিন্তু সহজে সে তদনুরূপ আচরণ করিতে পারিবে না। এ বিষয়ে তাহার যে জ্ঞান তাহা হইবে শাব্দিক জ্ঞানমাত্র। ঐ জ্ঞান তাহার হৃদয়ের উপর সহজে ক্রিয়া করে না। অন্যকে নিজের মত করিয়া দেখা ও তাহার প্রতি তদনুরূপ আচরণ করা 'আত্মৌপম্য'-বৃত্তি। প্রতিবেশীকে নিজের মত করিয়া দেখা ও তদনুরূপ আচরণ করা সর্বোদয়ের মূল কথা এবং উহাই ভূদানযজ্ঞের প্রেরক ভাবনা। ইহার সারমর্ম এই যে, আমরা যেন নিজেকে একটিমাত্র দেহে সীমাবদ্ধ বলিয়া না ভাবি। আমাদের প্রতি-

বেশী, শুধু তাহা নহে, সারা সমাজ আমাদের নিজেদের ব্যাপক রূপ। সাধারণভাবে ভারতীয় মানুষের হৃদয় নির্মল ও শুদ্ধ। কিন্তু তাহার আত্মজ্ঞান সংকুচিত হইয়া রহিয়াছে, কারণ তাহাকে আত্মজ্ঞানের ব্যাপকতা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই।

আমাদের মুনি-ঋষিগণ ব্যক্তিগত ধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন কিন্তু সামুদায়িক ধর্ম শিক্ষা দেন নাই; তাই ভারতের হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্মল থাকা সত্ত্বেও ভারতের পক্ষে এতদিন সামুদায়িক ক্ষেত্রে এই 'আত্মজ্ঞান'-ধর্ম আচরণ করা সম্ভব হয় নাই। বিনোবাজী বলেন—"আমি গ্রামে গ্রামে যাইয়া একই জিনিস বুঝাইতেছি। উহার সার এই—নিজেকে দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া ভাবিবেন না। ভারতে এরূপ বেদান্তের প্রচার কম হয় নাই। আত্মা সর্বব্যাপক—এই কথা তো এই দেশের সব লোকে মুখে বলে। কিন্তু শাব্দিক জ্ঞান এক কথা, আর সেই বিচারের প্রয়োগ জীবনে করা অন্য কথা। ভারতবর্ষে শাব্দিক জ্ঞান এতদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে যে, কেবলমাত্র মানুষের মধ্যে নহে পরন্তু প্রাণীমাত্রেই একই আত্মা বিরাজমান ইহা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আত্মা এতই সংকুচিত হয় যে, কেবলমাত্র নিজের শরীর ও উহার আশপাশ ভিন্ন সে চিন্তা করে না। ভারতের আত্মজ্ঞান এতই সংকুচিত হইয়াছে। মা নিজের সন্তানের জন্য ত্যাগ করেন; কারণ সন্তানের মধ্যে তিনি নিজের স্বরূপ দেখেন। তাঁহার আত্মজ্ঞান তাঁহার সন্তান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। মা নিজের সন্তানকে স্নেহ করেন কিন্তু অন্যের সন্তানের প্রতি তাঁহার সে স্নেহ নাই; কারণ তাঁহার মধ্যে তিনি নিজের আত্মাকে অনুভব করেন না। মুখে বলিতে যাইলে তো আত্মজ্ঞানের কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু মা অনুভব করেন যে তাঁহার আত্মা কেবল তাঁহার নিজের সন্তান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। সংস্কৃতে ছেলেকে সন্তান বা সন্ততি বলা হয়। সন্ততি অর্থাৎ বিস্তার। মা বুঝিয়া থাকেন যে, সন্তান আমারই বিস্তার, আমারই রূপ। এই পর্যন্ত তাঁহার আত্মজ্ঞান সীমাবদ্ধ। কিন্তু এখন হইতে তাঁহার এই জ্ঞান হওয়া চাই যে নিজের রূপ এত ছোট নহে; উহা ব্যাপক।" আজ ভূদানযজ্ঞের মাধ্যমে ভারতবাসীকে তাহার আত্মজ্ঞানের বিস্তারসাধন করা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং তাই যেখানে

আত্যন্তিকভাবে কাজ করা হইতেছে সেখানে লোকে অতি শীঘ্র ভূদানযজ্ঞকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেছে। অবশ্য ইহার পশ্চাতে মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষার মহান্ পটভূমিকা রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভূদানযজ্ঞের বিচার মহাত্মা গান্ধীপ্রদত্ত শিক্ষার ভিত্তির উপরই গড়িয়া তোলা সৌধ।

ভারতের আত্মজ্ঞানের বিকাশসাধন সম্পর্কে বিনোবাজী আরও বলিয়াছেন—"কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, আমাদের হৃদয়ে তেমন খারাপ কিছু নাই। যদি তাহা থাকিত তবে ভূদানযজ্ঞের এত ব্যাপক প্রচার হইত না। এইজন্য আমি মনে করি যে. ভারতের হৃদয় স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও নির্মল আছে। কিন্তু আমাদের আত্মজ্ঞান সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। শিশুদের হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্মল থাকে কিন্তু উহাদের জ্ঞান থাকে না। তাই তাহারা অন্যকে কষ্ট দিতে পারে। কুকুরও অন্য কুকুরের নিকট হইতে খাবার কাড়িয়া লয়; কারণ উহার আত্মজ্ঞান অত্যন্ত সংকুচিত। উহার নিজের দেহের জ্ঞান আছে কিন্তু আত্মার জ্ঞান নাই। শিশুদের অবস্থাও এইরূপ। কেবলমাত্র খাওয়ার কথা শিশুরা জানে। কেননা উহাদের হৃদয় নির্মল বটে কিন্তু উহাদের আত্মার জ্ঞান নাই। যেখানে উহাদিগকে আত্মার জ্ঞান শিখাইয়া দেওয়া হয় সেখানে উহারা তাহা তাড়াতাড়ি বুঝিয়া লয়। আমি দেখিয়াছি যেখানে পিতামাতা শিশুদিগকে আত্মজ্ঞান এইভাবে শিক্ষা দেন যে. নিজের জিনিস অন্যকে দিতে হয়. সেখানে তাহারা অন্যকে কিছু দিতে আনন্দ পায়। শিশু জন্মগ্রহণ করিয়া দেহেই সীমাবদ্ধ থাকে। দেহ অপেক্ষা বড় কিছু সে ভাবিতে পারে না; কারণ তাহার আত্মার জ্ঞান থাকে না। কিন্তু যখনই তাহাকে আত্মার জ্ঞান বুঝাইয়া দেওয়া হয় তখনই উহা সে বুঝিয়া লয়। উহার সংস্কারের আবশ্যকতা থাকে। সেইরূপ ভারতের হৃদয় শুদ্ধ, নির্মল কিন্তু তাহার সংস্কারের প্রয়োজন রহিয়াছে। ভারতবাসীকে ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন আছে যে, 'ভাই, তুমি নিজেকে দেহেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছ। উহা ভুল। সমগ্র সমাজ আত্মার ব্যাপক রূপ; নিজেরই সন্ততি।'—এই কথা বুঝাইয়া বলাতে লোকে বুঝিতেছে। ইহা আমার অনুভব।"

ভারতবাসীর আত্মজ্ঞান সম্পর্কে বিনোবাজীর যে দুইটি প্রবচনের

অংশ উপরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অসামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। তাহা এই। বিনোবাজী এক স্থানে বলিতেছেন —ভারতে বেদান্তের প্রচার কম হয় নাই। আত্মা সর্বব্যাপক—এই কথা তো এই দেশের সব লোক মুখে বলে। শুধু মানুষের মধ্যে নহে—এমন কি প্রাণীমাত্রেই একই আত্মা বিদ্যমান। কিন্তু উহা শাব্দিক জ্ঞানমাত্র। তাই উহা হৃদয়ের উপর ক্রিয়া করে নাই। কিন্তু অন্যস্থানে তিনি বলিতেছেন— আমাদের আত্মজ্ঞান সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতের হৃদয় স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও নির্মল আছে। তাই ভূদানযজ্ঞের বিচারের মাধ্যমে ভারতের জনসাধারণকে আত্মজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া মাত্র উহা তাহাদের হৃদয়ের উপর এত তাড়াতাড়ি ক্রিয়া করিতেছে। একটু গভীরভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিলে ইহাতে যে কোন অসামঞ্জস্য নাই তাহা বুঝা যাইবে। আত্মা সর্বব্যাপক— ইহা শিক্ষা দেওয়া বা এই জ্ঞান হওয়া এক কথা; আর এই আদর্শকে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার প্রক্রিয়া ও কৌশল শিক্ষা দেওয়া পৃথক কথা। মা যদিও তাঁহার শিশুকে এই শিক্ষা দেন যে, শুধু মানুষের মধ্যে নহে— প্রাণীমাত্রেই একই আত্মা বিরাজিত, তথাপি শিশু অন্য প্রাণীকে কষ্ট দিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। কিন্তু মা যদি শিশুকে শিক্ষা দেন যে, নিজের জিনিস অন্যকে দিয়া তবে নিজে খাইতে হয়, তবে শিশু সেইমত আচরণ করিতে থাকিবে। সাধারণভাবে এক মহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শ শিক্ষা দিলে মানুষ যদিও উহা মুখে বলিতে ও মনে অনুভব করিতে শিখিবে কিন্তু তাহার হৃদয় স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও নির্মল থাকা সত্ত্বেও তাহা সে জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সহজে শিখিতে পারে না। আত্মজ্ঞানের মহান্ আদর্শের প্রয়োগ কিভাবে জীবনে করা যায় তাহা শিক্ষা দেওয়াই আত্মজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত অর্থ। তাই ভারতে বেদান্তের ব্যাপক প্রচার হওয়া সত্ত্বেও এবং ভারতের হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্মল থাকা সত্ত্বেও বেদান্তের জ্ঞান শাব্দিক জ্ঞানে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু যখনই ভূদানযজ্ঞের বিচারধারার মাধ্যমে আত্ম-জ্ঞানের শিক্ষা প্রচারিত হইতে থাকিল তখনই ভারত তাহা এত শীঘ্র ও সহজে তাহার ব্যবহারিক জীবনেও গ্রহণ করিতে পারিতেছে।

ক্রান্তির অভিব্যক্তির ক্রম

তিনটি ক্রমে 'বিপ্লব' বা 'ক্রান্তির' অভিব্যক্তি হয়। প্রথমে চিন্তায়, অতঃপর বাক্যে এবং অন্তিমে আচরণে বা কার্যে। আবার তিনটি পর্যায়ে ক্রান্তির পরিণতি ঘটিয়া থাকে। উহা প্রথমে কোন বিশিষ্ট বা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবনে, অতঃপর বহুব্যক্তির জীবনে এবং অন্তিমে উহা সমাজদেহে দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ প্রথমে হৃদয় পরিবর্তন, পরে জীবন পরিবর্তন ও অবশেষে সমাজ পরিবর্তন হইয়া থাকে। বিনোবাজী তাঁহার এক ভাষণে এই সম্পর্কে অনুপমভাবে বলিয়াছেন—"যে-কোনও ক্রান্তি প্রথমে চিন্তায় সংঘটিত হয়; পরে উহা বাক্যে প্রকাশিত হয়—সংকল্পের রূপে আসে। অতঃপর কার্যে উহার বিকাশ হয়। কার্যও প্রথমে ব্যক্তিগত থাকে এবং পরে সামূহিক হয়। অতঃপর উহার উপর সারা সমাজের মোহর অংকিত হইয়া যায়। এইভাবে ধর্ম-বিচার প্রথমে কোন কোন লোকের চিত্তে অংকুরিত হয় এবং পরে উহা সারা সমাজে স্মৃতি বা আইনের বিধান-রূপে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে। অতঃপর উহাকে রূঢ় আচার বা ধর্মনিষ্ঠারূপে মানা হয়। আমি এক উদাহরণ দিতেছি। আজ চুরি করা অন্যায় বলিয়া গণ্য করা হয়। সারা সমাজ এবং আইন উহার বিরোধী। কিন্তু চুরির বিরুদ্ধে আইনেব বিধান আছে বলিয়াই যে লোকে চুরি করে না একথা ঠিক নহে। চুরি করা যে মানবতা বিরোধী ইহা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি মানিয়া লইয়াছে। এই কারণে ধর্মস্মৃতি ও আইন—উভয়েই উহা স্থান পাইয়াছে। গোড়ায় এই বিচারধাবা ছিল না। কিন্তু যেমন-যেমন নীতি-বিচার প্রতিষ্ঠিত হইল তেমন-তেমন নিষ্ঠাও বৃদ্ধি পাইল। আমি সামাজিক নিষ্ঠার একটি উদাহরণ দিলাম' ঐরূপ নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি রাখিতে নাই, অধিক কিছু জমাইয়া রাখা উচিত নহে। অধিক সংগ্রহ করা পাপ, যেমন চুরি করা পাপ—এই ধর্ম-বিচার আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করাইতে হইবে। এই বিচার নূতন নহে—ইহা বহু পুরাতন। মহর্ষিগণ নিজেদের জীবনে উহা প্রয়োগ করিতেন। ব্যক্তিগতভাবে উহা নিজ জীবনে আচরণ করিয়াছেন—এমন মহাত্মা এবং সাধুসন্ত ছিলেন। কিন্তু সাধারণ জনগণের মধ্যে চুরির বিরুদ্ধে যেরূপ মনোভাব—সংগ্রহের বিরুদ্ধে

সেরূপ দৃঢ় ও তীব্র মনোভাব নাই। সেরূপ মনোভাব এক্ষণে সৃষ্টি করিতে হইবে। এইজন্য আমি এই আন্দোলনের নাম দিয়াছি 'ধর্ম-চক্র-প্রবর্তন'। কেননা ইহাতে এক বিচারধারাকে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অসংগ্রহ ও অপরিগ্রহকে কেবলমাত্র ঋষি ও সাধুসন্ন্যাসীদের পক্ষে আচরণীয় গুণ বলিয়া মানা হইয়াছে। তদ্রূপ সাধারণ লোকের জন্যও, গৃহস্থদিগের জন্যও উহা জীবনের মূলাধার হওয়া চাই। ইহাব্যতীত শোষণ কিছুতেই দূর করা যাইবে না। এই ধর্মবিচার সামাজিক নিষ্ঠাস্বরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহার আরম্ভ বিচার ক্রান্তিতে এবং ইহার পরিণতি সামাজিক ক্রান্তিতে হইবে।" এরূপে শান্তির পথে সদ্ভাবনা জাগ্রত করিয়া ক্রান্তি সৃষ্টি করা ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলনের চরম লক্ষ্য। তিনি বলেন—"আমি ন্যায় ও প্রেম—উভয়কে একত্রিত করিতে চাহিতেছি। ইহাকে সূর্য-চন্দ্র বলা যায়। উহা ঈশ্বরের দুই চক্ষু। ঐ দুই চক্ষু একসঙ্গে মিলিত হইলে তেজ পরিপূর্ণ হয়।"

ভূদানযজ্ঞের মূলতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম

ইহাই ভূদানযজ্ঞের মূলগত সিদ্ধান্ত। সর্বোদয় বিচারের মূলও এখানেই। ইহা কোন খন্ড-বিচারও নহে। ইহা জীবনের সামগ্রিক মহান্ সিদ্ধান্ত ও জীবনে তাহার প্রয়োগের উপায়। মোটকথা, বৈদিক ধর্মের সার ইহার মধ্যে নিহিত আছে এবং তাহাই সূত্রাকারে "ঈশাবাস্য" মন্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত রহিয়াছে। "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।" জগতে যাহা কিছু আছে সবই ঈশ্বরময়—সবই ঈশ্বরের। তিনিই একমাত্র মালিক। ইহা বুঝিয়া আমাদের সব কিছুই তাঁহাকে সমর্পণ করা চাই এবং যাহা কিছু তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যাইবে তাহা তাঁহার প্রসাদ গণ্য করিয়া তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এখানে আমার কিছু নাই, সবই ভগবানের—এই ভাবনা জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যে-ব্যক্তি এইভাবে জীবনযাপন করিবে কাহারও ধনে তাহার অভিলাষ থাকিবে না। ঈশ্বর-সমর্পণ, যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ, ঈর্ষা না করা ও ধনের লালসা না করা—ইহা এক

স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্ম-বিচার ও তাহা সাধনের উপায়। ইহাকেই সামূদায়িক ধর্মস্বরূপে সমাজনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের দেশে অনেক সাধু-সন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সাধুরা ধ্যান-জপ আদি শিক্ষা দিয়াছেন; কিন্তু সামূদায়িক ধর্ম কি তাহা তাঁহারা শিক্ষা দেন নাই। এ সম্পর্কে প্রজা-সমাজবাদী নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণজী যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। "আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন—'আপনি যে বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন, সে বিষয়ে মুনি-ঋষিগণ তো বহু করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে সমাজের পরিবর্তন হয় নাই কেন?' তাহার উত্তরে আমি বলিব—তাঁহাদের অসফলতার কারণ এই যে, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত একাঙ্গী ছিল। তাঁহারা কেবল ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, খারাপ যাহা-কিছু সব ব্যক্তিরই মধ্যে। বুদ্ধের নিদান এই যে, তৃষ্ণাই সব দুঃখের মূল। একদিকে ইহা সত্য। কিন্তু একটি ছেলে রাজার ঘরে জন্মিল এবং আর একটি ছেলে গরীবের ঘরে জন্মিল—ইহার কারণ তো তৃষ্ণা নহে। এই প্রকারে আমরা সমাজবাদী-সমাজ পরিবর্তনের উপর বেশী দৃষ্টি দিয়া থাকি। মুনি-ঋষিরা অন্তরেই সবকিছু ইহা মনে করিতেন; আর আমরা বাহিরেই সবকিছু ইহা মনে করিয়া থাকি। আমার মতে এই দুই বিচারই একাঙ্গী-দোষে দুষ্ট। আমি চাই—এই দুই-এর সমন্বয় হউক। যদি ইহার কোন একটিকে আমরা ছাড়িয়া দেই, তবে উত্তম সমাজ রচনা করিতে পারিব না। উভয়কে ধরিয়া থাকিলে তবে ভাল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হইবে।"

মহাত্মা গান্ধী দেশকে সামূদায়িক ধর্মে শিক্ষাদান করিতে ব্রতী হন। ব্যক্তিগত ও সামূদায়িক জীবন যে এক ও অবিভাজ্য তাহা বুঝাইয়া দিয়া তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সততা ও অহিংসা প্রয়োগের শিক্ষাদান করেন এবং অহিংস সমাজরচনার উদ্দেশ্যে দেশকে প্রস্তুত করিবার জন্য গঠনমূলক কার্যের ব্যবস্থা করেন। জীবনের এক ক্ষেত্রে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত না হইয়া পারে না। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ হইয়াছিল। কিন্তু তখনকার বিশেষ পরিস্থিতিতে সে অহিংসা ছিল দুর্বলের অহিংসা—লাচারের অহিংসা। এজন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আজ রাজনৈতিক

ক্ষেত্রে উহা প্রয়োগের আর অবকাশ নাই। দেশ ও কালের পরিস্থিতির প্রয়োজনে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অহিংসা প্রয়োগের সুযোগ আসিয়াছে। গান্ধীজীর অবর্তমানে সেই মহান্ কার্যের ভার ভগবান বিনোবাজীর হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই সাম্যদায়িক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবার উপায় কি? আজ জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার মাধ্যমে ঐ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব কি? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই ধর্ম সমাজে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বিচার ও আচারে মহান্ ক্রান্তি সৃষ্টি করিতে হইবে। রাষ্ট্রশক্তি বিচার-বিপ্লব বা নিষ্ঠা-বিপ্লব সৃষ্টি করিতে অক্ষম। রাষ্ট্রশক্তি অনুসরণকারী মাত্র হইতে পারে; সমাজে উহা পথ-প্রদর্শনকারী হইতে পারে না। কোন মৌলিক ভাবধারা সৃষ্টি করা উহার সাধ্যাতীত। যখন কোন বিচার মানুষের বিবেকবুদ্ধি মানিয়া লয় ও আচারে উহা অনুসৃত হইতে থাকে কেবলমাত্র তখনই রাষ্ট্র আইনের বিধান করিয়া উহাতে ছাপ মারিয়া দিতে পারে এবং দণ্ডশক্তির বলে উহাকে সার্বজনীন কার্যে পরিণত করিতে পারে। এই সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"বিচার-প্রচার তো নেতৃবৃন্দ ও বিচার প্রবর্তকগণের কাজ। ক্রান্তি-কারক বিচার যখন লোকে মানিয়া লয় তখন সরকারকে উহার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হয় এবং যদি সরকার তাহা না করে তবে সরকারের পরিবর্তন হয়। '0' শূন্যের যেরূপ মূল্য, সরকারকে আমি তদ্রূপ মূল্য দিয়া থাকি। জনশক্তির সহিত সরকারের শক্তি মিলিত হইলে তবেই সরকারের মূল্য বড় হইতে পারে। যখন বিচার ছড়াইয়া পড়ে তখন ঐ বিচারের অনুকূলে রাজ্য গঠিত হয়। নচেৎ রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হয়। মার্কস্ বিচার প্রবর্তন করিলেন, তখন লেনিনের নেতৃত্বে রুশিয়ায় বিপ্লব সংঘটিত হইল। রুশো ও ভল্টেয়ারের প্রবর্তিত বিচার-ক্রান্তির ফলে ফ্রান্সে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। আমি মনে করি, আমার বিচারধারার ভিত্তিতে জনমত গঠিত হওয়া মাত্র সরকার তাহাকে মানিয়া লইবেন। যদি না মানেন তবে সরকার খতম হইয়া যাইবে এবং তাহাতে আমার দুঃখ হইবে না।"

সর্বোদয়প্রেমীর কর্তব্য

কেহ কেহ বিনোবাজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি বাহিরে রহিয়াছেন কেন এবং রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই কেন? তাহার উত্তরে বিনোবাজী এক সুন্দর উপমা দিয়া বুঝাইয়া বলেন যে, তাঁহার কাজ রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। রাষ্ট্রের কোন্ পথে চলা উচিত সেই পথ রাষ্ট্রকে দেখাইয়া দেওয়া ও সেইপথ ঠিক করিয়া দেওয়াই তাঁহার কাজ।—"দুইটি বলদ গরুর গাড়ীতে জোতা রহিয়াছে। আমি যদি তৃতীয় বলদ হইয়া গাড়ীতে কাঁধ দেই, তবে তাহাতে গাড়ীর কী আর সুবিধা হইবে? তাহার চাইতে যে-পথে যাওয়া উচিত সেই রাস্তা যদি একটু ঠিক করিয়া দিতে পারি তবে গাড়ীর সব চাইতে বেশী উপকার আমি করিতে পারিব।" তিনি রাষ্ট্রশক্তির নাম দিয়াছেন—'দণ্ডশক্তি'। বিনোবাজী বলেন—"আজ আমাদের যে-রাজসরকার আছে তাহার হাতে আমরা 'দণ্ডশক্তি' সঁপিয়া দিয়াছি। হিংসা ঐ 'দণ্ডশক্তির' অংশীভূত হইয়া রহিয়াছে। তথাপি আমরা উহাকে 'হিংসা' বলিতে চাহি না। উহাকে হিংসা হইতে পৃথক শ্রেণীতে রাখিতে চাই। আমরা উহাকে হিংসাশক্তি হইতে ভিন্ন 'দণ্ডশক্তি' বলিতে চাই, কেননা সমগ্র জনগণ ঐ শক্তি সরকারের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। এইজন্য উহা অবিমিশ্র হিংসাশক্তি নহে, কিন্তু উহা 'দণ্ডশক্তি'।"

রাষ্ট্রনায়কগণের করুণ অবস্থা

বিনোবাজী মনে করেন যে, দেশের রাষ্ট্রনায়কদের অহিংসার উপর শ্রদ্ধা আছে। তাঁহাদের হৃদয় অনুভব করে যে, অহিংসা ব্যতীত কোন সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইতে পারে না। কিন্তু যখন তাঁহারা বুদ্ধি দিয়া চিন্তা করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্বের কথা বিবেচনা করিয়া অহিংসার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে সাহস পান না। বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহারা কাজ করেন। তাঁহাদের বুদ্ধি তাঁহাদিগকে বলিয়া দেয়—'আমরা সৈন্যদল তুলিয়া দিতে পারি না। আমরা যে-জনগণের প্রতিনিধি সে-জনগণ তেমন শক্তিমান নহে, বিনা সৈন্যবলে চলিবার যোগ্যতা নাই। এই-জন্য তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপে আমরা এই দায়িত্ব বোধ করি যে, আমাদিগকে

সৈন্যদল সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও মজবুত করিতে হইবে।' এইরূপে তাঁহাদের হৃদয় এক কথা মানে কিন্তু তাঁহাদের বাস্তব পরিস্থিতি-প্রভাবিত-বুদ্ধি উল্টা কথা বলিয়া দেয়। হৃদয় ও বুদ্ধির বিরোধের বিপাকে পড়িয়া অসহায় অবস্থায় তাঁহাদিগকে সৈন্যবলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহাদের হৃদয় রচনাত্মক কার্যে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁহাদের বুদ্ধি চরকা বা অন্য গ্রাম্যশিল্প দ্বারা যুদ্ধযন্ত্র মজবুত করিতে পারিবে বলিয়া সাহস পায় না। ইহা তাঁহাদের ভণ্ডামি নহে; ইহা নিতান্তই করুণ অবস্থা। বিনোবাজী বলিয়াছেন—"আত্মনিরীক্ষণপূর্বক আমি ইহা বলিতেছি, যাঁহারা আজ দায়িত্বের আসনে বসিয়া রহিয়াছেন তাঁহাদের আসনে যদি আমরা বসিতাম তবে আজ তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাহা হইতে বিশেষ অন্যরূপ যে আমরা করিতে পারিতাম—এমন নহে। ঐ স্থানই এমন। উহা যাদুর আসন। ঐ আসনে যে বসিবে তাহার উপর এক সংকুচিত, সীমাবদ্ধ, অস্বাভাবিক ও অস্বাধীন পরিধির দৃষ্টিকোণ হইতে চিন্তা করিবার দায়িত্ব আসিয়া পড়িবে। যাহাকে আমি অস্বাধীন নাম দিয়াছি সেই বদ্ধভূমিতে পড়িয়া অসহায় অবস্থায় দুনিয়ার স্রোত যেদিকে বহিতেছে বলিয়া দেখা যায়, সেই দিকে তাকাইয়া চিন্তা করিবার দায়িত্ব তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসে।" এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? বিনোবাজী বলিয়াছেন, দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা এই কথা বলেন যে, "আমরা যে-কাজ করিতেছি সে-কাজ আপনারা করিবেন না। ঐ কাজে আপনারা আবদ্ধ হইবেন না। বরং আমরা যে অভাব বোধ করিতেছি তাহা যদি আপনারা পূরণ করিতে পারেন তবে তাহা করুন।" বিনোবাজী বলেন, "এই আশায় তাঁহারা আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। ইহা আমাদিগকে ঠিকমত বুঝিতে হইবে এবং ঐ দৃষ্টিতে আমি যাহাকে 'স্বতন্ত্র লোকশক্তি' বলিয়া থাকি সেই 'স্বতন্ত্র লোকশক্তি' যেরূপে নির্মাণ করা যায় সেই কাজে সকলকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা রাষ্ট্রশক্তিকে প্রকৃত সহায়তা দান এবং দেশের সমুচিত সেবা করিতে পারিব।"

দণ্ডনিরপেক্ষ জনশক্তি

এই স্বতন্ত্র লোকশক্তি কি? ইহা রাষ্ট্রশক্তি বা দণ্ডশক্তি নহে। উহা দণ্ডশক্তি হইতে ভিন্ন। উপরন্তু উহা হিংসার বিরোধী। বিনোবাজী চাণ্ডিল সর্বোদয় সম্মেলনে তাঁহার প্রথম ভাষণে এই বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ক্রান্তি প্রথমে চিন্তায় উদয় হয় এবং অবশেষে উহা কার্যে বা রূঢ় আচরণে পরিণতি লাভ করে। উপরন্তু ক্রান্তিমূলক আচরণ প্রথমে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ও অন্তিমে উহা সমগ্র সমাজে সমাজনিষ্ঠারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ক্রান্তির এই চরম পরিণতি যখন রূঢ় আচরণে এবং সমগ্র সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহাই হয় 'স্বতন্ত্র লোকশক্তি'র অভিব্যক্তি। শান্তি ও প্রেমের পথেই ইহা করা সম্ভব। উহা সমাজের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থামাত্র নহে। উপরন্তু রূঢ় সামাজিক নিষ্ঠামূলক আচরণে উহা অভিব্যক্ত হয়। এমতাবস্থায় সার্বজনীনভাবে উহার আচরণ করা আইনের বিধানের উপর নির্ভর করিবে না। শান্তির পথে বিচার-প্রচারের দ্বারা লোকের মধ্যে এমন মনোবৃত্তি সৃষ্টি হইবে যাহাতে আইন হউক আর নাই হউক, লোকে বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তদ্রূপ কার্য করিবে, লোকে জমি বাঁটোয়ারা করিয়া লইবে। এই প্রসঙ্গে বিনোবাজী বলেন—"কোন আইনের কারণে কি মাতা সন্তানকে দুগ্ধ পান করান?" ইহা হইতে আমরা অহিংস ক্রান্তি বা জনশক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারিলাম। হিংসা তো দূরের কথা দণ্ডশক্তিরও প্রয়োগ করিবার অবকাশ না থাকে এইরূপ পরিস্থিতি সমাজে সৃষ্টি করিতে হইবে এবং তাহা সাধন করা সর্বোদয়প্রেমীদেরই কার্য। বিনোবাজী বলেন—"যদি আমরা উহা করি তবে বুঝিতে হইবে যে, আমরা আমাদের স্বধর্ম চিনিয়া লইতে পারিয়াছি এবং তদনুসারে আচরণ করিতে শিখিয়াছি। যদি আমরা তাহা না করি এবং দণ্ডশক্তির প্রয়োগদ্বারা যেটুকু জনসেবা হইতে পারে তাহার প্রতি লালসা পোষণ করি, তবে যে-বিশেষ কার্য আমাদের দ্বারা হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা হইয়া থাকে সেইকার্য বা সেইআশা আমরা সার্থক করিতে পারিব না। বরং আমরা বোঝাস্বরূপ গণ্য হইব—এইরূপ সম্ভাবনা আছে।"

সমস্যা সমাধানে আইনের স্থান

আইনের দ্বারা ভূমি-সমস্যার সমাধান করার প্রশ্ন সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেন 'সরকারের উপর আপনার প্রভাব আছে দেখা যায়। যাহাতে সরকার বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি বিতরণের পথ খুলিয়া দেয় এজন্য আপনি সরকারের উপর চাপ দিতেছেন না কেন? আপনার প্রভাব কেন এইদিকে প্রয়োগ করিতেছেন না?'—এরূপ বহুলোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিতে চাই যে—ভাই, আইনের পথে তো আমি বাধা দিতেছি না। আপনারা যেরূপ চাহেন সেইদিকে যদি আমাকে আরও এক-পা অগ্রসর হইতে বলেন তবে আমি বলি যে, যে-পথ আমি গ্রহণ করিয়াছি ঐপথে যদি আমি পূর্ণ সফলতা, ষোল আনা ফল না পাই এবং বার আনা—আট আনাও সফলতা পাওয়া যায় তাহাতেও আইন হওয়ার সুবিধা হইবে। প্রথমত তো আমি আইন প্রণয়নের পথে বাধা দিতেছি না। দ্বিতীয়ত আমি আইন প্রণয়নের সুবিধা করিয়া দিতেছি। উহার জন্য আমি অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছি—যাহাতে আইন সহজে প্রণীত হইতে পারে। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত আরও এক-পা যদি আমি আপনাদের দিকে অগ্রসর হই এবং রটাইতে থাকি 'আইন ছাড়া এই কাজ হইবে না, আইন করিতেই হইবে' তাহা হইলে আমি স্বধর্ম-চ্যুত হইয়াছি বলিয়া গণ্য হইব। উহা আমার ধর্ম নহে। বরং ইহা বিশ্বাস করা আমার ধর্ম যে, বিনা আইনের বলে জনতার হৃদয়ে এমন ভাবধারা সৃষ্টি করিতে পারিব যাহাতে কিছুমাত্র আইন না হইলেও লোকে ভূমিবণ্টন করিয়া লইবে। কোন আইনের ভয়ে কি মাতা সন্তানকে স্তন্যদান করেন? অতএব মানুষের হৃদয়ে এমন এক শক্তি রহিয়াছে যাহাতে তাহার জীবন সমৃদ্ধ হইয়াছে। প্রেমই মানুষের জীবনে একমাত্র ভরসা। প্রেমে তাহার জন্ম। প্রেমের আওতায় সে লালিতপালিত। আর অবশেষে যখন তাহাকে এই পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতে হয় তখন সে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একবার চারিদিক দেখিয়া লয় এবং তখন যদি তাহার প্রেমাস্পদ তাহাকে দেখিবার জন্য আসিয়া থাকে তবে সে সানন্দে দেহত্যাগ করিয়া ইহধাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। অতএব 'প্রেমের এইরূপ শক্তি অনুভব করা সত্ত্বেও

উহাকে অধিক সামাজিকরূপে বিকশিত করিবার সাহস না রাখিয়া যদি আইনের জন্য চীৎকার করিতে থাকি, তবে জনশক্তি নির্মাণ করিয়া রাষ্ট্রকে সহায়তা দান করিতে পারিব বলিয়া যে আশা করা হয় তাহা বিফল হইবে। এইজন্য 'দণ্ডশক্তি' হইতে ভিন্ন 'জনশক্তি' নির্মাণ করিতে চাহিতেছি। আর আমাদিগকে উহা নির্মাণ করিতেই হইবে। এই যে জনশক্তি আমরা রচনা করিতে চাহিতেছি উহা যে দণ্ডশক্তির বিরোধী হইবে এমন কথাও নহে; তবে উহা হিংসার বিরোধী। ঐ জনশক্তি দণ্ডশক্তি হইতে ভিন্ন।" আইন সম্পর্কে তিনি আরও বলিয়াছেন—"আইন এক ভিন্ন ব্যাপার। হিংসা ও অহিংসা উভয়েরই সহিত উহার সম্বন্ধ। আইনের পিছনে ভৌতিক শক্তি অথবা নৈতিক শক্তি থাকা চাই। আমার কার্যের জন্য এমন এক নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি হইতেছে, যাহার দ্বারা সরকারের আইন প্রণয়নে সুবিধা হইবে। সেই নৈতিক আবহাওয়া তৈয়ারী না হওয়া সত্ত্বেও যদি আইন করা হয়, তবে সেই আইন প্রয়োগ করিবার জন্য দণ্ডশক্তির প্রয়োজন হইবে। যদি আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের জন্য সৈন্যবলের প্রয়োজন হয়, তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের কী দশা হইবে তাহা মনোযোগের সহিত একবার ভাবিয়া দেখুন।" তিনি আরও বলেন—"লোকে আইন প্রণয়নের কথা তুলিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা জানে না যে, আইন তো পশ্চাদনুসরণ করিবেই। আমার কার্যের দ্বারা যে আবহাওয়া সৃষ্টি হইবে তাহার সাহায্যে সরকারকে অবশ্য আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। নচেৎ এই সরকার খতম হইয়া যাইবে। অন্য সরকার আসিবে।"

আইন তৈয়ারী হউক এবং তাড়াতাড়ি হউক। কিন্তু সেইকাজে যদি সর্বোদয়ের কর্মীরা লাগিয়া থাকেন তবে তাহা তাঁহাদের পক্ষে পরধর্ম আচরণ করা হইবে। বিনোবাজী বলেন—"আমাদের স্বধর্ম হইবে গ্রামে-গ্রামে ভ্রমণ করা এবং বিচারের উপর বিশ্বাস রাখা। আমরা ইহা বলিব না—'ওরে বিচার শুনিলে-শুনাইলে কবে কাজ হয়?' বিচার অন্তরে আসিলেই কাজ হইবে। কারণ আমাদের কাজ বিচার দ্বারাই হওয়া সম্ভব।" দণ্ডনিরপেক্ষ যে-বিচারবোধের দ্বারা জনশক্তির কাজ সাধিত হয় তাহাকে বিনোবাজী নাম দিয়াছেন—"বিচার-শাসন"।

যাঁহারা সর্বোদয়ের এই দৃষ্টি মান্য করেন না তাঁহাদের কথা মানিয়া লইয়া যদি ইহা মনে করাও হয় যে, আইন ব্যতীত ভূমি-সমস্যার সমাধান হইবে না, আইন করিতেই হইবে; তথাপি এখনই কি উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হইবে? প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের কথা ধরা যাউক। পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী-বিলোপ আইন প্রণীত হইয়াছে এবং খাস জমির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উহার বর্তমান মালিকের হাতে রাখিয়া অবশিষ্ট জমি সরকার কর্তৃক গৃহীত হইবার আইন প্রণীত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনে করেন যে, ঐ আইনের বলে ৪ লক্ষ একর আবাদী ও আবাদযোগ্য ভূমি ভূমি-হীনদের মধ্যে বিতরণের জন্য সরকারের হাতে আসিবে। কিন্তু এদিকে ভূমির মালিকগণ আইনের বিধান এড়াইবার জন্য নির্দিষ্ট 'সিলিং'-এর অতিরিক্ত যে ভূমি তাঁহাদের আছে তাহা বেনামে হস্তান্তর করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ হস্তান্তর বন্ধ করিবার জন্য সরকার আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। তথাপি ঐরূপ হস্তান্তর বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। এই অবস্থায় ৪ লক্ষ একর খাস জমি সরকারের হাতে আসা দুরাশা বলিয়া মনে হয়। সরকারও সেই আশঙ্কা করেন। যাহা হউক, যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে, সরকার ৪ লক্ষ একর খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের জন্য পাইলেন তবে তাহাতে কী হইবে? বর্তমান লোক গণনায় পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ১ কোটী সাড়ে ৪০ লক্ষ (১,৪০,৪৬,০৪০)। তাহার মধ্যে ভূমিহীনের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৬০ লক্ষ। ইহা ব্যতীত যাহাদের ৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমি আছে তাহাদিগকেও ভূমিহীন দরিদ্র বলিয়া গণ্য করা উচিত। ৪ লক্ষ একর জমি লইয়া উহাদের কয়জনকে ভূমি দেওয়া যাইতে পারিবে? পশ্চিমবাংলার আবাদী ও আবাদ-যোগ্য ভূমির পরিমাণ মোটামুটি ১ কোটি ৪৬ লক্ষ একর। সাধারণভাবে এরূপ অনুমান করা হয় যে, যত জমি আছে তাহার এক-ষষ্ঠাংশ পাইলে দেশের ভূমিহীনদিগকে কিছু-কিছু জমি দেওয়া যাইতে পারে। সেই হিসাবে পশ্চিমবাংলায় মোটামুটি ২৫ লক্ষ একর ভূমির প্রয়োজন। তাই পশ্চিমবাংলার নিকট ভূদানযজ্ঞের প্রেমের দাবী ২৫ লক্ষ একর। আইনের বলে কি এই ২৫ লক্ষ একর ভূমি সরকারের হাতে আসা সম্ভব? বর্তমান অবস্থায় তাহা

সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, সরকার ইচ্ছা করিলে এখনই কঠোরতর আইন করিয়া ২৫ লক্ষ একর জমি তাঁহাদের হাতে লইতে পারেন। যদি তাঁহাদের কথা মানিয়া লওয়া যায় তবে ঐ ২৫ লক্ষ একর জমির জন্য প্রতি একরে কমপক্ষে ৬০০৲ টাকা করিয়া ধরিলেও মোট ১৫০ কোটী টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়ার আবশ্যক হইবে। এই টাকা দিবার মত অবস্থা সরকারের আজ নাই এবং নিকট ভবিষ্যতেও হইবে না। সারা ভারতবর্ষে ভূমিহীনদের জন্য ৫ কোটী একর ভূমির প্রয়োজন ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই ৫ কোটী একর ভূমি ক্ষতিপূরণ দিয়া লওয়া আজ সরকারের পক্ষে সম্ভব নহে। এখন প্রশ্ন এই যে, বিনা ক্ষতিপূরণে ঐ পরিমাণ জমি হাতে লইবার জন্য সরকার এখন বা নিকট ভবিষ্যতে ভারতীয় সংবিধানের আবশ্যকীয় সংশোধন করিতে পারিবেন কি? বর্তমান সমাজব্যবস্থা ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদিন পর্যন্ত সমাজে এই ব্যক্তিগত মালিকানাবোধ শিথিল না হয় ততদিন পর্যন্ত সংবিধানের উক্তরূপ সংশোধন হওয়া সম্ভব নহে। ভূদানযজ্ঞের ফলে 'ভূমি আমার নয়, সবই ভূমি ভগবানের'—এই বৈপ্লবিক বিচারবোধ যতই সমাজে উত্তরোত্তর বিস্তারলাভ করিতেছে ততই সংবিধানের ক্ষতিপূরণ দান সংক্রান্ত কঠোরতা হ্রাস করিবার পক্ষে নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি হইতেছে। ভূদানযজ্ঞ আংশিকভাবে সফল হইলেও তাহাতে এমন এক বৈপ্লবিক বিচারবোধ সমাজে ব্যাপকভাবে জাগ্রত হইবে যাহাতে বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি-সংগ্রহের পক্ষে আইন প্রণয়ন করা সহজ হইবে। ক্রমশঃ এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হইতে পারে যাহাতে ঐরূপ আইন প্রণয়ন করা অনিবার্য হইতে পারে। একমাত্র ভূদানযজ্ঞ অর্থাৎ সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত বিচার সমাজে এই চিন্তা-বিপ্লব বা বিচার-বিপ্লব আনিতে পারে। অন্য কিছুতে তাহা সম্ভব নহে। হিংসাত্মক উপায়ে ভূমি ছিনাইয়া লইবার জন্য প্রচার বা আন্দোলন চালাইলে তাহাতে ভয় আসিতে পারে, কিন্তু তাহাতে চিন্তা-বিপ্লব বা বিচার-বিপ্লব সংঘটিত হইতে পারে না। আইন করিবার জন্য ভয় দেখাইলে বা আইন করিলে বিচার-বিপ্লব আসে না। তাই আইনের পথে বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি লইয়া তাহার পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইলেও ভূদানযজ্ঞই একমাত্র

পন্থা যাহা আইন প্রণয়নের পক্ষে উপযুক্ত নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারে।

তাই ভূমি-সমস্যার সমাধানে আইনের সহিত ভূদানযজ্ঞের তুলনামূলক বিচার করিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ঃ—

(১) সরকার আইনের বলে জমি ছিনাইয়া লইতে পারেন কিন্তু জমি লইবার ঐ প্রক্রিয়া মানুষের হৃদয়ে প্রেম সৃষ্টি করিতে পারে না।

(২) ভূদানযজ্ঞের দ্বারা হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের মিলন সংঘটিত হয়। কিন্তু আইনে তাহা সম্ভব নহে। বরং তাহাতে কটুতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

(৩) ভূদানযজ্ঞের দ্বারা জনতার শক্তি জাগ্রত হইবে এবং তাহা সমাজকে সর্বাত্মক বিপ্লবের পথে অগ্রসর করাইয়া দিবে। আইন সেই শক্তি জাগ্রত করিতে অক্ষম।

শ্রীদাদা ধর্মাধিকারী তাঁহার 'ক্রান্তির পথে' পুস্তিকায় আইনের এই অক্ষমতার কয়েকটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন ঃ—"আমাদের সংবিধান অনুসারে ভারতের প্রত্যেক স্ত্রীলোকের ততখানি অধিকারই আছে, যতখানি বিজয়লক্ষ্মী, রাজকুমারী অমৃত কাউর এবং সুচেতা কৃপালনীর আছে কিংবা সরোজিনী দেবীর ছিল। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ কি দেখিতেছি? দেশের গৃহলক্ষ্মীরা ঘরের চৌকাট পার হইয়া বাহির হইতে পারেন না। আর বাহির হইলেও ঘোমটা দিয়া বা বোরখার আড়ালে বাহির হন। আইন তাঁহাদিগকে অধিকার দিয়াছে বটে কিন্তু শক্তি দিতে পারে নাই। অস্পৃশ্যদের অবস্থাও তাই। কাগজে-কলমে অস্পৃশ্যতা দূরীকৃত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবজীবনে অস্পৃশ্যতা ঠিকই আছে। আইনে মাদকদ্রব্য বর্জনের কথা আছে, কিন্তু মদ্যপান চলিতেছেই।"

(৪) ভূদানযজ্ঞ সমাজে বিচার-ক্রান্তি সৃষ্টি করিবে। ভূদানযজ্ঞের সর্বাপেক্ষা ক্রান্তিকারী সুফল হইতেছে মালিকানা বিসর্জন। আইনের দ্বারা জমি লইতে পারা যাইলেও মালিকানা বিসর্জনের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। কারণ আইনে বিধায়ক শক্তি নাই। খুব বেশী হইলে আইন খারাপ কাজ রোধ করিতে পারে। কিন্তু সৎপ্রেরণা জাগ্রত করিতে আইন অক্ষম।

(৫) ভূদানযজ্ঞে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের নিকট হইতেই জমি পাওয়া যায়, কিন্তু আইনে নির্দিষ্ট সিলিং-এর অতিরিক্ত জমিমাত্র লওয়া যাইতে পারে।

ভূদানযজ্ঞ আইন চায় না। ভূদানযজ্ঞ চায় ধনীকে প্রতিবেশী-ধর্মে দীক্ষা দান করিতে, তাঁহার আত্মজ্ঞানের বিকাশ সাধন করিতে এবং তাঁহার আত্মাকে পরিবারের পরিধির বাহিরে সম্প্রসারিত করিতে। ধনীরা তাঁহাদের পরিবারের বাহিরে দরিদ্র যাহারা আছে তাহাদিগকে নিজেদের পরিবারের অংশীদার স্বরূপ ভাবিতে আরম্ভ করুন। তাঁহাদের পরিবারের বাহিরে যে ভূমিহীন দরিদ্র তাহাকে নিজেদের পুত্র বলিয়া গণ্য করুন ও তাহাকে তাহার অংশ দিন। মা সন্তানকে যখন কোলে তুলিয়া লন তখন মাকে একটু ঝুঁকিতে হয়। আজ ধনী তাঁহার ভূমিহীন দরিদ্র সন্তানকে কোলে তুলিয়া লউন। সেজন্য তাঁহাকে ঝুঁকিতে হইবে অর্থাৎ জীবনযাত্রার মান কিছু খর্ব করিতে হইবে। যুগের পরিবর্তন হইতেছে। ধনীরা যুগের ইঙ্গিত বুঝিয়া লউন। আজ দরিদ্রের ভগবান জাগ্রত হইয়াছেন। এযুগে ভূমি ধনীর হাত হইতে দরিদ্রের হাতে যাইবেই। প্রশ্ন এই যে, কোন্ পথে তাহা যাইবে? আজ যদি প্রেমের পথে, শান্তির পথে ধনী তাঁহার ভূমি দরিদ্রের জন্য অর্পণ করেন এবং মা সন্তানকে স্তন্যপান করাইবার সময় যে পরম আনন্দ অনুভব করেন ধনীও দরিদ্রের জন্য ভূমি অর্পণ করিবার সময় যদি সেইরূপ পরম আনন্দ অনুভব করেন, তবে ধনীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা পাইবে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার সম্মান ও মর্যাদা বর্ধিত হইবে এবং তিনি সমাজের প্রকৃত সেবক ও নেতা হইতে পারিবেন। ধনীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা আছে। আজ তাহা সমাজসেবার কাজে লাগিতেছে না। তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়-বৃত্তি ত্যাগের দ্বারা পূত—পবিত্র হউক। তবেই তাহা গণ-দেবতার অর্চনার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য হইবে। যুগ পরিবর্তনে তাঁহাদের ভূমি বা সম্পত্তি অধিক থাকিবে না। আজ যিনি রাজা তিনি কাল-প্রবাহের পরিবর্তনে কাল আর বাহিরের রাজা থাকিবেন না। তবে তাঁহারা যেন চিরদিন জন-মানসে রাজর্ষি স্বরূপ বিরাজিত থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের কল্যাণ ও সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে। আজ দরিদ্র ভূমিহীন ধূলায় লুণ্ঠিত। ধনীর স্বেচ্ছা-

প্রণোদিত ত্যাগের দ্বারা দরিদ্র সমাজে সম্মানের আসন লাভ করিবে। সমাজে দ্রোহরহিত উৎপাদক-শ্রমের মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধনীও ত্যাগধর্মে দীক্ষিত হইয়া জন-হৃদয়ে সম্মানের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে। ইহাই ভূদান-যজ্ঞের মুখ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

দারিদ্র্যের মূল

সমাজে দারিদ্র্য কেন? সমাজে দারিদ্র্য, শোষণ ও ধন-বৈষম্যের মূল কোথায়? উপাদানের আধার, সাধন ও যন্ত্রে উৎপাদকের পূর্ণ অধিকার ও মালিকানা থাকা চাই। নচেৎ উৎপাদককে তাহার উৎপাদক-শ্রম করিবার সুযোগ হারাইতে হয়; অথবা তাহাকে তাহার শ্রমলব্ধ সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ভূমি উৎপদানের মৌলিক সাধন বা ক্ষেত্র। যে ব্যক্তি নিজ হাতে জমি আবাদ করিয়া তাহাতে ফসল উৎপাদন করিবে, জমিতে অধিকার তাহারই থাকা চাই। যে শ্রমিক-শিল্পী যন্ত্র সাহায্যে মাল উৎপাদন করে, উৎপাদন-যন্ত্রের অধিকারও তাহার হাতেই থাকা চাই। ইহাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত নিয়ম। যতদিন এই নিয়ম যথাযথ পালিত হইতেছিল, ততদিন সকলেই শ্রম করিত এবং সকলেই ধনোৎপাদন করিত। কেহই শোষিত ছিল না। কেহই দরিদ্র ছিল না। আবার কেহ বিরাট ধনীও ছিল না। যখনই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে আরম্ভ হইল তখনই সমাজে শোষণ, দারিদ্র্য ও ধনবৈষম্যের সূত্রপাত হইল। অর্থাৎ উৎপাদনের মৌলিক সাধন ভূমি যত-দিন উৎপাদক চাষীর হাতে ছিল, ততদিন চাষীর দারিদ্র্য ছিল না। যখনই তাহা অনুৎপাদক উপভোক্তার হাতে গেল, তখনই উৎপাদক চাষী অসহায়, পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় তাহাকে শোষণ ও উৎপীড়নের কাছে নতিস্বীকার করিতে হইল, নচেৎ বেকার হইয়া তাহাকে উপবাসী থাকিতে হইত। তখন হইতে সে তাহার শ্রমার্জিত সম্পদের সবটুকু ভোগ করিতে পাইল না। কিঞ্চিৎ অংশমাত্র তাহার কপালে জুটিল। তাহার শ্রমোৎপাদিত সম্পদের অধিকাংশ মালিক-ধনিক আত্মসাৎ করিতে লাগিল। শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা হইল। যতদিন পরিধেয় বস্ত্রাদির সুতা উৎপাদনের যন্ত্র চরকা উৎপাদক-শ্রমিক গ্রামবাসীর

হাতে ছিল ততদিন শোষণ ও দারিদ্র্য ছিল না। যখনই সেই চরকা বৃহৎ কলের আকারে অনুৎপাদক ধনিক পুঁজিপতির হাতে গেল তখনই বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও শোষণের সৃষ্টি হইল। যতদিন বস্ত্র-উৎপাদনের যন্ত্র তাঁত উৎপাদক তাঁতীর হাতে ছিল ততদিন দারিদ্র্য ও শোষণ ছিল না। যখনই সেই তাঁত বৃহৎ বস্ত্র-কলের আকারে অনুৎপাদক পুঁজিপতির হাতে গেল তখনই গ্রামে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের সৃষ্টি হইল। যতদিন তৈল উৎপাদনের যন্ত্র ঘানি গ্রামীন তৈলশিল্পী কলুর হাতে ছিল ততদিন দারিদ্র্য ছিল না। যখনই তাহা বৃহৎ তৈলকলের আকার ধারণ করিয়া ধনিক কলওয়ালার কুক্ষিগত হইল তখনই গ্রামে বেকার ও দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। যতদিন ধান-ভানার যন্ত্র ঢেঁকি গ্রামের বিধবা ও ক্ষুদ্র কৃষকের আয়ত্তে থাকিয়া তাহাদিগকে অবসর সময়ে কাজ দিত ততদিন গ্রামে এত অভাব ও সম্বলহীনতা ছিল না। যখনই ঢেঁকি ছোট-বড় চাউলকলের আকারে অনুৎপাদক ধনী ও মধ্যবিত্তের হাতে যাইতে আরম্ভ করিল, তখনই বিধবার চোখে উত্তপ্ত অশ্রু-জল দেখা দিল ও দরিদ্র কৃষকের হৃদয় ভগ্ন হইল। এইরূপে আরও বহুতর উদাহরণ যোগ করা যায়।

আমাদের দেশের অবস্থা কি? পল্লীশিল্প প্রায় সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বঞ্চিত শ্রমিক-শিল্পীদের খুব কম সংখ্যকেরই অন্য শিল্পক্ষেত্রে জীবিকা অর্জনের সুযোগ মিলিয়াছে। তাই গ্রাম্যশিল্পসমূহ যাহাদিগকে জীবিকা দান করিত, তাহারা অধিকাধিকভাবে উত্তরোত্তর জমির উপর চাপ-বৃদ্ধি করিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ দ্রুতবেগে কমিয়া যাইতেছে। বিপরীত দিকে বহুতর চাষী জমির মালিকানা হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং ক্রমশ দ্রুততর বেগে হারাইয়া ফেলিতেছে। জমি দ্রুতবেগে অল্পসংখ্যক অনুৎপাদক ধনীর হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে ও হইতেছে। দেশের অন্যান্য ধনসম্পদও অল্পসংখ্যক ধনিক পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ফলে বেকার ও দারিদ্র্যের অবস্থা চরমে উঠিয়াছে। বদ্ধমূল দারিদ্র্য ও নিঃসম্বলতা গ্রামের সাধারণ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার অভাবজনিত দুর্ভিক্ষ স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইতে চলিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের ভূমিব্যবস্থা

ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে, পশ্চিমবাংলার অবস্থা সব চাইতে শোচনীয়। ভূমি-রাজস্ব (ফ্লাউড্) কমিশনের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৯৪০ সালে অবিভক্ত বাংলায় ৩ একর পর্যন্ত জমি আছে এমন পরিবারের সংখ্যা গ্রামের মোট পরিবার সংখ্যার শতকরা ৫৭·২ ভাগ এবং ৩ একরের অধিক জমি আছে এমন পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৪২·৮ ভাগ। উহার চার বৎসর পরে ১৯৪৪-৪৫ সালে ভূমি সম্বন্ধে বিস্তারিত তদন্তের জন্য মিঃ এইচ, এস, এম, ইশাকের অধ্যক্ষতায় যে কমিশন বসে (Agricultural Statistics by plot to plot Enumeration) তাহার রিপোর্ট (যাহা ইশাক রিপোর্ট নামে খ্যাত) হইতে জানা যায় যে, এই কয় বৎসরে অবস্থা আরও বহু পরিমাণে খারাপের দিকে গিয়াছে। ৩ একরের কম জমি আছে এমন পরিবারের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৭৬·৯ ভাগ এবং ৩ একরের বেশী জমি আছে এমন পরিবারের সংখ্যা হইয়াছে শতকরা মাত্র ২৩·৯। অর্থাৎ কৃষক পরিবারের জমির পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে এবং তাহাদের অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর হইতেছে. কম-বেশী জমি আছে এই ভিত্তিতে ইশাক-রিপোর্টে গ্রামের পরিবারসমূহকে 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' ও 'ঙ'—এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে ও তদনুসারে কৃষিজীবী পরিবারসমূহের প্রকৃত অবস্থা উহাতে বিবৃত করা হইয়াছে। এই জমি হইতেছে 'খাস' জমি অর্থাৎ যে-জমি জমির মালিকেরা নিজেরা, পরিবারের লোকজনের দ্বারা কিংবা মজুরের দ্বারা চাষ করে অথবা যাহা বর্গা বা ভাগপ্রথায় অথবা অস্থায়ী বিলি করিয়া চাষ করা হয়। উহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গ্রামে 'ক' শ্রেণীর পরিবার (অর্থাৎ যাহাদের কোন জমি নাই—বাস্তুভিটা পর্যন্ত নাই অথবা কেবলমাত্র বাস্তুভিটাটুকু আছে) তাহাদের সংখ্যা মোট পরিবার সংখ্যার ৩৬·৪ ভাগ; কিন্তু তাহাদের জমির পরিমাণ বাংলার মোট জমির শতকরা মাত্র ১·৮ ভাগ। 'খ' শ্রেণীর পরিবার (অর্থাৎ বাস্তু ছাড়া যাহাদের এক একর পর্যন্ত জমি আছে) সংখ্যা মোট পরিবার সংখ্যার ১৭·৭ ভাগ, কিন্তু তাহাদের অধিকৃত জমির পরিমাণ মোট জমির শতকরা ৪·২ ভাগ। 'গ' শ্রেণীর পরিবার (অর্থাৎ যাহাদের হাতে এক একরের বেশী জমি আছে কিন্তু ৩ একরের

অধিক জমি নাই) সংখ্যা শতকরা ২২ ভাগ এবং তাহাদের জমি মোট জমির শতকরা ১৬·৯ ভাগ। 'ঘ' শ্রেণীর পরিবার (অর্থাৎ ৩ একরের অধিক কিন্তু ৫ একরের কম এমন জমি আছে) সংখ্যা মোট পরিবার সংখ্যার শতকরা ৯·৬ ভাগ এবং তাহাদের জমির পরিমাণ শতকরা ১৪·৭ ভাগ। এবং 'ঙ' শ্রেণীর পরিবার (অর্থাৎ যাহাদের ৫ একরের বেশী জমি আছে) সংখ্যা মোট পরিবার সংখ্যার ১৪·৩ ভাগ; কিন্তু তাহাদের অধিকৃত জমির পরিমাণ মোট জমির শতকরা ৬২·৪ ভাগ। সুতরাং ১৯৪৪-৪৫ সালের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, শতকরা ৩৬·৪ পরিবারের হাতে মোট জমির শতকরা মাত্র ১·৮ ভাগ। অন্য দিকে মোট পরিবারের শতকরা ১৪·৩ ভাগের হাতে মোট জমির শতকরা ৬২·৪ ভাগ। অর্থাৎ অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হাতে জমি পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। অন্যদিকে অধিকাংশ লোকের হয় জমি নাই অথবা জমি যদিও বা থাকে তবে ১ একরের বেশী নাই। ইহা হইতে দুর্দশা ও সংকটের চরম অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়।

উপরন্তু অধ্যাপক মহলানবীশ প্রভৃতি মনীষিগণ ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের ভাবীফল সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া যে-রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (Survey of the after effects of the Bengal Famine in 1943) তাহা হইতে বাংলার দুর্দশার আরও ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়। উক্ত রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, দুর্ভিক্ষের পূর্বে ১৯৩৪ সালে শতকরা ৩৬টি গ্রাম্য পরিবারের কোন ধানী-জমি ছিল না। শতকরা ৪১টি পরিবারের মাত্র ২ একর পর্যন্ত জমি ছিল। শতকরা ১৫টি পরিবারের ২ একর হইতে ৫ একর পর্যন্ত এবং শতকরা ৮টি পরিবারের ৫ একরের উপর জমি ছিল। দুর্ভিক্ষের ফলে অবস্থার ভীষণ অবনতি ঘটে। দুর্ভিক্ষের সময় ৯ লক্ষেরও অধিক পরিবার তাহাদের সমস্ত ধানী-জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়া নিঃসম্বল হয় এবং জীবিকার একমাত্র বা প্রধানতম উপায় হারাইয়া বসে। ২২ লক্ষ পরিবার তাহাদের সমস্ত জমি-জমা বাস্তু-ভিটা পর্যন্ত হারাইয়া কৃষি-মজুরে পরিণত হয়। দুর্ভিক্ষের পূর্বে কৃষি-মজুর পরিবারের মধ্যে শতকরা ১৬টি পরিবারের কিছু-কিছু ধানী-জমি ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় তাহাদের শতকরা ১৩টি পরিবার তাহাদের যাহা-কিছু জমি ছিল সবই

খোয়াইয়া বসে। অন্যান্য শ্রেণীর কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যেও অনুরূপ দুর্দশা সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহারা সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতির ন্যায় কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। সাধারণ অবস্থায় কৃষিজীবী সমাজে আর্থিক অবনতির যেসকল কারণ ক্রিয়া করিয়া আসিতেছিল, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ তাহারই চরম পরিণতি। অবিভক্ত বাংলার এই অবস্থা।

কিছুকাল পূর্বে (১৯৪৬-৪৭) গ্রামাঞ্চলের ঋণভার সম্পর্কে এক সরকারী তদন্ত (Survey of Rural Indebtedness in West Bengal) হইয়াছিল, তাহাতে ঐ সময় কাহার কিরূপ ভূমি ছিল তাহাও অনুসন্ধান করা হয়। তাহা হইতে অবস্থার যে আরও বেশী অবনতি হইতেছে, ইহা সূচিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কৃষি-শ্রমিকের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে এক নমুনা-তদন্তের ব্যবস্থা করেন। উহাতে বৃন্দাবনপুর নামক এক গ্রামে নমুনা-তদন্ত করা হয় (The Sample Enquiry into the village of Brindabanpur) তাহা হইতে জানা যায় যে অবস্থার আরও দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে। বৃন্দাবনপুর গ্রামে মোট পরিবার-সংখ্যা ছিল ১৪৯টি। তাহার মধ্যে ৭২টি অর্থাৎ শতকরা ৪৮·৩ ভাগ কৃষিজীবী পরিবার। অবশ্য ইহার মধ্যে ৫৮টি পরিবারকে জমি চাষ করিতে দেখা গিয়াছে। এই ৫৮টি পরিবারের মধ্যে (ক) ৪৪টি অর্থাৎ শতকরা ৭৫·৯ ভাগের ২ একরের কম জমি, (খ) ১২টি পরিবারের অর্থাৎ শতকরা ২০·৫৬ ভাগ পরিবারের ২ একর হইতে ৫ একর পর্যন্ত এবং (গ) ২টি পরিবারের অর্থাৎ শতকরা ৩·৫ ভাগ পরিবারের ৫ একর হইতে ১০ একর পর্যন্ত জমি আছে। ১০ একরের বেশী কাহারও জমি নাই। অবশ্য একটিমাত্র গ্রামের পরিসংখ্যানের দ্বারা সাধারণ অবস্থা সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব না হইলেও উহার দ্বারা অবস্থার গতি যে কোন্ দিকে যাইতেছে তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। এক্ষণে ভূমি-রাজস্ব কমিশনের রিপোর্টের সহিত ঋণভার তদন্ত ও বৃন্দারনপুর গ্রামের নমুনা-তদন্তের তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। তাহা হইতে পশ্চিমবাংলার সংকটের গভীরতা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে :—

	ভূমি-রাজস্ব কমিশন ১৯৩৯-৪০ (পশ্চিম-বাংলার জন্য নির্ধারিত হিসাব)	গ্রাম্য ঋণভার তদন্ত (পশ্চিম-বাংলা) ১৯৩৬ ৪৭	বৃন্দাবনপুর গ্রামের নমুনা-তদন্ত ১৯৪৯
২ একর পর্যন্ত জমি আছে এরূপ গ্রাম্য পরিবারের শতকরা হিসাব	৪১·১%	৬৪·৭%	৭৫·৯%
২ হইতে ৫ একর পর্যন্ত জমি আছে এরূপ গ্রাম্য-পরিবারের শতকরা হিসাব	২৯·১%	১৮·৩%	২০·৬%
৫ হইতে ১০ একর পর্যন্ত জমি আছে এরূপ গ্রাম্য-পরিবারের শতকরা হিসাব	১৯·৭%	১০·৭%	৩·৫%
১০ একরের অতিরিক্ত জমি আছে এরূপ গ্রাম্য-পরিবারের শতকরা হিসাব	১০ ১%	৬·৩%	০
	১০০%	১০০%	১০০%

এই হিসাব ১৯৪৭ সালের পূর্বেকার। দেশ বিভাগের ফলে জনসংখ্যার চাপবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতিজনিত দুর্মূল্যতা, বন্যা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতির জন্য উপর্যুপরি কয়েক বৎসর অজন্মা ও প্রায় প্রতি বৎসর রাজ্যের অল্পাধিক

অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের অবস্থা ইত্যাদি কারণে পশ্চিমবাংলার দুর্দশা ও সংকট যে এক্ষণে চরমে পৌঁছিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পশ্চিমবাংলায় বর্গাদারদের সংখ্যাবৃদ্ধি উক্ত দারুণ দুর্দশার অন্যতম প্রমাণ। ছোট-ছোট জমির মালিক ক্ষুদ্র কৃষক নিজেদের জোতজমি হারাইয়া অধিকাধিকভাবে ভাগচাষীতে পরিণত হইতেছে। বর্তমানে ভাগচাষ-জমির পরিমাণ মোট জমির শতকরা ৪০ ভাগে দাঁড়াইয়াছে।*

১৯৩১ সালে পশ্চিমবাংলায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫১·৪ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১৯৫১ সালে উহা শতকরা ৫৭·২১ দাঁড়াইয়াছে। এইসংখ্যার মধ্যে কর্মী ও তাহার পোষ্যবর্গ দুই-ই আছে। কত কর্মীর উপর কত পোষ্য নির্ভর করে তাহা বিচার করিলে দুর্দশার আর একটি পরিমাপ করা যায়। ১৯৩১ সালে ৫৯ লক্ষ পোষ্য ৩৮ লক্ষ কর্মীর উপর নির্ভর করিত; কিন্তু অবস্থার অবনতি ঘটিয়া ১৯৫১ সালে দেখা যায় যে এক কোটীর উপর লোক পোষ্য হিসাবে ৩৭ লক্ষ কর্মীর উপর নির্ভর করিতেছে। এইদিক দিয়াও বুঝা যায় যে, পশ্চিমবাংলার অবস্থা চরমে উঠিয়াছে। যাহারা নিজের জমি নিজেরা চাষ করে, তাহাদের সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনা করিলে পশ্চিমবাংলার অবস্থার শোচনীয়তা আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। ১৯৫১ সালের সেন্সাস্ অনুসারে যাহারা নিজেদের জমি নিজেরা চাষ করে তাহাদের সংখ্যা পশ্চিমবাংলায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩২·৩ ভাগ, উত্তরপ্রদেশে ৬২·২ ভাগ, বিহারে ৫৫·২ ভাগ, উড়িষ্যায় ৫৯·৫ ভাগ, বোম্বাই-এ ৪০·৭ ভাগ ও মাদ্রাজে ৩৪·৯ ভাগ। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার অবস্থা সব চাইতে শোচনীয়।

গ্রামাঞ্চলের ঋণভার সম্পর্কে যে সরকারী অনুসন্ধানের কথা উপরে বলা হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৫৬টি পরিবার ঋণগ্রস্ত। বিলাসে বা বিবাহ ইত্যাদির ব্যয়নির্বাহের জন্য এইসব ঋণ করা হয় নাই। আশ্চর্যের কথা, প্রধানত খাদ্য খরিদের জন্য এইসব ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে। দেনার গড়পড়তা শতকরা প্রায় ৪৯ ভাগই খাদ্য ক্রয়ের জন্য।

---

* ('পশ্চিমবঙ্গে ভূমি কি কম?' পৃঃ ৮৮ দ্রষ্টব্য)।

যাহাদের জমি আছে তাহাদের ক্ষেত্রেও দেনার প্রায় ৫৫ ভাগ খাদ্য খরিদের জন্য। আবার ঐ দেনা শোধ করা হইয়াছে সংসারের আয় হইতে নহে—জীবিকার একমাত্র সম্বল চাষের জমি বিক্রয় করিয়া। উপরন্তু পূর্বে যেস্থলে জমি বন্ধক রাখিয়া ঋণগ্রহণ করা হইত, আজকাল সেইস্থলে জমি একেবারে সাফ্ বিক্রয় করিয়া ফেলা হইতেছে। ১৯৪০ সালে যত জমি বিক্রয় হয়, তাহার শতকরা ২৪ ভাগ জমি বন্ধক দেওয়া হয়; কিন্তু ১৯৪৩ সালে দেনার জন্য জমি বন্ধক দেওয়া কমিয়া গিয়া বিক্রয়ের শতকরা ১০ ভাগে দাঁড়ায়।. ইহাতে জমি সাফ্ বিক্রয় করিয়া ফেলা যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে তাহা বুঝা যাইতেছে। উপরন্তু আজকাল পেশাদারী মহাজন ও জমিদার কর্তৃক গ্রামে ঋণদান করা বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে। সেইস্থলে এক শ্রেণীর ভূমিলোভী জোতদার ধান প্রভৃতি অসময়ে হাওলাত দিয়া বা টাকা ধার দিয়া উক্ত দেনার দায়ে চাষীদের ভূমি বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতেছে। জনসংখ্যার শতকরা ৩০·৩ ভাগ লোক নিজ জমির চাষী। তাহাদের ঋণকৃত দেনার পরিমাণ মোট ঋণের শতকরা ৪৭·৪ ভাগ। ইহার পর আসে কৃষি-শ্রমিক। তাহাদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৬·৫ ভাগ এবং তাহাদের ঘাড়ে দেশের মোট ঋণের শতকরা ১১·৬ ভাগ চাপিয়া আছে। জোতদার ও ব্যবসায়ীর ঋণের পরিমাণ সব চাইতে কম। ইহাতে সাধারণ কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকের দুর্দশার গভীরতা সূচিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় দলিল রেজেষ্টারীর সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং আশ্চর্যের বিষয় রেজেষ্টারীকৃত দলিলের মধ্যে ভূমি-বিক্রয়ের দলিল অন্য দলিলের অনুপাতে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রধানত খাদ্য-শস্যাদি খরিদের জন্যই ঐসব জমি বিক্রয় করা হইতেছে। ইহাতে পশ্চিম-বাংলার অবস্থা যে অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে কি আর বাকী থাকে?

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে দুর্দশার দৃশ্য

এই সকল পরিসংখ্যানের উপর বিচার করিলে মনে যে-চিত্র ফুটিয়া উঠে গ্রামের অভ্যন্তরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাহা অপেক্ষা আরও ভয়াবহ চিত্র

দৃষ্টিগোচর হয়। জমির ফসলে ভাগচাষীদের প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধি করিবার জন্য আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে, এ সম্পর্কে কিছু আইনও প্রণীত হইয়া চালু হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও এখনও বহু অঞ্চলে ভাগচাষীরা স্বেচ্ছায় জমির মালিককে ফসলের অর্ধাংশ তো দেয়ই, উপরন্তু বিঘাপ্রতি ৭্-৮্-১০্ টাকা পর্যন্ত জমির মালিককে নগদ দিয়া থাকে। উহাকে সেলামী বলা হইয়া থাকে। কোন কোন অঞ্চলে নগদ না দিয়া স্বেচ্ছায় জমির মালিককে অর্ধাংশের অতিরিক্ত ফসল ভাগ দেওয়া হয়। সেইসব স্থানে আন্দোলন করিবার চেষ্টা করিলেও তাহা ফলবতী হয় না। কারণ সেইসব অঞ্চলে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা এত বেশী যে, তাহারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া গোপনে জমির মালিককে অতিরিক্ত ভাগ দিতে স্বীকৃত হইয়া জমি লইয়া থাকে। তাহারা লাভ-ক্ষতির দিকে লক্ষ্য করে না। চাষ করিয়া যে তাহাদের ক্ষতি হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। তথাপি জমি চাষ করিবার জন্য তাহাদের এরূপ দুর্দমণীয় আগ্রহ ও ব্যাকুলতা!

গত কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে—ফসল স্বাভাবিক হউক বা কম হউক, গ্রামের একাংশ লোকের মধ্যে প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষের অবস্থা আসিবেই। ইহারা হইতেছে ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেত-মজুর। ইহা ছাড়া ৫।৭ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকও আছে। ফসল হইবার পর ৪।৫ মাসের মধ্যে তাহাদের গৃহে আর কিছু থাকে না। পুরা কাজও পায় না। সরকার হইতে সস্তা দামে খাদ্যশস্য বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিলেও তাহাদের ক্রয় করিবার ক্ষমতা থাকে না। তাই পশ্চিমবাংলায় কয়েক বৎসর যাবৎ যে দুর্ভিক্ষ হইতেছে তাহা মাত্র খাদ্যশস্যের দুর্ভিক্ষ নহে—উহা প্রধানত ক্রয়-ক্ষমতার দুর্ভিক্ষ। ক্রমশ ঐ অবস্থা ব্যাপকতর ও গভীরতর হইতেছে। শুধু তাহাই নহে। ধরুন—দুর্ভিক্ষের অবস্থা নাই, স্বাভাবিক অবস্থা। আমন ধান্যের অঞ্চল। আশ্বিন-কার্তিক মাস। কোন এক গ্রামে গেলেন। চাষী গ্রাম। দেখিবেন—সন্ধ্যায় গ্রামের এক-তৃতীয়াংশ বাড়ীতে চুল্লীতে আগুন জ্বলিবে না। গ্রামের লোকে রাত্রে (৮।৯টার সময়) কোথাও সমবেত হইল। আপনি গ্রামের লোকের পরিচিত। শুষ্ক মুখ দেখিয়া কাহাকেও আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই, খাওয়া হয়ে গেছে কি?" শুষ্ক মুখে

হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া সে উত্তর দিবে—"হ্যাঁ"। কিন্তু বাস্তবিক সেবেলা তাহাকে অনাহারে থাকিতে হইয়াছে। এরূপে বৎসরের পর বৎসর তাহাকে অন্তত ৩।৪ মাস একবেলা-একসন্ধ্যা খাইয়া থাকিতে হয়। এরূপ বহু শুষ্ক মুখ গ্রামে ঐ সময় দেখিতে পাইবেন। লেখক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এই সব কথা বলিতেছেন। বিনোবাজী এক সংস্কৃত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"বুভুক্ষুমানঃ রুদ্ররূপেন অবতিষ্ঠতে" অর্থাৎ ক্ষুধার্তের রুদ্রমূর্তি। কিন্তু এখানকার দরিদ্র ক্ষুধার্ত কেমন শান্ত! তাহার এক মুখ আছে বটে কিন্তু কাজ করিবার জন্য দুই হাতও আছে—কর্মক্ষম, বলিষ্ঠ। কাজ করিতে প্রস্তুত, অথচ কাজ পায় না। তাই অনাহারে থাকিতে হয়। বিদ্রোহাগ্নি তো জ্বলিবার কথা! কিন্তু খাইতে পায় না সেজন্য অপরাধ যেন তাহারই—এইভাবে সে জীবনধারণ করিয়া আছে। ধনীরা আর কতদিন তাহাদের অনাহারে রাখিবেন? এখানে বিনোবাজীর এক মহতী বাণী স্মৃতিপটে উদিত হয়।—"'অন্নে সমস্য যদসন মনীষাঃ'. আমরা যদি এক গ্রাসও অন্ন গ্রহণ করি তবে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উহার মধ্যে সকলেরই বাসনা নিহিত রহিয়াছে। এইজন্য সকলকে খাওয়াইয়া তবে নিজে খাইবে। তবেই খাদ্য হজম হইবে। ধনীদের ভাল হজম হয় না—কেননা তাঁহারা যাহা খাইয়া থাকেন তাহার উপর সকলের বাসনা পড়িয়া রহিয়াছে।" গ্রামের শিল্প আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই। সবই তাহার কাছ হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে। শেষ যাইতে বসিয়াছে—ঢেঁকি। যতই ভূমি ধনীর হাতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে, ততই ঢেঁকির সর্বনাশ ঘটিতেছে। ধনীর গোলায় শত-শত মণ, হাজার-হাজার মণ ধান থাকে। সে তাহা কলওয়ালাকে বিক্রয় করিয়া দেয়। তাহার ধান ঢেঁকিওয়ালাকে দিয়া চাউল তৈয়ারী করাইয়া চাউল বিক্রয় করিবে না—সে ধানই বিক্রয় করিবে এবং তাহা কলওয়ালার কাছেই বিক্রয় করিবে। গ্রামের ঢেঁকিওয়ালার কাছে সে খুচরা বিক্রয় করিতে চাহে না। তাহার উপর এখন গ্রামে-গ্রামে হাস্কিং মেশিন বা ছোট চাউল-কল বসিয়া ঢেঁকির সর্বনাশ সাধন করিতে বসিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইবার পূর্বে শহর ও শিল্পাঞ্চলে বড়-বড় চাউল-কল ছিল। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ব্যবহারের জন্য যে-চাউল প্রয়োজন হইত তাহা ঢেঁকিতেই প্রস্তুত

হইত। এখন হাস্কিং মেশিন বসিয়া তাহা নষ্ট হইয়া গেল। বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় ২৪ শত লাইসেন্সপ্রাপ্ত হাস্কিং মেশিন ও লাইসেন্স নাই এমন ১২ শত হাস্কিং মেশিন—মোট ৩৬ শত হাস্কিং মেশিন চলিতেছে। বৎসরে ৩০০ দিন কাজ চলে ও দৈনিক গড়ে ৩০ মণ করিয়া ধান ভানে—এই হিসাবে বৎসরে অল্পাধিক ২ই কোটী টাকার আয় হইতে ঢেঁকি অর্থাৎ দেশের দরিদ্র সাধারণ বঞ্চিত হইতেছে। ইহা ভাবিলে হৃৎকম্প আসে। গ্রামাঞ্চলের যাঁহারা গণ্যমান্য শ্রেষ্ঠব্যক্তি তাঁহাদের অনেকেই এইসব হাস্কিং মেশিন স্থাপন করিয়া গরীবের শেষ সম্বলটুকু কাড়িয়া লইতেছেন। ইংরেজ রাজত্বের সময় বৃহৎ কল আমাদের প্রায় সব কাড়িয়া লইয়াছিল. অবশিষ্ট ছিল ঢেঁকি। দেশ স্বাধীন হইবার পর স্বাধীন দেশই বাকী অংশটুকুরও সর্বনাশ সাধন করিল। এ কলঙ্ক কাহিনী চিরতরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

পশ্চিমবঙ্গে ভূমি কি কম?

পশ্চিমবঙ্গে ভূদানযজ্ঞের সাফল্যের জন্য অনুকূল মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করিবার পক্ষে একটি বড় অন্তরায় শিক্ষিত লোকের ধারণা। তাহাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, সমগ্রভাবে ভারতের তুলনায় বাংলার জমি অপেক্ষাকৃত অনেক কম এবং তাই পশ্চিমবঙ্গ ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলনের পক্ষে উপযোগী ক্ষেত্র নহে। সত্যই কি পশ্চিমবঙ্গে জমি কম? ভারতের জনসংখ্যা ৩৬ কোটী এবং ভারতের আবাদী ভূমির পরিমাণ ৩০ কোটী একর অর্থাৎ ভারতের মোট জনসংখ্যার মাথাপিছু ভূমি হইতেছে ৮৩ শতক। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা মোটামুটি ২ই কোটী। কিন্তু উহার কর্ষিত ও কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ১ কোটী ৪৬ লক্ষ একর অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার মাথাপিছু জমি ৫৮ শতক। এই দৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গের জমি কম বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। কোন প্রদেশের জমি অপেক্ষাকৃত কম কি বেশী ইহা বিচার করিতে হইলে সেই প্রদেশের কৃষির উপর নির্ভরশীল লোক ও তাহাদের পোষ্যবর্গের সংখ্যা কত এবং তাহাদের মাথাপিছু জমি কত তাহা দেখিতে হইবে। মোট

লোকসংখ্যা জমির অনুপাতে বেশী হইলেও যদি কোন প্রদেশে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকসংখ্যা কম থাকে, তবে মোট লোকসংখ্যা বেশী হইলেও তাহাতে কিছু যায় আসে না। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তাহাই। এখানে মোট জনসংখ্যা জমির তুলনায় কোন-কোন প্রদেশ অপেক্ষা বেশী হইলেও কৃষির উপর নির্ভরশীলের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। উপরন্তু জনবহুলতা ও জমির প্রকৃতির দিক হইতে বাংলার অনুরূপ অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা মোট জনসংখ্যার তুলনায় বাংলার জমি কমও নহে। পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ ঐ অঞ্চলের নাম (লোয়ার গ্যাঞ্জেটিক্ প্লেনস্) অর্থাৎ গঙ্গার নিম্নাঞ্চল। উত্তরপ্রদেশ (বারাণসী, গোরক্ষপুর, বালিয়া প্রভৃতি ৮টি জেলা), ছোটনাগপুর ছাড়া সমগ্র বিহার এবং হিমালয়ের পাদদেশস্থ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চল সমতল, উর্বর ও ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনবহুল। ঐ অঞ্চলের প্রতি বর্গ-মাইলের জনসংখ্যা ৮৩২। তাই উহার সহিত পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করা সমীচীন। মধ্যপ্রদেশ বা রাজস্থান যেখানে বসতি কম, বহু জমি, পতিত জমিও বেশী, কিন্তু জমি তেমন উর্বর নহে, তাহার সহিত পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করিলে চলিবে না। গঙ্গার নিম্নাঞ্চলের জনসংখ্যা মোট ৭ কোটী, উহার ভূমি-আয়তন ৫ কোটী ৩৮ লক্ষ একর অর্থাৎ মাথাপিছু ৭৭ শতক। আর পশ্চিমবঙ্গের ভূমি-আয়তন মোটামুটি ১৮৩ লক্ষ একর অর্থাৎ মাথা-পিছু ৭৩ শতক। এখন আবাদী জমির দিক হইতে গঙ্গার নিম্নাঞ্চলের সহিত পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করা যাউক। ঐ অঞ্চলের আবাদী জমির মোট পরিমাণ ৩৫৬ লক্ষ একর অর্থাৎ আবাদী জমি মাথাপিছু ৫১ শতক। পশ্চিমবঙ্গের আবাদী জমির পরিমাণ ১২৮ লক্ষ একর অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গেও আবাদী জমি মাথাপিছু ৫১ শতক। এখন কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকেদের মাথাপিছু আবাদী জমি কোথায় কত তাহা দেখা যাউক। বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা লইয়া পূর্ব-ভারত এইরূপ বলা হয়। পূর্ব-ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭৫·৬ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। আর সারা ভারতে জনসংখ্যার শতকরা ৬৯·৮ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে, উক্ত অঞ্চলে অর্থাৎ গঙ্গার

নিম্নাঞ্চলে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোক উহার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫-এর কম নহে। উপরে বলা হইয়াছে যে, ঐ অঞ্চলের জনসংখ্যা ৭ কোটী। অতএব সেই অঞ্চলের কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকসংখ্যা অন্যূন ৫২৫ লক্ষ ও তাহাদের জনপ্রতি আবাদী জমির পরিমাণ ৬৮ শতক। অন্য-দিকে পশ্চিমবাংলায় কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকসংখ্যা ১ কোটী ৪০ লক্ষ। অর্থাৎ উহার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৭ ভাগ। উপরে বলা হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গে মোট আবাদী জমির পরিমাণ মোটামুটি ১২৮ লক্ষ একর। অতএব পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের মাথাপিছু জমি ৯১ শতক। অর্থাৎ গঙ্গার নিম্নাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চিমবাংলায় কৃষিজীবী লোকের মাথাপিছু আবাদী জমি ২৩ শতক করিয়া বেশী। যাঁহারা এই সম্পর্কে বিপরীত ধারণা পোষণ করেন, ইহাতে তাঁহাদের চোখ খুলিয়া যাওয়া উচিত। এখন এই সম্পর্কে সারা ভারতের সহিত বাংলার তুলনা করা যাউক। ভারতে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোক মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৯·৮ ভাগ—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং ভারতে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকসংখ্যা মোটামুটি ২৫ কোটী। ভারতে মোট কর্ষণযোগ্য (কর্ষিত সমেত) ভূমির পরিমাণ মোটামুটি ৩০ কোটী একর। অর্থাৎ মাথাপিছু ১·২০ একর। পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকসংখ্যা মোটামুটি ১৪০ লক্ষ ও কর্ষণযোগ্য ভূমি ১৪৬ লক্ষ একর অর্থাৎ মাথাপিছু ১·০৪ একর। অতএব পশ্চিমবঙ্গে জমি কম কি?

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হইতে বাংলায় ভূদানযজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। খাস জমি যদি এমন ব্যক্তির নিকট থাকে যাঁহা তিনি নিজে বা নিজের পরিবারের লোক-জনের দ্বারা চাষ করা তো দূরের কথা মজুর দিয়া চাষ করানও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে, তবে তিনি ঐ জমি ভাগচাষীর দ্বারা চাষ করাইয়া লন। অথবা খাজনায় অস্থায়ীভাবে দুই-এক বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত দিয়া থাকেন। জমিদার, বড়-বড় জোতদার ও মধ্যবিত্ত যাঁহারা চাকুরী, ব্যবসা প্রভৃতিতে ব্যাপৃত থাকেন তাঁহাদের যেসব খাস জমি আছে সেইসব জমি সাধারণত ঐভাবে চাষ করানো হইয়া থাকে। অর্থাৎ অনুৎপাদকের হাতে খাস জমি

থাকিলে সেইজমির চাষ ঐভাবে হইয়া থাকে। ভূমি-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ঐসব জমি ভূমিহীন দরিদ্রের মধ্যে বণ্টিত হওয়া আবশ্যক। তাই ভাগচাষের জমি ও অন্যান্য অস্থায়ী বন্দোবস্তের জমি যে-প্রদেশে যত বেশী সেই প্রদেশে ভূদানযজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা তত অধিক। এইদিক হইতে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কিরূপ দেখা যাউক। এক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯৪৬-৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে ভাগচাষ প্রথায় যে-জমি চাষ করা হয় তাহার পরিমাণ ছিল পশ্চিমবঙ্গের মোট আবাদী জমির শতকরা ৩৮·২৬ ভাগ। কিন্তু ১৯৫১ সালের লোক-গণনার রিপোর্টে প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গে ভাগচাষ জমির পরিমাণ আবাদী জমির মোটামুটি শতকরা ২৩ ভাগ। ইহা ঠিক হিসাব নহে। পশ্চিমবঙ্গে লোক-গণনার সুপারিণ্টেডেণ্ট নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, লোক-গণনার অব্যবহিত পূর্বে বর্গাদার-আইন প্রণীত হওয়ায় জমির মালিকগণ তাঁহাদের ভাগচাষ জমির পরিমাণ কম করিয়া বলিয়াছেন।* এইরূপে লোক-গণনার রিপোর্টে ভুল হিসাবই সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১৯৪৬-৪৮ সালে ভাগচাষের জমি যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা ১৯৫১ সালে কম হইতেই পারে না। বরং বেশী হইবে। বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় ভাগচাষ-জমির পরিমাণ উহার আবাদী জমির শতকরা ৪০ ভাগ হইবে। সাম্প্রতিক দুইটি অনুসন্ধান হইতেও ঐরূপ প্রমাণিত হইয়াছে। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ তাঁহার লিখিত এক প্রবন্ধে ঐরূপ বলিয়াছেন। যাহা হউক, উহা শতকরা ৩৮-এর কম যে হইবে না ইহা নিশ্চিত। ভারতবর্ষে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের অনুপাতে ভাগচাষীর ও অনুরূপ শ্রেণীর চাষীর সংখ্যা শতকরা ১২·৭ এবং পূর্ব-ভারতে উহা শতকরা ১২·৪ ভাগ। সুতরাং ভারতবর্ষে ও পূর্ব-ভারতে ভাগচাষ-জমির পরিমাণ ও মোট আবাদী জমির অনুপাত ঐরূপ বা উহার কাছাকাছি হইবে সন্দেহ নাই। সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ভাগচাষ-জমির অনুপাত উহার ৩ গুণ। অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশে খাস জমির সব চাইতে বেশী অংশ অনুৎপাদকের হাতে রহিয়াছে। ঐ দৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গে ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সব চাইতে বেশী এবং পশ্চিমবঙ্গই যে ভূদানযজ্ঞের পক্ষে সব

চাইতে উপযোগী ক্ষেত্র এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে জমি অপেক্ষাকৃত কম—এই আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক।

দরিদ্র চায় জমি

বলা হয়, গ্রামের বহু দরিদ্র অলস ও কর্মবিমুখ। তাহাদের মধ্যে গৃহশিল্প প্রচলন করিবার জন্য প্রচেষ্টা করিয়া বিফল হইতে হইয়াছে। ইহা সঠিক উক্তি নহে। তবে ইহা সম্পূর্ণ অসত্য—তাহাও নহে। প্রথমে গৃহ-শিল্প তাহাকে দিলে সে তাহা অন্তরের সহিত গ্রহণ করে না। কিন্তু তাহাকে জমি দাও, সে পাগলপ্রায় হইয়া ছুটিয়া আসিবে। কারণ সে প্রথমে চায় জমি। ভূমি-সমস্যা প্রথমে সমাধান করিতে পারিলে অন্য সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টাই সফল হইবে। নচেৎ সবই ডুবিবে। দরিদ্রের মধ্যে যে কিছুটা আলস্য আসিয়াছে, তাহা সত্য। কিন্তু তাহার জন্য সে দায়ী নহে। Enforced idleness বহুদিন চলিলে অর্থাৎ বাধ্যতামূলকভাবে বহু-দিন কর্মহীন হইয়া থাকিতে হইলে ক্রমে তাহা কর্মবিমুখতা ও অভ্যাসগত অলসতায় পরিণত হয়। গ্রামের দরিদ্রদের অবস্থাও তাহাই হইয়াছে। তবে জমি চাষ করিতে তাহার আলস্য থাকিবে না। কিন্তু তাহার সেই জমি নিজের করিয়া পাওয়া চাই।

বেকার-সমস্যা ও তাহার স্বরূপ

লোকগণনার বিবরণীতে ১৫ হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণকে কার্যক্ষম বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৫১ সালের গণনা অনুসারে সারা ভারতে তাহাদের সংখ্যা ২১ কোটী ২০ লক্ষ। কিন্তু দারিদ্র্যের চাপে এদেশে একদিকে ১০ বৎসরের বালক এবং অন্যদিকে ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধকে পর্যন্ত কাজ করিতে হয়। সেই হিসাবে ভারতের কার্যক্ষম লোকের সংখ্যা ২৪ কোটী। ইহার মধ্যে মোটামুটি ১৪ কোটী লোক কাজ পায় আর ১০ কোটী লোককে বেকার বসিয়া থাকিতে হয়। যে ১৪ কোটী লোক কাজ পায় তাহারাও পুরা কাজ পায় না। ঐ ১৪ কোটী লোকের মধ্যে ১০ কোটী লোক চাষের কাজ করে। যাহারা চাষের কাজ করে তাহাদের অধিকাংশের

মাত্র ৬ মাস কাজ থাকে এবং অবশিষ্ট ৬ মাস তাহাদিগকে বেকার বসিয়া থাকিতে হয়। কারিগর শ্রেণীর লোকসংখ্যা গ্রামের লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় ১০ জন। কাজের অভাবে তাহাদেরও বৎসরে ৬ মাস বসিয়া থাকিতে হয়। সুতরাং আমাদের দেশের বেকার-সমস্যা যে কত ব্যাপক তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কৃষকদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনের জমির পরিমাণ ৫ একরেরও কম এবং তাহাদের বার্ষিক আয় নিতান্ত কম। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, যেসব কৃষকদের নিজেদের জমি আছে তাহাদের মধ্যে অর্ধেকের বার্ষিক আয় ৩০০৲ টাকারও কম এবং চাষ আবাদের খরচ বাদে তাহাদের লাভ থাকে ৬০৲ টাকা বা তদপেক্ষা কম। ভূমি-সংস্কার বা কৃষির উন্নতির জন্য তাহারা বৎসরে ২২৲ টাকা হইতে ৫১৲ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করিতে সমর্থ নহে।* গ্রাম্য কারিগরগণের বার্ষিক আয়ও খুব কম। কৃষির কাজে ও কুটির-শিল্পে শতকরা ৭৫ জন লোক কাজ করে। তাহাদের এই দুরবস্থা! তাই দেশে বেকার-সমস্যা যেমন বিরাট তেমনি যাহারা বেকার নহে তাহাদের মধ্যেও দারিদ্র্য তেমনি ভয়ানক।

আজকাল পত্রিকাদিতে ও লোকমুখে বেকার-সমস্যার কথা প্রায়ই আলোচিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের আলোচ্য ঐসব বেকার কাহারা? যে অনাশনক্লিষ্ট বা অর্ধাশনক্লিষ্ট মরণোন্মুখ কোটী-কোটী দরিদ্র ভূমিহীন ও কারিগরের কথা আলোচনা করা হইল এ তাহারা নহে। তাঁহাদের আলোচ্য বেকার হইতেছে—শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বেকার। উহাদের বেকারত্ব ঘুচাইতে হইবে এবং উহা যে দেশের এক সমস্যা—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের বেকার-সমস্যার হিসাবে মাত্র তাহাদিগকেই দেশ বা জগতের সমক্ষ তুলিয়া ধরা বিভ্রান্তিকর। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনায় তাহা সরকারী হউক আর বে-সরকারী হউক, ঐ সব কোটী-কোটী ভূমিহীন দারিদ্রের স্থান থাকে না। যদি বা থাকে, তাহা নিতান্ত গৌণভাবে থাকে। তাই যাহা দেশের সব চাইতে জরুরী সমস্যা তাহা আজ সাধারণ শিক্ষিত

* শ্রীঅন্নসাহেব সহস্র বুদ্ধের "পরিকল্পনা ও আর্থিক কার্যক্রম" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে এই সংখ্যাগুলি গৃহীত হইয়াছে।

সমাজের ও সরকারের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া যাইতেছে—ইহা অদৃষ্টের পরিহাস। বিনোবাজী তাই দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"যদি সর্বাত্মক পরিকল্পনা করা সম্ভব না হয় এবং যদি আংশিক পরিকল্পনাই (প্লানিং) করিতে হয়, তবে ঐসব কোটী-কোটী দরিদ্রের স্থান তাহাতে অগ্রগণ্য হওয়া আবশ্যক।" ইহার কারণ কি? কারণ উহারাই দেশের সব চাইতে নিম্নস্তরের, উহারাই সব চাইতে দরিদ্র, সব চাইতে নিঃসম্বল ও অসহায়। এস্থলে মহামতি মার্কসের একটি কথা উল্লেখ করিতে চাই। তিনি সেইকালে ও সেইদেশে যাহাদেরই লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলিয়া থাকুন না কেন আজ ঐ উক্তিতে এইসব অসহায় মরণযাত্রী ভূমিহীন দরিদ্রের চিত্র ফুটিয়া উঠে :– "The forest of uplifted arms demanding work becomes ever thicker, while the arms themselves become ever thinner" অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের কাজের দাবীতে ঊর্ধ্বপ্রসারিত হস্তের সংখ্যা অনবরত বাড়িয়া চলিয়া ঐসব প্রসারিত হস্তের বন যতই নিবিড়তর হইতেছে ততই ঐসব কর্মহীন হস্ত নিরন্তর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। তাই আজ তাহাদেরই কল্যাণ-ব্যবস্থার কষ্টিপাথরে সবকিছুকে যাচাই করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর এক নিরুপম বাণী মানসপটে উদিত হয়। 'I will give you a talisman. Whenever you are in doubt ....apply the following test. Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him Will he gain something by it? Will it restore him to a control over his own life and destiny? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry and spiritually starving millions?" — "আমি আপনাকে একটি মন্ত্রপূত কবচ দিব। যখনই কোন বিষয়ে সন্দেহ হইবে তখনই এই পরীক্ষাটি প্রয়োগ করিবেন। নিজে দেখিয়াছেন এমন সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, সব চাইতে অসহায় লোকের মুখ নিজের স্মৃতিপটে আনিবেন এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, আপনি যে-ব্যবস্থা করিতে যাইতেছেন তাহাতে তাহার কোন উপকার হইবে কি না! ইহার দ্বারা সে

কি লাভবান হইবে? ইহাতে কি সে নিজের জীবনযাত্রা ও ভাগ্যের উপর আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিবে? অর্থাৎ ইহাতে কি ক্ষুধার্ত ও আধ্যাত্মিকতার অলোকবঞ্চিত কোটী-কোটী লোকের স্বরাজ আসিবে?"

এই দৃষ্টিতে ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন যে প্রকৃষ্টতম ব্যবস্থা সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধানের উপায়

কিরূপে এই দারিদ্র্য, শোষণ ও অসহনীয় ধনবৈষম্য দূরীভূত হইবে? ইহার প্রকৃষ্ট পন্থা কি? ইহার প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে যে, যে-যে কারণে দারিদ্র্য ও শোষণের সৃষ্টি হইয়াছে সেই-সেই কারণ দূরীভূত করা। অর্থাৎ উৎপাদনের মৌলিক সাধন ভূমিকে অনুৎপাদক ধনীর হাত হইতে দরিদ্র ভূমিহীনের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া, ভূমির সঙ্গত বণ্টন করিয়া দেওয়া। উপরন্তু উপাদানের যন্ত্রও গ্রামের শ্রমিক-শিল্পীকে ফিরাইয়া দিওয়া। অনেকে মনে করেন, অন্যকাজ দিয়া দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। অনেকের ধারণা—যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধান করা যাইবে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ইহা সম্ভব নহে। এই দেশে যে-বৃহৎ শিল্প এযাবৎ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা একশত বৎসর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাতে এযাবৎ মাত্র ২৫ লক্ষ লোককে কাজ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। সরকার মনে করেন যে, আগামী বৎসরে যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে ২½ কোটী লোককে কাজ দেওয়া যাইতে পারিবে। সরকারী পরিকল্পনায় যাহাই থাকুক না কেন, ইহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইংলন্ড বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে ধনশালী হইয়াছে সত্য। কিন্তু তাহার বৃহৎ যন্ত্রজাত পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য ইংলন্ডের বিশ-পঁচিশ গুণ পরিমিত ভূখন্ডকে বলপ্রয়োগে পদানত রাখিতে হইয়াছিল। তবেই সে কাঁচামাল সংগ্রহ ও পণ্য বিক্রয় করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। আজ কি তাহা সম্ভব? ভারতকে যদি বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে তাহার দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তবে খরিদ্দারের অন্বেষণের জন্য তাহাকে মঙ্গল আদি গ্রহে যাইতে হইবে। এই যুগে পৃথিবীর কোথাও তাহার পণ্য বিক্রয় করিবার স্থান বা সুযোগ হইবে না। আমেরিকার ভূমি

বণ্টন করিলে সেখানকার জনসংখ্যার মাথাপিছু ২৫ একর করিয়া পড়িবে। উপরন্তু অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সে পাইয়াছে। রুশিয়ার জনসংখ্যা ও ভূমির পরিমাণ যেরূপ তাহাতে তাহারও ভূমি-সমস্যা নাই। অষ্ট্রেলিয়া ভারতের তুলনায় অনেক বৃহৎ দেশ, তাহার লোকসংখ্যা এখনও এক কোটীতে উঠে নাই। ভারতের লোকসংখ্যা ৩৬ কোটী, কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ৩০ কোটী একর। মাথাপিছু ১ একর ভূমিও নাই। পশ্চিমবাংলার কার্ষিত ও কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ মোট ১ কোটী ৪৬ লক্ষ একর এরূপ হইবে; লোকসংখ্যা ২ই কোটী—তাহার উপর নবাগত উদ্বাস্তু রহিয়াছে। মাথাপিছু ২ বিঘা করিয়া জমিও পড়ে না। জমি ছাড়া জীবিকার আর অন্যকোন উপায়ও গ্রামে অবশিষ্ট নাই। ভারত প্রযত্ন করিলেও তাহার জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান আমেরিকা বা ইংলণ্ডের মত উন্নীত করিতে কখনও সমর্থ হইবে না। ভারত যদি ঠিক পথে চলা শিক্ষা করে, তবেই সে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করিয়া সকলের স্বচ্ছল জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবে। অন্যদিকে ভারত যদি আমেরিকা ও ইংলণ্ডের পদাঙ্কানুসরণ করিতে অগ্রসর হয় তবে সে আরও কতিপয় ধনকুবের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে বটে, কিন্তু জনগণের বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূর করিতে কিছুতেই সক্ষম হইবে না—বরং উত্তরোত্তর সে অতল জলে ডুবিবে। বিনোবাজী বলিয়াছেন, "আমি তো প্ল্যানিং কমিশনকে এই কথা বলিয়া দিয়াছি, যদি আপনারা দেশের সমস্ত লোকের জন্য প্লানিং করিতে সমর্থ না হন এবং মাত্র আংশিক প্লানিং করেন, তবে সে-আংশিক প্লানিং গরীবের জন্য করুন। এই প্রসঙ্গে আমি রাজাজীর উদাহরণ দিতে চাই। রাজাজীর মত প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ যদি না থাকিতেন তবে মাদ্রাজে কি অবস্থা হইত তাহা কল্পনা করা যায়। তিনি গরীবদের দৃষ্টিকেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কন্ট্রোল-ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়াছেন এবং সব চাইতে তাঁহার বড় কাজ এই যে, তিনি এখন তাঁতীদের সমস্যার কথা উঠাইয়া তাহাদের হিতের জন্য বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছেন। আমি প্লানিং কমিশনকে এই কথা বলিয়া দিয়াছি যে, যদি বৃহৎ যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত লোকের বেকার-সমস্যা দূর করা যায় তবে আমি আমার চরকা জ্বালাইয়া দিব। পরন্তু আমি জানি যে, গ্রাম-

শিল্প ভিন্ন এই সমস্যার সমাধান করা কিছুতেই সম্ভব নহে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"লোকে বলে, জমি কোথা হইতে দিব? তাঁহারা অন্য কাজ দিবার কথা বলেন। এ কথার কোন মূল্য নাই। অন্য কাজ দিবার আপনি কে? মায়ের কোল হইতে সন্তানকে ছিনাইয়া লইয়া অন্য কি কাজ আছে যাহা তাহাকে দিতে পারেন? গ্রামশিল্পগুলিও তো তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে ও হইতেছে, তাঁতীর কাজ তো বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, ইহার পরেও তাহাকে অন্য কি কাজ দিবেন? জমি তো এক বুনিয়াদী চাহিদা। জমি পঞ্চভূতের মধ্যে অন্যতম। উহা দিতে আপনি অস্বীকার করিতে পারেন না।" ভারতকে তাহার নিজের অবস্থা ও সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে। জমির সংগত বণ্টন হইলেও তাহাতেই গ্রাম-বাসীদের চলিবে না। গ্রামপরিবার মোটামুটি ৫ একর করিয়া জমি পাইলেও তাহাতে তাহার স্বচ্ছলভাবে জীবনযাত্রা চলিবে না। পশ্চিমবাংলায় মাথা-পিছু জমির পরিমাণ যেরূপ তাহাতে পাঁচজনের পরিবার-পিছু ৫ একর করিয়াও জমি দেওয়া চলিবে না।* সুতরাং তাহার জন্য অন্য কিছু উপ-জীবিকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। একমাত্র গ্রাম্যশিল্পের দ্বারাই তাহা সম্ভব হইতে পারে। বর্তমান অবস্থায় যে-যে শিল্প কুটিরশিল্পরূপে চালু করা সম্ভব, তাহারই ব্যবস্থা তাহাদের জন্য করিতে হইবে। খাদ্য ও পরিধেয় এবং বাসগৃহের সরঞ্জাম যাহা গ্রামে প্রস্তুত করা সম্ভব তাহা গ্রাম্যশিল্পের দ্বারা উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া যেসব কাঁচামাল গ্রামে উৎপন্ন হয় এবং উহা হইতে উৎপন্ন যেসব পাকা মাল ঐ গ্রামেরই প্রয়োজন, তাহা উৎপাদন করিবার ব্যবস্থাও গ্রাম্যশিল্পের দ্বারা করিতে হইবে। আজ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি বিকারগ্রস্ত। আজ সে বৃহৎ শিল্পযন্ত্রের উন্নতি সাধনে

*পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা (পোষ্যবর্গ সমেত) ১,৪০,৪৬,০৪০। তন্মধ্যে নিজের জমি আছে ৮০,২৩,৭৫৭ জনের; অন্যের জমি চাষ করে ২৯,৮০,৪০২ জন এবং কৃষিশ্রমিক ৩০,৪১,৮৮১ জন। পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমির পরিমাণ ১ কোটী ২৮ লক্ষ একর ১,২৮,৬২,৮০০/১৯৫১ সাল) এবং আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ১৮ লক্ষ একর (১৮,২৯,৮০০)।

উন্মত্ত। এদেশের কোন বৈজ্ঞানিক অন্যকথা দূরে থাকুক—ঢেঁকিতে 'বল-বেয়ারিং' বা অন্য সহজ সরল কিছু লাগাইয়া উহার ব্যবহার বা কাজ কম শ্রমসাধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কি? আজ বৈজ্ঞানিককে গ্রাম্যশিল্পযন্ত্রের উন্নতি সাধনে জরুরীভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে। হিংসার সহিত বিজ্ঞানের অবৈধ মিলন ঘটিয়াছে, তাই আজ জগৎ ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। বিজ্ঞান যদি জগতের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে চায় তবে অহিংসার সহিত বিজ্ঞানের পরিণয় হওয়া চাই। গ্রাম্যশিল্পে উৎপন্ন খাদ্য, পরিধেয় প্রভৃতির মূল্য মিলজাত দ্রব্যের মূল্যের তুলনায় অধিক হইলেও সমগ্র দৃষ্টিতে বা সারা দেশের কল্যাণের দিকে তাকাইয়া শহরবাসীকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রামকে দরিদ্র ও বেকার রাখিয়া মিলজাত সস্তা মালের দিকে ধাবিত হইলে চলিবে না। শহর গ্রামকে শোষণ করিবার জন্য নহে, পরন্তু গ্রামকে সেবা করিবার জন্যই থাকিবে।

কর্তৃত্ব বিভাজন

কিন্তু এই সংকল্প বা কাম্য সার্থক করিয়া তুলিবার উপায় কি? অর্থাৎ গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গ্রাম্যশিল্পকে তাহার যথাযোগ্য স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় কি? জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদি সরকার দণ্ডশক্তির সাহায্যে গ্রাম্যশিল্প পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন তবে ভাল কথা। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব করা যাইবে? ভূমি-সমস্যা সমাধানের জন্য 'জনশক্তি' নির্মাণের বিষয় পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। যদি তাহা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া থাকি তবে দণ্ডনিরপেক্ষভাবে কিরূপে গৃহশিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। গৃহশিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সমাজে বিচার-বোধ জাগ্রত করিয়া ঐ সম্পর্কে সমাজনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাই হইবে সর্বোদয়-সেবকদের কাজ। খাদি প্রভৃতি রচনাত্মক কার্যক্রম অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সেই বিচারবোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজ বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, ভূদানযজ্ঞ পূর্ণ হইলে তবে ঐসব রচনাত্মক কার্যক্রম সফল করা সহজসাধ্য হইবে। সমাজে ব্যাপকভাবে

বিচারবোধ জাগ্রত হইলে সেই বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কার্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়াকে বিনোবাজী 'বিচার-শাসন' বলিয়াছেন। জনশক্তি কার্যকরী করার জন্য বিচার-শাসন প্রধান উপায়। গৃহশিল্পের ক্ষেত্রেও ঐরূপ। কিন্তু গ্রাম্যশিল্প প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কেবলমাত্র বিচার-শাসনের দ্বারা কাজে পূর্ণ সফলতা লাভ করা সম্ভব হইবে না। মনে করুন, কোন এক গ্রাম বা অঞ্চল বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কেবলমাত্র ঘানির তৈল ব্যবহার করিতে চাহিল এবং গ্রামের প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত সংখ্যক ঘানি গ্রামের মধ্যে চালাইতে চাহিল। কিন্তু বাহির হইতে গ্রামের মধ্যে কলের তৈল আসা বন্ধ হইল না। তাহাতে গ্রামের সংকল্প সিদ্ধ হওয়া সম্ভব হইবে না। সুতরাং গ্রামের এই অধিকার থাকা চাই যে, গ্রামের মধ্যে কোন্ জিনিস প্রবেশ করিতে পারিবে ও কোন্ জিনিস প্রবেশ করিতে পারিবে না—তাহা গ্রামই স্থির করিতে পারিবে। তাহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে তৎ-তৎ জিনিসের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে হইবে। অতএব জনশক্তি কার্যকরী করার দ্বিতীয় উপায় হইতেছে—কর্তৃত্ব-বিভাজন। যতদিন সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীকৃত হইয়া থাকিবে ও গ্রামে-গ্রামে এই শক্তি বিকেন্দ্রীকৃত করিয়া দেওয়া না হইবে ততদিন প্রকৃত 'গ্রাম-রাজ' প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে না। তাই বিনোবাজী বলেন, "বিচার-শাসন ও কর্তৃত্ব-বিভাজন—জনশক্তির এই দুই হাতিয়ার। অতএব আমরা এই ক্ষমতা চাহিতেছি যে, যদি কোন গ্রামের লোক চাহে যে 'আমরা গ্রামের মধ্যে বাহিরের মাল আসিতে দিব না' তবে গ্রামের সেই অধিকার থাকা চাই। যদি কোন গ্রাম বা অঞ্চলের অধিবাসীগণ ইহা স্থির করেন যে, সেই অঞ্চলে যে-ধান উৎপন্ন হয় তাহা চাউল-কলের জন্য চালান দেওয়া হইবে না ও কলের চাউল সেই অঞ্চলে আসিতে পারিবে না, তবে গ্রামের সেই অধিকার থাকা চাই ও সেই অধিকারকে কার্যকরী করিবার ক্ষমতা তাহাদের থাকা চাই। যদি সরকার তাহা মানিয়া লন, তবে অহিংসার পক্ষে তাহা অনুকূল হইবে। কিন্তু যদি তাহা না করেন তবে উপায় কি? সে সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"সরকার যদি তাহা স্বীকার না করেন তবে আমরা জনসাধারণের কাছে গিয়া বলিব যে, এই স্বরাজ্য আসল স্বরাজ্য নহে। সেক্ষেত্রে আমরা ঐরূপ চাহিতে থাকিব ও সরকার উহার বিরোধী থাকা সত্ত্বেও আমরা উহা

কার্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুত হইব।" বিনোবাজী আরও বলিয়াছেন, "যখন আমরা এই কথা (কর্তৃত্ব-বিভাজন) বলি তখন কর্তৃপক্ষ বলেন যে, এইভাবে এক বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে ছোট রাষ্ট্র থাকা চলিতে পারে না। তাহাতে আমি ইহা বলিতে চাহি যে, যদি আমরা ক্ষমতার বিভাজন না করি, কর্তৃত্বের বিভাজন না করি তবে সেনাবল অনিবার্য—ইহা বুঝিয়া লউন। তাইতো সেনা ছাড়া আজ চলিতেছে না এবং কখনও চলিবে না। অতএব চিরদিনের জন্য ইহা স্থির করুন যে, সেনাবলের দ্বারা কাজ চালাইবেন ও সেনা সুসজ্জিত রাখিবেন। এবং একথা আর কখনও বলিবেন না যে, আমরা একদিন না একদিন সৈন্যবলের প্রয়োজন হইতে মুক্ত হইতে চাই। যদি কোনও দিন সৈন্য ছাড়িয়া দিতে চান তবে পরমেশ্বর যেরূপ করিয়াছেন আমাদেরও সেরূপ করিতে হইবে। পরমেশ্বর বুদ্ধির বিভাজন করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেককে তিনি বুদ্ধি দিয়াছেন—বৃশ্চিককেও দিয়াছেন, সর্পকেও দিয়াছেন, ব্যাঘ্রকেও দিয়াছেন এবং মনুষ্যকেও দিয়াছেন। কমবেশী দিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রত্যেককেই বুদ্ধি দিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন যে, তোমরা নিজ-নিজ জীবনের কাজ নিজ-নিজ বুদ্ধি অনুসারে কর। তাই সারা পৃথিবী এমন উত্তমভাবে চলিতেছে যে, তিনি বিশ্রাম লইতেছেন এবং এতদূর বিশ্রাম লইতেছেন যে, লোকের সন্দেহও হয় যে পরমেশ্বর আছেন কি নাই! আমাদের রাষ্ট্রও এমনভাবে চলা চাই যাহাতে শঙ্কা আসে যে রাষ্ট্রশক্তি আদৌ আছে কি নাই! লোকে যখন বলিবে যে, ভারতে বোধহয় কোন রাষ্ট্রশক্তি নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে আমাদের রাজ্যশাসন অহিংসক হইয়াছে। এইজন্য আমরা গ্রাম-রাজ্যের কথা বলিয়া থাকি এবং এইজন্য আমরা চাই যে, গ্রামেরই নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা হউক অর্থাৎ গ্রামের লোক নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা নিজের হাতে লউক। জনশক্তি সম্পর্কে ইহাও এক প্রশ্ন উঠিয়াছে যে গ্রামবাসীরা নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া যদি ইহা স্থির করে যে, অমুক মাল আমরা উৎপাদন করিব এবং তাহারা সরকারের নিকট চাহে যে, অমুক মাল এখানে আসিতে দেওয়া হইবে না এবং উহার আসা বন্ধ করা হউক এবং যদি সরকার তাহা বন্ধ না করেন অর্থাৎ বন্ধ করিতে না পারেন, বন্ধ করিতে চাহিলেও যদি বন্ধ করিতে না পারেন, তবে উহার বিরোধিতা করিবার জন্য

দণ্ডায়মান হওয়ার সাহস করিতে হইবে।"

ভূদানযজ্ঞ—প্রেমের পথ

অন্যদেশে হিংসার পথে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য দূর করা হইয়াছে। ভূদানযজ্ঞে প্রেমের পথে সেই বৈষম্য দূর করা হইবে। ধনীর ধনিকত্ব দূর করা এবং গরীবের গরীবত্ব দূর করা—ইহাই ভগবানের প্রেমের রীতি। এই প্রসঙ্গে বলিতে গিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন—"ভগবান সকলকে সমান করিতে চান। উহা তাঁহার প্রেম—দ্বেষ নহে। আমি যে-কাজ করিতেছি তাহা ভগবানের কাজ। আমি বড়র অহঙ্কার দূর করিতে চাই এবং ছোটকে উঁচুতে উঠাইতে চাই। বড়র নিকট হইতে জমি লইয়া ভূমিহীন দরিদ্রকে, জীবিকার জন্য দিতে চাই। ইহাতে এরূপ ভাবা ঠিক নহে যে, বড়দের সঙ্গে আমার শত্রুতা আছে। আমি তো তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিতে চাহিতেছি। তাঁহাদের নিকট হহতে জমি লইয়া গরীবদের পবিত্র প্রেম তাঁহাদিগকে দেওয়াইতে চাহিতেছি। সমাজে বৈষম্য রহিয়াছে বলিয়া ধনী ও দরিদ্র উভয়েরই অনিষ্ট হইতেছে ও সমস্ত মিলিয়া দেশের ক্ষতি হইতেছে। অন্য দেশে এই বৈষম্য দূর করিতে গিয়া ধনীদের হত্যা করা হইয়াছে। রুশিয়ায় হাজার-হাজার ধনীকে হত্যা করা হইয়াছে ও তেলঙ্গানাতে শত-শত ধনীকে খুন করা হইয়াছে। বিনা হত্যায় ও বিনা খুন-জখমে আমি ভারতে এই কার্য সাধন করিতে চাহিতেছি। আমার কাজ প্রেমের পথে হইবে। ভগবানের ইচ্ছা এই যে, সুখ এবং দুঃখ উভয়কে আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লই। যদি সকলে নিজ-নিজ স্বার্থের কথা চিন্তা করে এবং প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার না করে তাহা হইলে ঐরূপ গ্রাম গ্রামই নহে—উহা শ্মশান—উহা জঙ্গল।"

ভূমি-সমস্যা সমাধানে অহিংস-পথের বিচার

মানুষকে বিচার বুঝাইলে সে বুঝিতে পারিবে এবং যখন সে তাহা বুঝিবে তখন সে তদনুযায়ী আচরণ ও কার্য করিবে। এই বিশ্বাসই অহিংসার ভিত্তি। মানুষ পশু নহে। পশুকে বিচার বুঝাইলে সে তাহা

বুঝে না। মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য এইখানেই। পশুকে ভগবান স্বাধীন বোধশক্তি দেন নাই। মানুষকে তিনি তাহা দিয়াছেন। পশুকে ভগবান যেটুকু বুদ্ধি ও চেতনা দিয়াছেন তদনুসারে সে আচরণ করিবে—তাহা ভাল হউক আর মন্দ হউক। কিন্তু মানুষকে তিনি অপরিমিত বোধ-শক্তি দিয়াছেন। এই বোধশক্তির মধ্যে আত্মজ্ঞানের শক্তিও নিহিত। মানুষ তাহার আত্মজ্ঞানকে অনন্তগুণ বিকশিত করিতে পারে। নিজেকে আপন দেহে সীমাবদ্ধ করিয়া ভাবা আত্মজ্ঞানের সব চাইতে সংকুচিত অবস্থা। সারা জগতকে—সারা সৃষ্টিকে নিজেরই বিস্তার বলিয়া গ্রহণ করা হইল আত্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকশিত অবস্থা। আত্মজ্ঞান যতই বিকশিত হইবে ততই হৃদয়ে প্রেমের বিকাশ হইবে এবং ততই জীবন প্রেমময় হইবে। এই প্রেমের শক্তিতে হৃদয়ের পরিবর্তন সাধিত হয়। আবার জীবন যতই প্রেমময় হইতে থাকিবে আত্মজ্ঞানের বিকাশসাধন ততই সহজ হইবে। তাই প্রেমকে জীবনের মূলতত্ত্ব বলা হয়। আত্মজ্ঞানের বিকাশ তথা প্রেমের বিকাশ সাধনই ভূদান-যজ্ঞের মূলতত্ত্ব।

অহিংসার পথে ভূমি-সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব কি? বিনোবাজী এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে ঈশ্বর বিরাজমান এবং আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার নিয়মন তিনিই করিয়া থাকেন এবং সারা প্রেরণা তিনিই দান করিয়া থাকেন, তবে আমার বিশ্বাস এই যে, তাঁহাদের (সকলের) হৃদয় পরিবর্তন করিতে পারা নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে। যদি কালাত্মা দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন এবং তিনি পরিবর্তন করাইতে চাহেন তবে পরিবর্তন নিশ্চয় হইবে। মানুষ চাহুক বা না-ই চাহুক, যখন মানুষ প্রবাহের মধ্যে পড়ে তখন তাহার নিজের তরিবার শক্তি কোন কাজে আসে না—তখন প্রবাহের শক্তিই কার্যকরী হয়। সেইরূপ মনুষ্যহৃদয়ে পরিবর্তন আনাইবার জন্য কালপ্রবাহ সহায়করূপে ক্রিয়াশীল হয়। আজ তো সকলের ভূমি উত্তপ্ত হইয়া আছে। এই উত্তপ্ত ভূমির উপর দুই বিন্দু প্রেমবারি সিঞ্চন করিবার কাজ ভগবান আমার দ্বারা যদি করাইয়া লইতে চান তবে আমি তাহা আনন্দের সহিত করিব।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন, "লোকে জিজ্ঞাসা করে, প্রেমের পথে,

অহিংসার পথে সফলতা পাওয়া সম্ভব কি? যাঁহাদের সারা জীবন পরিবার-পরিজনের স্নেহ-প্রীতির মধ্যে অতিবাহিত হয়, তাঁহারা প্রেমের শক্তির প্রতি কেমন করিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন তাহাই আমার কাছে আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের জীবনই তো প্রেমময়। প্রেমই জীবনের মূলতত্ত্ব, যেমন সত্য জীবনের মূলতত্ত্ব। আসল কথা এই যে, কেহই দুর্জন নহেন। যাঁহাকে আমরা দুর্জন বলি তিনি দুর্জনতার প্রবাহে অগতিকভাবে বাহিত হইতে থাকেন এবং এইজন্যই তাঁহার মধ্যেও পরিবর্তন সৃষ্টি করা যাইতে পারে। সদ্‌গুণ আত্মায় বিদ্যমান—এইজন্য উহা পরিবর্তনশীল। সত্য এবং আলো ভাবরূপ। অসত্য এবং অন্ধকার অভাবরূপ। আলোর সম্মুখে অন্ধকার টিঁকিতে পারে না।"

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, ভূদানযজ্ঞে এ যাবৎ ৪০ লক্ষ একরের অধিক ভূমি পাওয়া গিয়াছে। সমস্যার তুলনায় কম হইলেও ভূমিবানেরা এত অল্পসময়ে নিঃস্বার্থভাবে এত অধিক পরিমাণ ভূমি প্রেমভরে ভূদানযজ্ঞে অর্পণ করিয়াছেন। ইহা এক অভাবনীয় ব্যাপার। জগতে বা এই দেশে ভূমি-দান নূতন নহে, চিরদিনই মানুষ ভূমিদান করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু লোকে এতদিন যে ভূমিদান করিয়াছেন তাহা এই মনোভাব হইতে করিয়া-ছেন যে, ভূমি তাঁহাদেরই অর্থাৎ ভূমির মালিক তাঁহারাই। এবং সেইভূমি দান করা হইয়াছে—মন্দিরকে, মসজিদকে বা কোন দাতব্য-প্রতিষ্ঠানকে। 'ভূমি ভগবানের। ভূমি সকলের। ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি—এইবোধ বিসর্জন দিয়া দরিদ্র ভূমিহীনের জন্য ভূমিদান করা কর্তব্য। দরিদ্র ভূমিহীনকে তাহার অধিকার প্রত্যর্পণ করা কর্তব্য।'—এই আবেদনে সাড়া দিয়া দরিদ্র ভূমিহীনের জন্য ভূমিদান জগতে এই প্রথম। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ বিপ্লবাত্মক দানে এত ভূমি সংগৃহীত হওয়াতে অহিংস-পন্থার সফলতার ইঙ্গিত সুপরিস্ফুট হইয়াছে। অহিংসার ক্রিয়া, প্রেমের ক্রিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে হইয়া থাকে এবং অপূর্ব সফলতায় উহা যখন প্রকাশ পায় তখন জগৎ চমৎকৃত হইয়া যায়। উড়িষ্যায়, সমগ্র গ্রামদানের যে-অপূর্ব দৃশ্য দেখা দিয়াছে এবং তাহার দ্বারা ভূমি-ক্রান্তির দ্বার যেভাবে উন্মুক্ত হইয়াছে তাহা অহিংস-প্রক্রিয়ার এই মহত্তম সম্ভাবনার সূচক। ভূদানযজ্ঞে

আজও যাহা চলিতেছে তাহা অভাবনীয় হইলেও তাহাতে মানুষের গণিতই ক্রিয়া করিতেছে। এখনও ভগবানের গণিতের ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয় নাই। উহা অদৃশ্যে ক্রিয়া করিতেছে। উহার ক্রিয়া যখন প্রকাশ পাইবে তখন ভূদানযজ্ঞের অপূর্ব সফলতায় জগৎ চমৎকৃত হইবে।

হিংস্রপথের বিচার

ভূমি-সমস্যার সমাধান তথা অর্থনৈতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠার জন্য হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন এরূপ যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের মনের কোণে এই চিন্তাধারা আছে যে, মানুষ আজ যেমন আছে চিরদিন তেমনই থাকিবে। কিন্তু ইতিপূর্বে যেসব আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, এ কথার কোন ভিত্তি নাই। মানুষ বিচারশীল। মানুষকে সৎ-বিচার বুঝাইলে সে বুঝিবে এবং আজ না হউক কাল সে তদনুসারে আচরণ করিবে। মানুষ পশু নহে। অতএব হিংসার আশ্রয় লওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যদি হিংসার পথ গ্রহণ করা হয়, তবে তাহাতে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হওয়া সম্ভব কি? যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে, হিংসার পথে ধনীদের নিকট হইতে জমি ছিনাইয়া লইয়া উহা গরীব-দিগকে দেওয়া যাইতে পারে তথাপি উহাতে জমি অর্থাৎ লক্ষ্মী মাত্র মিলিল বটে, কিন্তু প্রেম পাওয়া গেল না অর্থাৎ হৃদয়-পরিবর্তন হইল না। বিচার-বিপ্লব আসিল না। হৃদয়-পরিবর্তন ও বিচার-বিপ্লব ব্যতিরেকে যেখানে ভূমি ধনীর হস্তচ্যুত হইল সেখানে প্রতি-বিপ্লবের বা হিংস্র-প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে। উপরন্তু হিংসার দ্বারা কোন বিষয়ের সমাধান করিলে এক সমস্যার স্থলে আরও বহু সমস্যার উদ্ভব হইয়া থাকে। তাহাতে সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় না, বরং সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠে। হিংসার নিষ্ফলতার কথা বুঝাইতে গিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন—পরশুরাম ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে যাইলেন। কিন্তু সেই প্রচেষ্টার মধ্যে তিনি নিজেই ক্ষত্রিয় হইয়া গেলেন। উহার দ্বারা হিংসার নিষ্ফলতার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আর এক দৃষ্টিতে পরশুরামের উপাখ্যানে হিংসার বিফলতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরশুরাম একুশবার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। একবার

নিঃক্ষত্রিয় করা হইলে আবার নিঃক্ষত্রিয় করিবার অবকাশ থাকে কি? তাহার অর্থ—আদৌ নিঃক্ষত্রিয় করা সম্ভব হয় নাই বা হইতে পারে না। ইহাতে হিংসার নিষ্ফলতা সূচিত হইতেছে। হিংসার পথে সমস্যার সমাধান সফল হউক বা না হউক, বর্তমান অবস্থায় এই দেশে হিংসার পথে ভূমি ভূস্বামীদের কাছ হইতে ছিনাইয়া লইয়া ভূমিহীনদিগকে স্থায়ীভাবে প্রাপ্ত করানো সম্ভব কি? তেলেংগানায় জমিদার-জোতদারদের নিকট হইতে বলপূর্বক জমি কাড়িয়া লইয়া দরিদ্র চাষীদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেইজমি আবার তাহাদের অধিকতর ক্ষতি করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া ভূস্বামীগণকে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। যতদিন সুপ্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব আছে ততদিন হিংসার পথে জমি ছিনাইয়া লইয়া তাহা স্থায়ীভাবে রাখা সম্ভব হইবে না। তাই বিনোবাজী কমিউনিষ্টগণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—তাঁহারা যদি তাঁহাদের পথে দরিদ্রকে ভূমি দেওয়াইতে চান তবে ছোট-ছোট হত্যা, অগ্নি-সংযোগ ইত্যাদি করা পরিত্যাগ করিয়া টোট্যাল ওযার* (Total war)-এর জন্য চেষ্টিত হউন। টোট্যাল ওযারে দেশ যদি কমিউনিষ্টদের পদানত হয় তবেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। নচেৎ স্থানে-স্থানে হত্যা, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির দ্বারা সাময়িকভাব কিছু কার্যসিদ্ধি হইলেও তাহা অনতিবিলম্বে অধিকতর ধ্বংসসাধন করাইয়া তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইবে সন্দেহ নাই। সময়, অবস্থা, দেশের ঐতিহ্য ও দৃঢ়মূল সংস্কৃতি দেশের বিপ্লব বা ক্রান্তির প্রকৃতি নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। রুশিয়ার তদানীন্তন অবস্থায় এবং সেইকালে যেভাবে ও যে-প্রকৃতিতে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল তাহা যে ভরতেও হইতেই হইবে—এমন কথা নাই। বরং কাল, অবস্থা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিপরীত দিকে অংগুলি নির্দেশ করে। ভারতের ক্রান্তি ভারতের নিজস্ব পথে সংঘটিত হইবে। বিনোবাজী এই সম্পর্কে বলেন—"বিপ্লব (ক্রান্তি) শব্দের অর্থ সাম্যবাদীদের অপেক্ষা আমি বেশী বুঝি। ক্রান্তির প্রকৃতি দেশ ও কাল অনুসারে পরিবর্তিত হয়। মার্কস্ যেরূপ লিখিয়াছেন সেরূপ ক্রান্তি প্রত্যেক দেশে এবং সব সময়ে হওয়া সম্ভব নহে। ভারতের ক্রান্তি ভারতের নিজস্ব পন্থায় হইবে। ভারতীয় সংস্কৃতি অধ্যয়ন করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, অন্যান্য দেশ ভারতের নিকট

হইতে বহু বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। আমি যে-ক্রান্তির জন্য প্রচেষ্টা করিতেছি তাহা ভারতীয় সংস্কৃতির অনুকূল। ইহা কোন ছাঁচে-ঢালা উগ্রপন্থী ক্রান্তি নহে। এই চিন্তাধারা ভালভাবে উপলব্ধি করিয়া আমাদের কর্মীরা ভূদানযজ্ঞের কাজে আত্মনিয়োগ করুন—ইহা আমি চাহিতেছি।" সমাজের একজনের জন্য আরেকজনকে ধ্বংস করিতে হইবে ইহা কিছুতেই উচিত নহে ও ভারতীয় সংস্কৃতি ইহাই বলিয়া থাকে। এই সংস্কৃতির ভিত্তিতে আধারিত হইয়া ভারতের ক্রান্তি আসিবে।

সাধারণত এরূপ মনে করা হয় যে, মার্কসের ডায়ালেক্টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্ স্বীকার করিলে সাম্যবাদের সিদ্ধান্ত ও বিপ্লব সৃষ্টিতে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু বিনোবাজী সেরূপ মনে করেন না। এ সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অনেকের চোখ খুলিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছেন—"ডিয়ালেক্টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্‌কে (Dialectical Materialism) আমি 'বৈতর্কিক বস্তুবাদ' নাম দিতেছি। 'ভৌতিকবাদ' নাম উপযোগী নহে। ভৌতিকবাদী তাহাকে বলে যাহার কাছে পানাহার ও আমোদ-প্রমোদই জীবনের সার বলিয়া বিবেচিত হয়। বিতর্কবাদ (Dialectics) হইতেছে—কেবলমাত্র এক বিচারপদ্ধতি। উহা হইতে ক্রান্তির সিদ্ধান্তের উদ্ভব হইতে পারে—উপক্রান্তির সিদ্ধান্তও হইতে পারে। টক্ লেবুর গাছে যদি মিষ্টি ফলের কলম তৈয়ারী করা হয় তবে তাহাতে অম্ল-মিঠা ফল উৎপন্ন হইবে। থিসিস্, এণ্টিথিসিস্ ও সিনথিসিস্ (Thesis, Antithesis, Synthesis)-উহা ঐরূপ ক্রিয়া। এই থিওরী হইতে ক্রান্তির পক্ষে কি করিয়া উৎসাহ পাওয়া যায় এবং ধনীদিগকে কেন হত্যা করিতে হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

"প্রত্যেক জিনিসে গুণ ও দোষ উভয়ই বিদ্যমান আছে। দোষময় বস্তুর উপর গুণময় বস্তুর আক্রমণ হইলে এক তৃতীয় জিনিস উৎপন্ন হয় যাহাতে ঐ দুই-এর দোষ থাকে না। পরন্তু ঐ দুই-এরই গুণ উহাতে থাকে। আজ সমাজে এক বিচার রহিয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির তাহার যোগ্যতা অনুসারে মাহিনা পাওয়া চাই। ইহাতে এক গুণ আছে এই যে, উহাতে কাজ

করিবার উৎসাহ জন্মে। কিন্তু উহাতে এক অন্যায় এই রহিয়াছে যে, উহাতে দুর্বলের সর্বনাশ হয়। এইজন্য এই বিচারের বিরুদ্ধে সমতার বিচার খাড়া করা হয়। কিন্তু উহাতেও এক দোষ আছে যে, উহাতে অলস লোকেরা উৎসাহ পায়। সমগ্র ধন একজনের হাতে জমা করিবার যে-ক্রিয়া চলিতেছে উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আত্যন্তিক সমতার কথা উঠিয়াছে। পরন্তু উহাতেও দোষ আছে। এইজন্য উহার ফল এই হইবে যে, এক তৃতীয় বিচারের উদ্ভব হইবে —যাহাতে ঐ দুই-এর গ্রাহ্য অংশ বিদ্যমান থাকিবে বটে, কিন্তু উহাদের ত্যাজ্য অংশ থাকিবে না। অতঃপর এই নূতন জিনিসে যদি দোষ থাকিয়া যায় তবে উহার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আর একটি জিনিস খাড়া হইয়া যাইবে। তখন আবার ঐ প্রক্রিয়া শুরু হইয়া যাইবে। এইরূপে বিতর্কবাদ এক বিচার-প্রণালী মাত্র হইতেছে। উহা হইতে কোন বিশিষ্ট আচার প্রণালীর উদ্ভব হইবে এমন কথা নাই—যদিও মার্ক্স্ সেই কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, সাম্যবাদের সিদ্ধান্ত বিতর্কবাদের বিচার-প্রণালী হইতেই উদ্ভুত এবং মাত্র সাম্যবাদই ঐ বিচার-প্রণালী হইতে উদ্ভূত হইতে পারে—অন্য কিছুই নহে। কিন্তু এক বিচার-প্রণালী হইতে একটি বিশিষ্ট সিদ্ধান্তের উদ্ভব অনিবার্য —একথা আমি মানি না।"

অপহরণ (Expropriation)-এর দ্বারা রুশিয়া প্রভৃতি দেশে ক্রান্তি আসিয়াছে। কিন্তু ভারতের ক্রান্তি অপরিগ্রহ(Non-possession) -এর দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিবে। এই সম্পর্কে বলিতে গিয়া বিনোবাজী যে গভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই ঃ—"আমি যে-বিচারধারা চালাইতে চাহিতেছি উহার বিরোধী যে-বিচার আজ সমাজে প্রচলিত আছে তাহাকে 'অপহরণ' বলে। যাঁহারা 'অপহরণ'-বিচারে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের অভিমত এই যে, ব্যক্তির অস্তিত্ব সমাজের জন্য এবং সমাজের স্বার্থের জন্য ব্যক্তির সম্পত্তি 'অপহরণ' করা দোষ নহে—বরং ব্যক্তির সম্পত্তি 'অপহরণ'-কার্যে যাঁহারা বাধা দিতে চান তাঁহাদের চিন্তাধারা ভ্রান্ত। আজ ঐ বিচারের দিকে পৃথিবীর কয়েকটি দেশ আকৃষ্ট হইয়া আছে। উহার বিরুদ্ধে আমি 'অপরিগ্রহ'-বিচার খাড়া করিয়াছি। সাধারণত ইহা মনে করা হয় যে, 'অপরিগ্রহ' গান্ধী, বিনোবা প্রভৃতির ন্যায় সন্ন্যাসীদের জন্য এবং জনসাধারণের

জন্য 'অপরিগ্রহ' নহে—লোভ। সন্ন্যাসকে শ্রেষ্ঠ আদর্শস্বরূপ গণ্য করা হয়। কিন্তু গার্হস্থ্য-জীবনেও 'অপরিগ্রহ'-আচরণ করা যায়। ধর্মবিচারকে ঐভাবে খণ্ডিত করিলে তাহার ফলও মাত্র সংকুচিত আকারেই পাওয়া যায়। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, নির্লোভী লোভীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে সে নিজেই লোভী হইয়া পড়ে। পরশুরাম ক্ষত্রিয়ত্ব দূর করিতে গিয়া নিজেই ক্ষত্রিয় হইয়া গিয়াছিলেন—এই দৃষ্টান্ত তো আমাদের কাছেই আছে। যাহার বিরোধিতা করিতে হইবে, তাহার শাস্ত্র যদি আমরা মান্য করি তবে তাহার স্থূলরূপ নষ্ট করিতে আমরা সক্ষম হইতে পারি, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে আমরা উহাকে অমুক্ত করিয়া রাখিয়া দেই। আজ দুনিয়ায় লোভের ও পরিগ্রহের রাজ্য চলিতেছে। পরিগ্রহের আশেপাশে এরূপ আইন খাড়া করা হইয়াছে যাহাতে পরিগ্রহকে অন্যায় বলিয়া মনে করা না হয়। চুরিকে আমরা অপরাধ গণ্য করি। কিন্তু যেব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া চুরির প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে তাহার বৃত্তিকে আমরা চুরি বলিয়া মনে করি না। উপনিষদের এক উপাখ্যানে রাজা বলিতেছেন যে, 'আমার রাজ্যে কেহ চোর নাই—কৃপণও নাই।' কারণ কৃপণই চোর সৃষ্টি করে। চোরকে আমরা জেলে পাঠাই আর চোরের জন্মদাতাকে আমরা মুক্ত রাখি এবং সে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া গদীতে উপবিষ্ট থাকে। ইহা কেমন বিচার? গীতাও ইহাকে চোর বলিয়াছেন। কিন্তু আজ তো আমরা সন্ন্যাসীদের গ্রন্থ মনে করিয়া গীতাকে ত্যাগ করিয়া বসিয়াছি।"

ভূমির প্রশ্ন এতদিন না উঠিবার কারণ

জমির মালিক বলিতে পারে যে, অন্যেরা তাহাদের সঞ্চিত অর্থ—ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, ধন-বাড়ী, ব্যাংক প্রভৃতিতে নিয়োগ করিয়া লাভবান হইতেছে। আমি সেরূপ আমার সঞ্চিত অর্থ ভূমিতে খাটাইতেছি। ইহাতে আমি কি দোষ করিলাম? সকল ভূমির মালিক যে, অন্যায়ভাবে ভূমি অর্জন করিয়াছেন তাহা নহে। সে প্রশ্নও এখানে আসে না। ন্যায়ভাবে হউক বা অন্যায়-ভাবে হউক, যেভূমি তাহার হাতে আসিয়াছে সেভূমি তাহার নহে—সেভূমি ভগবানের। সেভূমিতে সকলের সমান অধিকার। যুগ-যুগ চলিয়া গেল, এতদিন সে প্রশ্ন উঠে নাই কেন? তাহা হইলে তো এমনভাবে তাহারা ভূমি-

সংগ্রহ করিত না। যতদিন লোকসংখ্যা কম ছিল এবং ভূমি বেশী ছিল তত-দিন এ প্রশ্ন উঠাইবার আবশ্যকতা না থাকায় ঐপ্রশ্ন উঠে নাই। আজ লোক বেশী, জমি কম। দারিদ্র্যের চাপে সারা সমাজদেহ নিষ্পেষিত। তাই এই প্রশ্ন উঠিতেছে। তাই অবস্থার চাপে এই বুনিয়াদী সত্যবোধ সমাজে জাগ্রত হইয়াছে। আমেরিকায় এই প্রশ্ন উঠে নাই। অষ্ট্রেলিয়ায়ও এই প্রশ্ন উঠে নাই। কারণ উঠিবার প্রয়োজন নাই। ইংলণ্ডে এখনও উঠে নাই, কিন্তু তাহা অন্য কারণে। সেখানে ভূমির অভাবজনিত দারিদ্র্য অন্য উপায়ে দূর করার সুযোগ আসিয়াছিল। ভারতে আজ এই সত্যকে স্বীকার ও কার্যে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাই এই প্রশ্ন আজ সব চাইতে জরুরী।

'দান'-শব্দে আপত্তি

দরিদ্রের প্রতি দয়া করা, দরিদ্রের উপকার করা পুণ্যকর্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। সাধারণ লোকে পুণ্যকর্ম বলিতে কি বুঝে? যাহা মানুষের ব্যক্তিগত বা সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না, অথচ যাহা মানুষ দয়াপরবশ হইয়া অন্যের উপকারের জন্য করে—সেরূপ কিছু করিলে পুণ্য অর্জিত হইল বলিয়া বলা হয়। ইহার মধ্যে এই মনোভাব নিহিত আছে যে, দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের জন্য ধনী কিছুমাত্র দায়ী নহে এবং দারিদ্র্য-মোচনের জন্য তাহার কিছুমাত্র কর্তব্য নাই। অর্থাৎ ধনীর নিকট হইতে কিছু পাইবার অধিকার বা দাবী দরিদ্রের নাই। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ধনিকত্ব ও দারিদ্র্য উভয়ের যুগপৎ উৎপত্তি শোষণেই। একজনের দ্বারা অন্যে তাহার স্বাভাবিক জীবিকার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে তবেই একজন হইতে থাকে ধনী ও অন্যজন দরিদ্র। তাই দরিদ্রের অধিকারের দাবীতে ধনীর নিকট হইতে ভূমি চাহিতে হইবে। ধনীকে দান দিতে বলা এবং দরিদ্রের তাহা গ্রহণ করা ধনীর কৃপাগ্রহণ করা ছাড়া আর কিছু নহে। ইহাতে দরিদ্রের অসম্মানই করা হয়। ইহা হইতেছে ভিক্ষার ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা বর্তমান সমাজের রীতি। তাই মহাভারতের 'দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়' অথবা খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের 'চ্যারিটী' (charity) অথবা মুসলমানদিগের 'জাকাত' আজ বঞ্চিতের সম্মুখে কোন আশার বাতি জ্বালাইয়া দেয় না। কারণ

এই ভিক্ষালব্ধ অন্ন আসে উপর হইতে। সমাজের নিম্নের স্তরে যাহারা দুর্দৈবগ্রস্ত আছে তাহাদের হাতপাতা আর কোনদিন ঘুচে না। ইহার পিছনে নিষ্পেষণ-যন্ত্র নিঃশব্দে কাজ করিয়া যায়। তাই 'ভূদানযজ্ঞে' দান শব্দের প্রয়োগে আপত্তি উঠিতে পারে। 'ভূদানযজ্ঞ' তো ভূমিহীন দরিদ্রের অধিকারের দাবীতে ভূমি দেওয়ার জন্য আহ্বান। তবে এখানে 'দান' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে কেন? যজ্ঞ, দান ও তপঃ—এই তিন শব্দ ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মহান্ স্থান অধিকার করিয়া আছে। উহা প্রয়োগ করিয়া ভারতীয় মানুষকে মহৎ কার্য সম্পাদনে যেরূপ প্রেরণা দান করা যায় তাহা অন্য শব্দ প্রয়োগের দ্বারা সম্ভব হয় না। তাই সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে উহাদের অর্থের বিস্তার সাধন করা হইয়াছে। গীতায় 'যজ্ঞ'-শব্দ 'পরোপকার' বা 'নিস্বার্থ সেবা' অর্থে ব্যবহার করিয়া উহার অর্থের বিকাশ সাধন করা হইয়াছে। ইহাকে শব্দ-ক্রান্তি বলা যায়। মহাত্মা গান্ধীও বর্ণ-ব্যবস্থা, ট্রাস্টীশিপ্ ইত্যাদি শব্দকে অভিনব অর্থে প্রয়োগ করিয়া ঐসকল শব্দের ভাবার্থে ক্রান্তি আনয়ন করিয়াছেন। তাই শাস্ত্রজ্ঞ বিনোবাজী 'দান'-শব্দ পরিত্যাগ না করিয়া উহা এক ক্রান্তি-কারক অর্থে 'ভূদানযজ্ঞে' সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—"দানং সংবিভাগঃ"। দান-এর অর্থ সম্যক বণ্টন বা সঙ্গত বণ্টন। এই অর্থেই 'ভূদানযজ্ঞে' দান শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। দানের অর্থ এই যে, নিজের কাছে যাহা আছে তাহার সংবিভাজন। এইপ্রকার দানের যিনি দাতা তাঁহার হৃদয়-পরিবর্তন হইয়া থাকে। দানের প্রচলিত অর্থ যাহা স্মৃতিতে লিপিবদ্ধ আছে তাহা এই—"স্বস্বত্বধ্বংসপূর্বক পরসত্ত্বোৎপত্ত্যানুকূলত্যাগঃ দানম্" অর্থাৎ নিজের স্বত্ত্ব নষ্ট করিয়া অন্যের সত্ত্ব সৃষ্টি করার জন্য দেওয়াকে দান বলে। দানের এই প্রচলিত অর্থে উহা ব্যবহার করা হয় নাই। বিনোবাজী বলেন যে—দানের প্রচলিত যে-অর্থ উহা দানের প্রকৃত অর্থের বিকৃত অর্থমাত্র। দানের প্রকৃত অর্থ সংবিভাগ। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"আমি ভিক্ষা-স্বরূপ দান চাহিতেছি না। দান শব্দের অর্থ লোকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে—যেমন ধর্ম, বিজ্ঞান, ত্যাগ, নীতি ইত্যাদি শব্দের অর্থ বিকৃত করা হইয়াছে।" এই অর্থের মধ্যে দরিদ্রের অধিকারের দাবীতে ধনীর নিকট হইতে ভূমি

চাওয়ারই ভাব রহিয়াছে। ভূমি ভগবানের দান ও ভূমি উৎপাদনের মৌলিক সাধন এই কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য এক দৃষ্টিতেও ভূদানযজ্ঞে 'দান' শব্দের উক্ত অর্থ অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে। মনুষ্য সামাজিক জীব। কোন মানুষ যাহা পাইয়াছে বা যাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার ঐ পাওয়া ও করার ব্যাপারে সারা সমাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা রহিয়াছে। এজন্য মানুষ সমাজের নিকট ঋণী এবং সমাজ প্রত্যেক মানুষের নিকট হইতে ঐ সবেরই অংশ পাইবার অধিকারী। সুতরাং এই দৃষ্টিতে 'দান' শব্দের এই অর্থ সহজে উপলব্ধি করা যায়। অতএব 'ভূদানযজ্ঞের' দ্বারা ধনীদের নিকট বিনোবার ভিক্ষার সংবাদমাত্র পেঁাছাইয়া দেওয়া হইতেছে এইরূপ যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের ধারণা ভ্রান্ত।

ভূদানযজ্ঞের 'দান' শব্দ উহার প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া ভিন্ন আর এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ইহা বিনোবাজী বুঝাইয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—"ভূদানযজ্ঞের 'দান'-শব্দে কোন-কোন লোকের খট্‌কা লাগিয়াছে। কতিপয় বন্ধু এক নূতন বিবাহবিধি রচনা করিয়াছেন। যখন তাঁহারা ঐ বিধি রচনা করিতে বসিলেন তখন কন্যাদান শব্দে তাঁহাদের খট্‌কা আসিল। গরু-মহিষের দানের মত কন্যার দান কিরূপে করা যায়? মূল বিবাহবিধিতে 'কন্যাদান' শব্দই নাই। সেখানে 'সম্প্রদান' অর্থবোধক শব্দ আছে। উহার অর্থ কেবলমাত্র 'দেওয়া হইল' এইমাত্র। ইহার দান করা হইল, উহাকে দান প্রদান করা হইল—এইরূপ অর্থ নহে। যে-জিনিসে আমার মালিকানা আছে তাহাতে আজ হইতে তোমার মালিকানা হইল—এইরূপ ভাব উহাতে নাই। 'দেওয়া হইল' কেবলমাত্র ইহা বলিলে কোন গৌণত্ব বুঝায় না। এইজন্য ঐ নূতন বিবাহবিধিতে 'কন্যা-সম্প্রদান' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। যেখানে 'সম্প্রদান' আছে যেখানে 'অপাদান' আসিয়াই যায়।

"ভূদানযজ্ঞে এইপ্রকারের কল্পনা রহিয়াছে। জমির মালিক উহার স্বামী নহেন।' তিনি কন্যার বাপেরই মত প্রতিপালকমাত্র। সৎ পাত্র দেখিয়া তাহাকে ঐ জমি সম্প্রদান করিতে হইবে। এরূপ সৎ পাত্রের খোঁজও করিতে হইবে। এই ব্যাপারে মালিকানার কল্পনা কোথাও নাই।"

'ভূদানযজ্ঞে' 'যজ্ঞ'-শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য

গ্রন্থের প্রারম্ভে 'যজ্ঞ'-শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ দেওয়া হইয়াছে। উহা হইতেছে 'যজতি পূজয়তি' 'ইত্যর্থঃ' অর্থাৎ পূজা। কিন্তু গীতা যজ্ঞের অর্থ বিকাশ করিয়াছেন। বিনোবাজী তাঁহার 'গীতা-প্রবচনে' যজ্ঞের গীতোক্ত অর্থ অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা সংক্ষেপে এই-রূপ ঃ—আমরা তিনটি সংস্থা সঙ্গে লইয়া জন্মগ্রহণ করি। (১) এই বিশাল ব্রহ্মান্ড বা এই অপার সৃষ্টি যাহার এক অংশ আমরা। (২) যে-সমাজে আমাদের জন্ম হইয়াছে সেইসমাজ। উহা পিতা-মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, প্রতিবেশী ইত্যাদি লইয়া গঠিত। (৩) দেহ, মন ও বুদ্ধির সঙ্গঠন। প্রতি-দিনের জীবনযাত্রায় আমরা আমাদের আশেপাশের সৃষ্টিকে ব্যবহার করি। তাহার ফলে সৃষ্টিতে যে-ক্ষয় হয় তাহা পূরণ করা যজ্ঞের প্রথম অর্থ বা উদ্দেশ্য। যেমন হাজার-হাজার বৎসর যাবৎ চাষাবাদ করিয়া ভূমির উর্বরতার যে-ক্ষয়সাধন করা হইয়াছে তাহা পূরণ করা। যজ্ঞের দ্বিতীয় অর্থ—সৃষ্টিকে ব্যবহার করার ফলে তাহাতে যে-অশুচি জমিয়া উঠে তাহার শুদ্ধিকরণ। যথা—কূয়া ব্যবহার করার ফলে আশেপাশে নোংরা হইয়া থাকিলে তাহা পরিষ্কার করা। তৃতীয় অর্থ—কোন প্রত্যক্ষ নির্মাণ কার্য করা। যথা—তুলা উৎপাদন করত সূতা কাটিয়া ও বস্ত্র-বয়ন করিয়া বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করা বা নূতন বস্ত্র তৈয়ারী করা। সমাজে পিতা-মাতা, প্রতিবেশী, গুরু, মিত্র প্রভৃতি সকলের সেবাদ্বারা আমরা পুষ্ট হইয়াছি। তাঁহাদিগকে সেবা করিয়া তথা সমাজের সেইঋণ পরিশোধ করিবার প্রক্রিয়াকে 'দান' বলা হয়। মন, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়যুক্ত শরীরের যে-ক্ষয়ক্ষতি প্রতিনিয়ত চলিতেছে তজ্জনিত যে বিকার বা দোষ উৎপন্ন হয় তাহার শুদ্ধি করাকে 'তপঃ' বলা হয়। কিন্তু দান, যজ্ঞ, তপঃ-কে এইরূপ পৃথক-পৃথক করিয়া দেখার প্রয়োজন নাই। কারণ আসলে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তিনে মিলিয়া এক দিব্য-সংস্থা রচিত হইয়াছে। সৃষ্টির মধ্যে সমাজ ও শরীর সমাবিষ্ট রহিয়াছে। তাই যজ্ঞের ব্যাপকতর অর্থ হইতেছে এই যে, সমাজ সম্পর্কে যে-দানক্রিয়া করা হয় তাহাও যজ্ঞ এবং শরীর সম্পর্কে যে-তপঃক্রিয়া করা হয় তাহাও যজ্ঞ।

বিনোবাজী ভূমিদানের ভিত্তিতে যে-ক্রান্তিকারী আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়াছেন তাহার দ্বারা যজ্ঞের এই তিন উদ্দেশ্য সাধিত হয় বলিয়া এই আন্দোলনের নামকরণ করা হইয়াছে ভূদানযজ্ঞ। ইহাতে ক্ষয়পূরণ, শুদ্ধিকরণ ও সংগঠন এই তিন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

(১) ক্ষয়পূরণ—বিকট ভূমি-ব্যবস্থা এবং কুটিরশিল্পসমূহ ধ্বংস হওয়ায় দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অশিক্ষা প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়া সমাজের যে-ক্ষয় হইয়াছে ভূদানযজ্ঞে ভূমির সমবণ্টন ও গ্রামীকরণ, কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠা ও বুনিয়াদী শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থাপনার দ্বারা উক্ত ক্ষয় পূরণ করা হইতেছে। ভূমি কতিপয়ের হাতে থাকার দরুণ ভূমিব সদ্‌ব্যবহার না হওয়ায় এবং ভূমি পতিত ও অব্যবহৃতরূপে পড়িয়া থাকায় সৃষ্টির যে-ক্ষতি হইয়াছে. তাহাও ভূদানযজ্ঞের দ্বারা পূরণ করা হইতেছে।

(২) শুদ্ধিকরণ—ভূদানযজ্ঞ দাতাগণের হৃদয়ে ত্যাগ ও প্রেমের ভাব সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি সাধন করিতেছে। দরিদ্রগণ পরনির্ভরশীলতা ত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বন বৃত্তিতে সমৃদ্ধ হইতেছে। ব্যক্তিগত মালিকানাবোধের বিলোপনের দ্বারা সমগ্র জনমানস পরিশুদ্ধ হইতেছে।

(৩) গঠনকার্য—ভূদানযজ্ঞের চরম পরিণতিতে সাম্যযোগী-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। উহাই মহত্তম সংগঠন।

এরূপে ভূদানযজ্ঞের মাধ্যমে মহান 'যজ্ঞ' অনুষ্ঠিত হইতেছে।

তপঃ

তপঃ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন, "প্রাচীন ঋষিগণ এবং গীতা তিনটি জিনিসের ব্যবস্থা করিয়াছেন—যজ্ঞ, দান ও তপঃ। ভূদানযজ্ঞের দ্বারা আমি যজ্ঞ ও দানের আহ্বান করিয়াছি। কিন্তু যদি আমরা তপশ্চর্যা না করি, তবে দান ও যজ্ঞ সিদ্ধ হইবে না। এই ত্রয়ী এক সম্পূর্ণ বস্তু। উহা অবিভাজ্য। কর্মিগণ 'তপঃ' করিবেন। দান ও যজ্ঞ জনগণ করিবেন। তাই আমাদিগকে তপঃ-এর পরাকাষ্ঠা সাধন করিতে হইবে।"

প্রজাসূয়-যজ্ঞ

সমাজে পরম্পরাগত এমন কতকগুলি পুরাতন মহান শব্দ প্রচলিত আছে যাহার প্রতি সমাজের লোকের শ্রদ্ধা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। সেই-

সকল শব্দকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাতে সমাজের বর্তমান প্রয়োজন অনুসারে নূতন অর্থ সংযোগ করা এবং বিকশিতরূপ দান করিয়া উহাতে নব জীবন সঞ্চার করা অহিংস-প্রয়োগের এক উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া। উহা এরূপ মৃদুভাবে সাধন করা হয় যাহাতে লোকে ধরিতেই পারে না যে, পুরাতন শব্দের মধ্যে নূতন অর্থ প্রবেশ করানো হইতেছে। ভারতীয় পরম্পরায় যে-সমন্বয় সাধিত হইয়াছে তাহাও এই অহিংস-প্রক্রিয়ায়ই সাধন করা হইয়াছে। গীতায় 'যজ্ঞে'র অর্থও এইভবে বিকাশ করা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বর্ণ-ব্যবস্থার পুরাতন কল্পনায় সমাজের বর্তমান প্রয়োজন অনুসারে উহাতে নূতন অর্থ সংযোজিত করিয়াছেন। 'ট্রাষ্টী'-শব্দের ব্যবহারও তিনি ঐভাবে করিয়াছেন। বিনোবাজীও ঐ প্রক্রিয়ার প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত। 'ভূদানযজ্ঞ'-শব্দ উহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। উহাতে দান, যজ্ঞ, তপঃ প্রভৃতির পরম্পরাকে বর্তমান সমস্যার সহিত সংযোগ করা হইয়াছে। ঐ প্রক্রিয়ায় তিনি 'রাজসূয়-যজ্ঞের' কল্পনাকে জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রগতিমূলক আদর্শের সহিত সংযোজিত কয়িরা 'ভূদানযজ্ঞ'-কে 'প্রজাসূয়যজ্ঞ' আখ্যা দিয়াছেন। রাজসূয়যজ্ঞের অর্থ রাজার অভিষেক। তাই প্রজাসূয়যজ্ঞের অর্থ প্রজার 'অভিষেক' অর্থাৎ আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের সার্বভৌমত্ব।

ভূ-কুরবাণী

'ভূদানযজ্ঞ'-কে ইসলাম ধর্মের ভাষায় 'ভূ-কুরবাণী' বলা যায়। মুসলমান জনসাধারণের নিকট উহা অধিকতর বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে। লেখক ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন ভূদানযজ্ঞের বাণী প্রচারের জন্য মালদহ জেলায় পাদ-পরিক্রমা করিতেছিলেন তখন তাঁহার সভাগুলিতে অধিক সংখ্যায় কৃষকশ্রেণীর মুসলমান শ্রোতা উপস্থিত হইতেছিলেন। যদিও তাঁহারা আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত ভূদানযজ্ঞের ভাবধারার কথা শুনিতেন তথাপি 'ভূদানযজ্ঞ'-শব্দটি তাঁহাদের কাছে তেমন বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী হইত না—ইহা লক্ষ্য করা হয়। তাই লেখক মুসলমান শ্রোতাদের কাছে 'ভূদানযজ্ঞে'-র বিকল্পে 'ভূ-কুরবাণী' বলিতে থাকেন এবং

তাহাতে ফল বেশ ভাল হয়। লেখক এ সম্পর্কে বিনোবাজীকে লেখেন। বিনোবাজী তাহার উত্তরে লেখেন—"মুসলমানোঁকো সমঝানে কে লিয়ে যজ্ঞ কে বদলে 'কুরবাণী'-শব্দ কা ইস্তমাল কিয়া হ্যায় ওহ্ উচিত হী হ্যায়। ভূদান সে বঢ়কর কুরবাণী অওর ক্যা হো সকতী হ্যায়?"

অর্থাৎ "মুসলমানদিগের বুঝিবার সুবিধার জন্য আপনি 'যজ্ঞের' পরিবর্তে 'কুরবাণী'-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ঐরূপ করা উচিতই। ভূমিদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কুরবাণী' আর কি হইতে পারে?"

না বুঝিয়া দান দেওয়া নিষেধ

এই আন্দোলনের সব চাইতে বড় কথা দাতার অন্তরে ভাব-ক্রান্তি আনয়নের প্রয়োজনীয়তা। তাই বিনোবাজী প্রথম হইতেই সকলকে সতর্ক করিয়া আসিতেছেন যে, কেহ যেন ভূদানযজ্ঞের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া দান না দেন। কারণ না বুঝিয়া দান দেওয়া হইলে ভূমি পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু সমাজে ক্রান্তির অর্থাৎ ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। তাই তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া তাঁহার আবেদনে (ভারতবাসীর প্রতি) লিখিয়াছেন—"আমাদের তিনটি সূত্র আছে :—

(১) আমাদের কথা উপলব্ধি করিয়াও যদি কেহ ভূমি না দেন তবে আমাদের তাহাতে দুঃখ নাই। কারণ আমরা মনে করি, আজ যিনি দিতেছেন না কাল তিনি দিবেন। 'বিচার-বীজ' অঙ্কুরিত না হইয়া যায় না।

(২) আমাদের কথা বুঝিয়া যদি কেহ ভূমি দেন তাহাতে আমাদের আনন্দ হয়—কারণ তাহার ফলে সম্ভাবনার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(৩) আমাদের কথা না বুঝিয়া কোনরূপ চাপে পড়িয়া যদি কেহ দেন তবে তাহাতে আমাদের দুঃখ হইবে; কারণ যেকোন রকমে জমি সংগ্রহ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। পরন্তু আমাদিগকে সর্বোদয়ের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিতে হইবে।"

ইহা সত্ত্বেও বহুলোক ঠিকমত না বুঝিয়া মাত্র অন্যদের দান দেওয়া দেখিয়া দান দিয়াছেন ও এরূপে ভবিষ্যতেও দিবেন। ঐ সব দানকে প্রকৃত ভূদানযজ্ঞের দান বলা যাইতে পারে কি? ঐ সব দান শ্রদ্ধায় দেওয়া হইয়াছে

বা হইবে, কারণ অন্যকে দেখিয়া দেওয়ার অর্থ শ্রদ্ধায় দেওয়া। শ্রদ্ধায় কোন কাজ করা ধর্মে প্রবেশের এক প্রকৃষ্ট পন্থা। অতএব ঐ দান ভূদান-যজ্ঞে গ্রাহ্য। তবে যাঁহারা দান দিয়াছেন বা দিবেন তাঁহারা সকলে দানের উদ্দেশ্য ঠিকমত উপলব্ধি না করা পর্যন্ত ভূদানযজ্ঞ সফল হইল বলিয়া গণ্য হইবে না।

ধনীদের আন্তরিকতার প্রশ্ন

বলা হয় যে, ধনীরা যে-দান দিয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষ কিছু আন্তরিকতা নাই, উহাতে কপটতা আছে। এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। এই সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"মানুষের হৃদয়ে সৎ ও অসতের দ্বন্দ্ব অহরহ চলিতেছে। উহা অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। তাহাতে সৎ-এর রক্ষা ও অসতের নাশ হইয়া থাকে। ধনীর কৃতকার্যের মধ্যে কিছু-না-কিছু অন্যায় যে থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্যায় পথ অবলম্বন না করিলে কি কখনও হাজারো একর জমি এক হাতে জমা হওয়া সম্ভব? যেসব ধনী দান দেন তাঁহাদের হৃদয়ে ঐ প্রকারের দ্বন্দ্ব শুরু হইবে—'আমরা যাহা করিয়াছি তাহা কি ঠিক হইয়াছে?' পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে সুবুদ্ধি দান করিবেন। তাঁহারা অন্যায় পরিত্যাগ করিবেন। এইভাবে তাঁহাদের হৃদয়-পরিবর্তন সংঘটিত হইবে।"

ধনীদের প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধির প্রশ্ন

কেহ কেহ আক্ষেপ করেন যে, বিনোবাজী নিজেকে ধনীদিগের 'ভাই, পুত্র' ইত্যাদি রূপে অভিহিত করিয়া তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিতেছেন। ইহা ঠিক কাজ হইতেছে না। উত্তরে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"তাহা হইলে কি আমি ধনীদের অপ্রতিষ্ঠা ঘটাইব? আমি তাঁহাদেরই দ্বারা তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করাইয়া লইয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিতেছি—ইহাতেই কি আপনাদের আপত্তি হইতেছে? তাহা হইলে কি তাঁহাদের দ্বারা বদমাশি করাইয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার হানি করিব? এমনি তো তাঁহাদের বদমাশি রহিয়াছে। আরও বদমাশি করার জন্য কি তাঁহারা আমার কোন

অপেক্ষা রাখেন? তাই তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদের নিজেদের কর্তব্য করাইয়া লইতে হইবে। তাঁহাদের প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দান গ্রহণ করা উচিত। দান যিনি দেন আর যিনি গ্রহণ করেন তাঁহারা উভয়ে সমপর্যায় ভুক্ত—এই ভাব মনে রাখিয়া কাজ করিলে কল্প-বৃক্ষের সমান ফল মিলিবে। অন্যথায় এক-মুষ্টি মাটি মিলিবে মাত্র। ধমকানি দিয়া কাজ আদায় করায় কোন আনন্দ নাই। কোনরূপ লেন-দেনের ভাব যেন ইহাতে না থাকে। আমাদের অন্তরে এরূপ শ্রদ্ধা থাকা চাই যে, যদি আমার ত্যাগ করিবার শক্তি থাকে তবে অন্য লোকের ত্যাগ করিবার শক্তি থাকিবে না কেন? যে পরমেশ্বর আমাকে চাহিবার প্রেরণা দিয়াছেন সেই পরমেশ্বর অন্যকে দিবার প্রেরণা দান করিবেন না কেন?"

বামন-অবতার

তেলঙ্গানায় ভ্রমণ কালীন তেলঙ্গানার অন্তর্গত বারঙ্গল নামক স্থানে ভূদানযজ্ঞের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিনোবাজী বলেন যে, ভূদানযজ্ঞে দান চাহিবার জন্য তিনি 'বামন-অবতার'রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"আমি ব্রাহ্মণ ছিলামই, এক্ষণে আমি 'বামন-অবতার'-রূপ গ্রহণ করিয়াছি এবং ভূমিদান চাওয়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছি।" পরে একবার তিনি এই 'বামন-অবতারের' উল্লেখ করিয়া ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কে তাঁহার তিন-পাদের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—"ভূদানের পর 'সম্পত্তি দান' বামনের দ্বিতীয় পাদ। উহার পরে তৃতীয় 'পাদ' যে উঠিবে—তাহা নিশ্চিত। সেই পুণ্য-কালের জন্য জনগণের প্রস্তুত হইতে হইবে। কেননা সেই পুণ্যযুগে তাঁহা-দিগকে মানবতার বিনম্র সেবক হইতে হইবে।" ইহাতে লোকের মনে এই প্রশ্ন জাগিতে থাকে যে, তিনি কি অবতার-বাদে বিশ্বাস করেন এবং মনে করেন তিনি একজন অবতার? বিনোবাজী তাঁহার লিখিত এক পত্রে এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এই আশঙ্কা দূর করিয়াছেন। "কোন জীবনধারী মানুষের সম্বন্ধে অবতার কল্পনা আমি কদাপি করি না। বিভূতিসম্পন্ন, দেহ-মুক্ত বিভূতি-সম্পন্ন জ্ঞানদেবের ন্যায় পুরুষ যাঁহার প্রতি আমার পরমশ্রদ্ধা, তাঁহাকেও আমি অবতার বলিয়া মনে করি না। তাঁহাকে আমি শ্রেষ্ঠ সৎ-পুরুষ বলিয়া

মানি। রাম ও কৃষ্ণ অবতার। কেনন্না শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসী-রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ রাম ও কৃষ্ণের মানবতার উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের পক্ষে উপাসনার জন্য এক স্থান মিলিয়াছে। তাই আমি তাঁহাদিগকে অবতার বলিয়া মানিয়া থাকি। আর কোন অবতার আমি মানি না। 'বামন-অবতার' ব্যক্তিগত ভাষা নহে; উহা ভূদানযজ্ঞের বর্ণন মাত্র। ভূদানযজ্ঞের রূপ 'বামনের' ন্যায় ক্ষুদ্র। কিন্তু 'বামন' যেরূপ বিরাট রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেরূপ ভূদানযজ্ঞের দ্বারা অহিংসক ক্রান্তি রচিত হইতে পারে। 'বামন' ভিক্ষা মাগিতেছেন এরূপ মনে হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি বলিকে দীক্ষাই দিয়াছিলেন। এই সমগ্র রূপক বুঝিয়া লইতে হইবে। এইপ্রকার অবতারের উল্লেখ তো না করিয়া পারি না; কেননা আমাদের সমাজ এবং আমি এই সংস্কারে ভরপুর হইয়া আছি। কেবল বামন-অবতারের উল্লেখই করিয়া থাকি, ইহা নহে। 'প্রজাসূয়-যজ্ঞ', 'ভূদানযজ্ঞের অশ্ব', নূতন 'ধর্মচক্র-প্রবর্তন' এইসবেরও আমি উল্লেখ করিয়াছি। এ সকল নেহাৎ ছোট বিষয়ও নহে। কিন্তু আমি এইসবের উল্লেখ এইজন্য করিয়া থাকি যে, ইহার দ্বারা আপনাদের সহায়তা মিলিবে। আপনারা ক্ষুদ্র নহেন, আপনারা মহান—আপনাদিগকে ইহা শিখাইতে চাই। আমার মধ্যে যে 'আমি' রহিয়াছে তাহা ব্যক্তিগত 'আমি' নহে। উহা সমগ্র 'সর্বোদয়'-সমাজকে উদরে প্রবেশ করাইয়া লইয়া কথা বলিতেছে—এরূপ ভাষা।"

সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে আত্মার এক-এক গুণের বিকাশ হয় এবং মন্ত্ররূপে উহা আবির্ভূত হইয়া থাকে। যুগের এক বিশিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে উক্ত গুণ বিকশিত ও উক্ত মন্ত্র ফলবতী হয়। ঐরূপ গুণের বিকাশ বা মন্ত্রের আবির্ভাবই প্রকৃত অবতার আর ঐ ব্যক্তি নিমিত্তমাত্র অবতার। এ বিষয়ে পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ভূমিহীন দরিদ্র ধনীর ষষ্ঠ-পুত্র

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পরিবারের পরিধির ধারণাকে সম্প্রসারিত করাই ভূদানযজ্ঞের এক মূলগত কথা। ভগবান কাহাকেও এক পুত্র দেন,

কাহাকেও দুই পুত্র, তিন পুত্র বা চার পুত্র দেন। যাঁহার চার পুত্র তিনি মনে করেন—তাঁহার পুত্রগণ ধনসম্পত্তি চার ভাগে ভাগ করিয়া ভোগ করিবে। যদি তাঁহার পঞ্চম পুত্র জন্মগ্রহণ করে তবে কি তিনি তাহাকে প্রত্যাখ্যান বা অনাদর করেন? তিনি তাহাকেও সস্নেহে অভ্যর্থনা করেন। সেইরূপ ধনী মনে করিয়া লউন—এইযুগে ভূমিহীন দরিদ্র তাঁহার ষষ্ঠ-পুত্র। ইহা এইযুগের ইঙ্গিত; ইহা 'যুগধর্ম' ও 'যুগকর্ম'। অন্যত্র বিনোবাজী বলিয়াছেন, "যদি আপনার চার পুত্র থাকে তবে আমাকে পঞ্চম পুত্র মনে করুন এবং আমার যাহা পাওনা তাহা আমাকে দিন। আজ যিনি দিতেছেন না তিনি কাল দিবেন। তিনি না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষে এমন কেহ নাই যিনি আমাকে ভূমিদান করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।"

বিনোবাজী আরও বলিয়াছেন—"৬ একরের মধ্য হইতে ১ একর দিন। ১ একর দিলেও ৫ একর হইতে ফসল কম পাওয়া যাইবে না। একই পরিমাণ সার ও পরিশ্রম উহাতে পড়িবে এবং ভগবানের আশীর্বাদও পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক কৃষকই বুঝে যে, ৬ একর জমিতে যে-ফসল জন্মে ৫ একর জমি হইতেও সেই ফসল পাওয়া যাইতে পারে। তাই আমি বলি, ৬ একর হইতে ১ একর দিন। তাহাতে পরমেশ্বরও বরদান করিবেন এবং গরীবেরা খাইয়া বাঁচিবে।"

ধনী নিমিত্তমাত্র হও

শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে বলিয়াছিলেন 'আমি সকলকে পূর্ব হইতেই মারিয়া রাখিয়াছি। হে সব্যসাচী, তুমি নিমিত্তমাত্র হও।'—সেরূপ গভীর আত্ম-বিশ্বাসের সুরে বিনোবাজী ধনীদের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—'ভূমি ধনীর হাত হইতে গরীবের হাতে চলিয়া গিয়াছে। প্রশ্ন এইমাত্র যে, কোন্ পথে ভূমি যাইবে? হে ধনী, তুমি নিমিত্তমাত্র হও—যাহাতে শান্তি ও প্রেমের পথে ভূমি-সমস্যার সমাধান হইতে পারে।' কত গভীর তাঁহার বিশ্বাস—জনশক্তির অভ্যুদয়ের অনিবার্যতায়! তাঁহার এই দিব্যদৃষ্টিসূচক বাণী যে, অদূর ভবিষ্যতের দিকে সঠিক অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। ভূমিতে যে নিজে চাষ করিয়া ফসল উৎ-

পাদন করিবে ভূমির মালিকানাও তাহারই হওয়া উচিত—এইবোধ সমাজে ক্রমবর্ধমানভাবে জাগ্রত হইতেছে। দেশের জনসাধারণের পক্ষ হইতেও এই দাবী ক্রমশঃ উত্থিত হইতেছে। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে ভূমি-বণ্টনের জন্য সরকারের উপর ক্রমশঃ চাপ দেওয়া হইতেছে। সরকার কর্তৃক ভূমি-বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ অনভূত ও স্বীকৃত হইতেছে। দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই ভূমির সংগত বণ্টনের পক্ষে আগ্রহশীল। অন্যান্য দেশের পরিস্থিতিও ইহার অনুকূল। তাই মনোস্থিতি ও বস্তু-স্থিতি উভয় দিক হইতেই সময়ের ইংগিত বুঝা যাইতেছে। ভূমির সংগত বণ্টন আর বেশী দিন ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। ধনীরা কি ইহা এখনও বুঝিতে পারেন নাই? বৈশাখের সন্ধ্যাব প্রাককালে বায়ুকোণে কাল মেঘ জমিয়াছে। বাতাসের গতি বন্ধ হইয়া গুমোট ভাব হইয়াছে। শীঘ্র কালবৈশাখী উঠিবে। কিন্তু তাহাতে যদি কেহ মনে করে যে ঝড় উঠিবে না, তবে তাহার বুদ্ধি যেরূপ ভ্রান্ত হয় সেরূপ আজ যদি ধনীরা মনে করিয়া থাকেন যে, জমি তাঁহাদের হাতে থাকিয়া যাইবে তবে তাঁহাদের বুদ্ধিও তদ্রূপই ভ্রান্ত। ভূস্বামীগণ সময়ের ইংগিত চিনিয়া লউন। আজ 'কাল-পুরুষ' বিনোবাজীর মুখ দিয়া কথা বলিতেছেন। আজ যুগদেবতা বিনোবাজীর দ্বারা নূতন যুগধর্ম প্রতিষ্ঠা করাইতেছেন—'ধর্ম-চক্র-প্রবর্তন' করাইতেছেন।

ধনীদের সম্মান রক্ষার প্রশ্ন

ভূমি তো ধনীর হাত হইতে চলিয়া যাইবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ভূমির সংগে সংগে তাঁহাদের মর্যাদা, সম্মান ও মনুষত্বও কি চলিয়া যাইবে, না তাহা রক্ষা পাইবে? যদি ভূদানযজ্ঞের পথে, শান্তি ও প্রেমের পথে ভূমি-সমস্যার সমাধান হয় তবে ধনীর ইজ্জত বাঁচিবে, তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি পাইবে, সমাজ তাঁহার বন্ধু হইবে। কিন্তু যদি ভূমি অন্য পথে চলিয়া যায়, তবে ভূমির সংগে সংগে তাঁহার সম্মান, মনুষ্যত্ব সবই নষ্ট হইবে। আইনের পথে গেলেও তাঁহার সম্মান ও ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। তাই গয়া জেলার এক-স্থানে বিনোবাজী জমিদারগণকে এসম্পর্কে সতর্ক করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"পাটনায় জমিদারদের কয়েকজন প্রতিনিধি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে সাফ কথা বলিয়া দিয়াছিলাম, যদি আপনারা সময়ের দাবী বুঝিয়া লইয়া এখনই ভূমিদান করেন, তবে আপনারা বাঁচিয়া যাইবেন। আজ আমি পুনরায় বড় জমিদারগণের নিকট আবেদন করিতেছি—আপনাদের শুধু ভূমিদান দিলে চলিবে না, ভূদানযজ্ঞের কাজকে আপনাদের নিজেদের কাজ গণ্য করিয়া উহাতে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। আপনারা আমাকে আর কতদিন পর্যন্ত ঘুরাইবেন? আপনাদেরই এইকাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই আমার সন্তোষ আসিবে। ইহাতে আপনাদের হৃদয়ে সত্ত্ব-গুণের প্রকাশ হইবে এবং সমাজের নেতৃত্ব করিবার, সমাজের সেবা করিবার সুযোগ আপনারা পাইবেন। এই সম্পর্কে ইংরেজদের নিকট হইতে আপনাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যখন ইংরেজগণ দেখিলেন যে ভারতবর্ষ ছাড়িতেই হইবে, তখন তাঁহারা নিজেরা উদ্যোগী হইয়া একটি তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং সেইদিনই ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দিলেন। যদি তাঁহারা এইভাবে না ছাড়িতেন তবে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ তাঁহাদিগকে ছাড়িতে হইত এবং সেইসঙ্গে তাঁহারা সম্মান ও শ্রদ্ধাও হারাইতেন। কিন্তু তাঁহারা বুদ্ধিমানের মত কাজ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা ভারতবাসীর প্রীতি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ব্যবসাও চালু আছে। গান্ধীজী অহিংসার দ্বারা স্বরাজ লাভ করাইয়াছেন ইহা যেরূপ ইতিহাসে লিখিত থাকিবে, সেরূপ ইংলণ্ড সম্পর্কেও লিখিত থাকিবে যে, ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধে ইংলণ্ড বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছে। আমি ইহা মনে করি যে, আমাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধে ইংলণ্ডের নৈতিক বিজয় লাভ হইয়াছে। সত্যাগ্রহ ও অহিংসা-যুদ্ধের মহত্ত্ব এই যে, উহাতে উভয় পক্ষেরই জয় হয়। হিংস্রযুদ্ধে এক পক্ষের জয় ও অন্য পক্ষের পরাজয় হইয়া থাকে। তাই, ভ্রাতৃবৃন্দ, ইংলণ্ডের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুন। যদি সম্মান, গৌরব, প্রেম, সৌহার্দ্য ও স্নেহভাব বজায় রাখিতে চাহেন তবে সময় ও সুযোগমত কাজ করা চাই। জমি তো যাইবেই, কিন্তু দান না দিলে সম্মান ও প্রেম সবই হারাইয়া বসিবেন। গরীব আর কতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে? প্রতীক্ষা করা বা অন্য সবকিছুরই একটা সীমা আছে। এখন

দরিদ্র জাগ্রত হইয়াছে। খুসী হইয়া দান দিলে তাহাতে সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিবে। ঠিক সুযোগমত 'দেশে কালে চ পাত্রে চ' দান দেওয়া উচিত। এবং আমি ঠিক পাত্র নাহি কি? ঠিক সময়ে উচিত কাজ করিলে উহার পরিণাম ভাল হয়।"

ভয়-প্রযুক্ত দান

বলা হয় যে, ভূস্বামীগণ যে এখন দান দিতেছেন তাহা ভয় পাইয়া দিতেছেন। এই অবস্থায় তাঁহাদের ইজ্জত ও সম্মান রক্ষা পাইবে কিরূপে? এই আপত্তিও করা হয় যে, ভূদানযজ্ঞের বাণী প্রচার প্রসঙ্গে যাহা বলা হয় তাহাতে ভূস্বামীদিগকে ভয় প্রদর্শনই করা হয়। ভূস্বামীগণকে যে-ভয়ের কথা বলা হয় তাহা যে কিছু খারাপ, একথা নহে। উহাকে নৈতিক ভয় বলা যায়। ঐরূপ ভয় পাইয়া দান দেওয়া বিধেয়। শাস্ত্র বলে—"শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্, হ্রিয়া দেয়ম্, ভিয়া দেয়ম্।" 'ভিয়া দেয়ম্' অর্থাৎ ভয়ে দান দেওয়া যায়। এই সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন —"সেইভাবেই আমরা বলিতেছি যে, ভয় পাইযাও দান দিন। ইহার অর্থ এই নহে যে, যদি দান না দাও তো তোমাকে খুন করিব। এরূপ ভয়ে ভীত হইয়া কেহ দান দেন ইহা আমরা কিছুতেই চাহি না। কিন্তু যদি আমরা কাহাকেও বলি যে, তোমার বিছানার উপর সাপ রহিয়াছে, এইজন্যই বিছানা ত্যাগ কর, তবে বাস্তবক্ষেত্রে যে ভয় রহিয়াছে তাহা তাহাকে দেখাইয়া দেওয়া হইল। মানুষের যে-বিষয়ে ভয় থাকা কর্তব্য সেই ভয় করা ভাল এবং যে-বিষয়ে ভয় করা উচিত নহে সেই বিষয়ে ভয় না করা ভাল। ভয়ও একটি ভাল জিনিস। ভয়ে পড়িয়াও যদি কেহ খারাপ কাজ হইতে বিরত থাকে, তবে তাহা ঠিকই করা হইবে। কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করা হয়, "আপনি কেন এরূপ বলেন 'যদি মিথ্যাকথা বল তবে ক্ষতি হইবে, যদি হিংসা কর তবে অনিষ্ট হইবে?' 'দুনিয়াতে বিনাশ হইবে' একথাও বা আপনি কেন বলেন?' কিন্তু ইহা তো ভয় নহে; ইহা এক বিচার। মন্দ কাজ করিলে মন্দ ফল মিলিবে। এইজন্য মন্দ কাজ করিও না।—লোককে বুঝাইবার জন্যই আমরা এরূপ বলিয়া থাকি। ইহা যদি ভয় হয় তবে ইহা ধর্ম ভয়। সমাজকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, সময়ের

অবস্থা বুঝিয়া যদি উদার হৃদয়ে দান দেওয়া না হয় তবে বিপদ আছে। লোককে ভয় দেখাইয়া ধমক দিয়া আমরা একথা বলি না। পরন্তু ইহার দ্বারা বিচারই বুঝাইয়া থাকি। খারাপের ফল খারাপই হইয়া থাকে— ইহা বুঝাইয়া দেওয়া ভীতি প্রদর্শন করা নহে। ইহা তো কর্ম-বিপাক বা কর্ম-পরিণাম।" আবার বলিয়াছেন—"ইহা কি ধমকানি হইল? আর ইহা যদি ধমকানি হয় তবে বেদও তো ধমকাইয়াছে।

"মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রেচতাঃ
সত্যং ব্রবীমি বধ ইত্ স তস্য,
নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং
কেবলাঘো ভবতি কেবলাদি।"

'মূর্খ অনর্থক অন্নের স্তূপ করে। বেদ বলে, আমি সত্য বলিতেছি, সে অন্ন জমা করিতেছে না সে নিজেকে হত্যা করিতেছে। যে-ব্যক্তি অন্ন জমাইয়া রাখিতেছে সে নিজের মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতেছে। যে-ব্যক্তি একা-একা খায় সে-ব্যক্তি পুণ্য নহে—পাপই ভোগ করে।'

অতএব ভাইসব, যাহাতে বিপদ রহিয়াছে তাহা আমাদিগকে চিনিতে হইবে এবং শীঘ্রই চিনিয়া লইতে হইবে। বার্ধক্য আসিবার পর বার্ধক্যকে সকলেই চিনিতে পারে। কিন্তু যে যৌবনে বার্ধক্য কি তাহা বুঝিয়া চলে, সেইব্যক্তির সম্মান রক্ষা পায়। এইরূপে বিপদ আসিবার পূর্বে বিপদকে চিনিতে পারিলে সম্মান রক্ষা পাইবে।"

ধনীর হৃদয়-পরিবর্তন

ধনীর হৃদয়-পরিবর্তনের বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। কেহ কেহ ধনীদের হৃদয়-পরিবর্তনের কথায় অবিশ্বাসের সুরে হাসি-ঠাট্টা করিয়া থাকেন। ইহা ঠিক নহে। বাহিরের পরিস্থিতিতে মানুষের হৃদয়-পরিবর্তন হইতে পারে। হয়ও তাহাই। এইভাবে যাহার হৃদয়-পরিবর্তন হয় তাহার ভিতরে সেই বিচার-বীজ এতদিন উপ্ত ছিল। বাহিরের পরিস্থিতির বারি-সিঞ্চনে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ একই পরিস্থিতি অন্যের হৃদয়ে অনুরূপভাবে ক্রিয়া করে না। প্রবল অনুকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও

অন্যের হৃদয় অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"কোন ব্যক্তি বৃদ্ধ হইয়াছে এবং তাহার পুত্র বিয়োগ হইয়াছে, সেই কারণে তাহার বৈরাগ্য আসিল। বৃদ্ধত্ব ও পুত্রের মৃত্যুর কারণে বৈরাগ্য আসিয়াছে বলিয়া কি ঐ বৈরাগ্য খাঁটি নহে? হাঁ, উহা খাঁটি। যখন ঐব্যক্তি যুবক ছিল ও তাহার পুত্র জীবিত ছিল তখন তাহার আসক্তি ছিল। কোন-কোন লোক বৃদ্ধ হয় এবং তাহাদের পুত্রেরও মৃত্যু হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের বৈরাগ্য আসে না। ইহার কারণ এই যে, যে-ব্যক্তির বৈরাগ্য আসিয়াছে তাহার হৃদয়ে প্রথম হইতেই ঐরূপ ভাব ছিল এবং পুত্রের মৃত্যু এক নিমিত্তস্বরূপ হইয়াছে যাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত ভাব জাগ্রত হইয়াছে। এইজন্য প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে ভাল ভাব আছে এরূপ বিশ্বাস রাখিতে হইবে।"

কে কত দান দিবে?

এখন প্রশ্ন হইতেছে ভূমিদান কে দিবে? যজ্ঞে সকলকেই নিজ-নিজ 'হবির্ভাগ' আহুতি দিতে হয়। ভূদানযজ্ঞে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই ভূমিদান দিবার জন্য আহ্বান করা হইয়া থাকে। সকলের নিকট জমি চাওয়া হইয়া থাকে বলিয়া সকলের নিকট হইতে সমান জমি চাওয়া হয় না। মধ্যবিত্ত কৃষক ও জোতদারের নিকট হইতে এক-ষষ্ঠাংশ চাওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা বড়-বড় জোতদার বা জমিদার তাঁহাদিগকে বলা হয়, আপনারা নিজেদের জন্য কিছু রাখিয়া দিয়া বাকী সবই গরীবের জন্য দান করুন। যাঁহারা নিতান্ত গরীব তাঁহাদের নিকট হইতে দাবী করিয়া কিছু চাওয়া হয় না। তাঁহারা প্রেমপূর্বক যাহা দেন তাহা প্রসাদস্বরূপ গণ্য করিয়া গ্রহণ করা হয়। যেমন সুদামার নিকট হইতে খুঁদ-কুঁড়া পাইয়াও ভগবান প্রসন্ন হইয়াছিলেন, সেরূপ সামান্য জমি আছে এরূপ গরীব কৃষক যদি প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত কিছু দেন তবে ভারতমাতা প্রসন্ন হইবেন। তাই ধনীর ভূমিদান হইতেছে 'দান' আর দরিদ্রের ভূমিদান হইতেছে 'যজ্ঞ'।

আর একটি কথা পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। ভূদানযজ্ঞে এক ক্রান্তি-কারক বিচারবোধকে সারা সমাজ-জীবনে রূপদান করিতে হইবে। এইজন্য

যদি অল্পসংখ্যক লোকের দানের দ্বারা আবশ্যকীয় ভূমি প্রাপ্তি পূর্ণ হওয়া সম্ভবও হয় তথাপি তাহাতে ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না। বিনোবাজী কেবলমাত্র প্রাপ্তব্য ভূমির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেছেন না, তিনি দাতার সংখ্যাও (কোটা) নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছেন। তাই বিনোবাজী বিহারে ৮ লক্ষ দাতা ও ৩২ লক্ষ একর ভূমি চাহিয়াছিলেন।

দরিদ্র ভূমিদান দিবে কেন?

আপত্তি করা হয় যে, ভূদানযজ্ঞে গরীব কৃষকের নিকট হইতে দান লওয়া অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা। সাম্যবাদীরা তো এই আপত্তি করেনই। অন্যেরাও—এমন কি যাঁহাদের রাজনৈতিক দল বা কোন অর্থনৈতিক মতবাদের সহিত সম্পর্ক নাই এমন গ্রামসেবক গঠনকর্মীরাও পর্যন্ত আপত্তির সুরে এই প্রশ্ন করেন যে, গরীব কৃষকের এখন যে-জমি আছে তাহাতে তাহার নিজেরই পেট ভরে না। এই অবস্থায় তাঁহার নিকট জমি চাহিয়া ও তাহার নিকট হইতে জমি লইয়া তাহাকে আরও গরীব করিয়া দিলে কি লাভ হইবে? আপাতদৃষ্টিতে এই আপত্তি সংগত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু গভীরভাবে বিচার করিলে এই আপত্তি অমূলক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

আজ পর্যন্ত মানুষের আত্মজ্ঞান সাধারণভাবে নিজের পরিবার পর্যন্ত বিকশিত হইয়াছে। মানুষ নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের জন্য কতই না ত্যাগ করে ও দুঃখকষ্ট বরণ করে। কিন্তু পরিবারের বাহিরে মানুষ সাধারণত হৃদয়হীন। মানুষ পরিবারের মধ্যে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু পরিবারের বাহিরে সাধারণত তাহার আচরণ পশু প্রকৃতির সহিত তুলনীয়। ভূমি-সমস্যার মূলেও পরিবারবহির্ভূত মানুষের প্রতি মানুষের এই সহৃদয়তার অভাব। এই ব্যাপারে ধনীও যেমন দরিদ্রও তেমন। নিজের অপেক্ষা যে অধিক দরিদ্র তাহার প্রতি আজ দরিদ্র চাষীর সহানুভূতি নাই। নিজে দরিদ্র হইলেও ভূমিহীন-দরিদ্রের তুলনায় সে সুখী। সুখী ও দুঃখী কথা তো আপেক্ষিকভাবে বলা হয়। একজন এমনি দুঃখী হইতে পারে, কিন্তু অন্য দুঃখীর সহিত তুলনায় সে সুখী মনে হইতে পারে। ভূমিহীন দরিদ্র আজ সমাজে সব চাইতে দুঃখী। সমাজে আজ কারুর সহিত তুলনায়

সে সুখী মনে হইবে না। তাই সে সমাজের সকলেরই চক্ষে দুঃখী। সমুদ্র সব চাইতে নীচে আছে। সেজন্য পৃথিবীর সমস্ত জল সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। সেইরূপ আজ সমাজের অন্য সকলেরই দান ভূমিহীন দরিদ্রের প্রতি অর্পিত হওয়া উচিত। অল্প ভূমিসম্পন্ন কৃষকেরও তাহার জন্য যৎকিঞ্চিৎ ভূমিদান দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়, ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য স্বামিত্ব-মোচনের দীক্ষা দান করা। যাহার দুই হাজার একর জমি আছে সে যেমন নিজেকে ভূমির মালিক মনে করে, যাহার দুই একর জমি আছে সেও তেমনি-ভাবে নিজেকে জমির মালিক মনে করে। তাই ধনীর ন্যায় দরিদ্র কৃষকেরও শুদ্ধির প্রয়োজন আছে। নচেৎ ক্রান্তির ভিত্তি কখনও দৃঢ় হওয়া সম্ভব নহে। মালিকানার মোহই মানুষকে পুঁজিবাদের গোলাম করিয়া রাখিয়াছে —সে বড় মালিকই হউক আর ছোট মালিকই হউক। যাহার সম্পত্তি দুইখানি মাত্র ল্যাঙগট তাহারও ঐ দুইখানি ল্যাঙগটে আসক্তি থাকে। পুঁজিবাদের মূল এই। তাই কিছু-না-কিছু দান ভূদানযজ্ঞে অর্পণ করিয়া দরিদ্র কৃষকের মালিকানা বিসর্জনের দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

অত্যল্প জমির দরিদ্র-মালিক অন্তর হইতে বৃহৎ জমির ধনী-মালিকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। কেন? সমাজ হইতে ধনিকত্ব দূর করিতে সে চাহে না, বরং সে নিজেও ধনী হইতে চাহে ও হাজার-হাজার একর জমি পাইবার লালসা অন্তরে পোষণ করিয়া থাকে। ভূদানযজ্ঞে ভূমি আহুতি দিয়া দরিদ্র কৃষকগণ এই লালসা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। অত্যল্প করিয়া দিলেও যখন হাজার-হাজার দরিদ্র কৃষক ভূমিদান দিতে থাকে তখন এমন এক নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় যে, বৃহৎ জোতদার এবং জমিদারও দান দিতে প্রবৃত্ত হয়। বিহারে ও অন্যত্র বড় জমিদার ও রাজারা যে হাজার-হাজার একর এমন কি লক্ষাধিক একর পর্যন্ত ভূমিদান দিয়াছেন ও দিতেছেন তাহার পশ্চাতেও এই পটভূমিকা রহিয়াছে। বিহারে গরীব লোকে দুই বৎসর যাবৎ বিনোবাজীর উপর দানের ধারা বর্ষণ করিল। তাহা ধনীদের কাছে এক লজ্জার বিষয় হইয়া পড়িল। বিনোবাজী বলেন—"যাহার লজ্জা নাই, তাহার লজ্জা আসা ভাল। শাস্ত্র বলিয়াছেন 'ভিয়া দেয়ম্'। নৈতিক শক্তি প্রকাশ করিবার ইহা এক পদ্ধতি।" শ্রীদাদা ধর্মাধিকারী এক সুন্দর

উপমা দিয়া এই বিষয়টি বুঝাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"কৃষক খাইবার জন্য যে-শস্য রাখে তাহা পৃথক করিয়া রাখে এবং যে-শস্য বীজের জন্য রাখে তাহাও পৃথক করিয়া রাখে। তাহার খোরাকীর জন্য যে-শস্য রাখা হয় তাহা অপেক্ষা বীজ-শস্য অধিক গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। ধনীর দানে মালিকানার বাঁটোয়ারা হইবে। ধন ও ভূমির মালিকানার বণ্টন তাহার দ্বারা হইবে। কিন্তু মালিকানা বিসর্জনের ক্রান্তি গরীবের দানের দ্বারাই সম্ভব হইবে। গরীবের দানে ক্রান্তির বীজ-ধর্ম নিহিত থাকে, তাই অহিংস ক্রান্তির প্রক্রিয়ায় গরীবের স্বামিত্ব বিসর্জন এক মূলভূত বস্তু।"

দরিদ্র ঠিকমত বুঝিয়া অন্তরের সহিত যে-ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দান দিবেন তাহার মূল্য দানের পরিমাণে নহে, তাহা অমূল্য; কারণ সে-দান অভিমন্ত্রিত। সেই মহান দান সমাজের আবহাওয়াকে পূত ও পবিত্র করিয়া তুলিবে এবং তাহা বিচার-ক্রান্তি সৃষ্টি করিতে মহান প্রেরণা দান করিবে। সেই অমূল্য অভিমন্ত্রিত দান হইবে সমাজের পক্ষে স্পর্শমণি। তাহার পরশে সারা সমাজ সোনা হইয়া যাইবে। মহাভারতে রাজসূয়-যজ্ঞের নকুলের কাহিনী স্মরণ করুন। তাহা হইলে ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবার কয়েকদিন যাবৎ উপবাসী আছেন। ব্রাহ্মণ অতিকষ্টে সামান্য পরিমাণ শক্তু (ছাতু) সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। পরিবারে ৪ জন—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণপুত্র ও পুত্রবধূ। উহাতে ৪ জনের উদরপূর্তি হওয়া দূরের কথা প্রত্যেকের কয়েক গ্রাস করিয়াও হইবে না। ৪ জনের জন্য উহা ৪ ভাগ করা হইল। স্নান সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ তাঁহার অংশের শক্তুটুকু ভোজন করিবার জন্য উপক্রম করিতেছেন। এমন সময়ে দেখিলেন যে, এক দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার ব্যক্তি তাঁহার দ্বারে উপস্থিত। ব্রাহ্মণ কিছুমাত্র না খাইয়া তাঁহার অংশের সবটুকুই পরম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত তাহাকে খাইতে দিলেন ও নিজে উপবাসী রহিলেন। ক্ষুধার্ত আগন্তুক সেটুকু খাইয়া বলিতে লাগিল যে, উহাতে তাহার ক্ষুধার শান্তি তো হইলই না, বরং ক্ষুধা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণীও পরম স্নেহসহকারে তাঁহার অংশের খাদ্যটুকু তাহাকে ধরিয়া দিলেন। সে তাহা খাইয়া বলিতে লাগিল, তাহার ক্ষুধার জ্বালা কিছুমাত্র

প্রশমিত হয় নাই। তখন ব্রাহ্মণপুত্র অতীব সহানুভূতিসহকারে তাঁহার অংশের শক্তুটুকু তাহাকে দিলেন। সে তাহা খাইল, কিন্তু তথাপি ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। তখন পুত্রবধূ পরম ভক্তিসহকারে তাঁহার অংশের শক্তুকণিকাগুলি তাহাকে খাইতে দিলেন। সে তাহা খাইল এবং তাহার ক্ষুধার শান্তি হইল। সে পরম পুলকিত হইয়া চলিয়া গেল। এক নকুল পার্শ্বের এক বৃক্ষের উপর বসিয়া এইসব ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিল। ভোজনাবশিষ্ট কিছু পড়িয়া থাকিলে তাহা খাইবার জন্য নকুল বৃক্ষ হইতে নামিয়া সেইব্যক্তি যেখানে খাইয়াছিল সেখানে আসিল। কিন্তু সেখানে এক কণাও পাইল না। তখন সে সেইস্থানে শুইয়া গড়াগড়ি দিল এবং উঠিবার পর দেখিল যে, তাহার শরীরের অর্ধাংশ সোনা হইয়া গিয়াছে। আনন্দে তাহার ক্ষুধা চলিয়া গেল। সে মনে করিল, যেখানে অতিথিকে খাওয়ানো হয় সেখানে গড়াগড়ি দিলে শরীর স্বর্ণময় হইয়া যায়। তাই তখন হইতে যেখানে অতিথি ভোজন করানো দেখে সে সেখানেই শুইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়। তাহার একান্ত বাসনা শরীরের বাকী অর্ধাংশটিকেও স্বর্ণময় করিয়া লওয়া। কিন্তু তাহার পর বহু বৎসর কাটিয়া গেল। অসংখ্য অতিথি-সৎকারের স্থানে গড়াগড়ি দিয়াও তাহার আর একটি লোমও সোনা করিতে পারিল না। অবশেষে রাজসূয়-যজ্ঞ আসিল। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ অতিথি সেখানে ভোজন করিল। বড় আশায় সেই নকুল দিনরাত্রি সেই রাজসূয়-যজ্ঞের ভোজনালয়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত গড়াগড়ি দিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু তাহার আর একটি লোমও সোনা হইল না। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে নকুলের মুখ হইতে তাহার সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করিলেন। রাজসূয়-যজ্ঞ করিয়া যুধিষ্ঠিরের মনে অহঙ্কার হইতেছিল। নকুলের কাহিনী শুনিয়া তাহা দূর হইয়া গেল এবং তাঁহাদের অন্তরে এই জ্ঞানোদয় হইল যে, দরিদ্র অন্য দরিদ্রের প্রতি অন্তরের সহানুভূতি লইয়া তাহার জন্য ক্ষুদ্রদপি ক্ষুদ্র দান দিলেও সে-দানের মহিমা অতুলনীয়। সেই দান যেখানে দেওয়া হয় তাহার আশেপাশের আবহাওয়াও পূত-পবিত্র হইয়া যায়।

আরও একটি কারণে স্বল্পভূমির মালিকের নিকট হইতেও জমি

চাওয়া হয়। সে সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"আমি তো কয়েকবার বলিয়াছি যে, আমি আমার সেনা তৈয়ারী করিতেছি। উচ্চ-নীচভেদ আমাকে দূর করিতে হইবে এবং এমন সেনা তৈয়ারী করিতে হইবে যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা লড়াই করিতে সমর্থ হইব। যাঁহারা দান দিয়াছেন বা ত্যাগ করিয়াছেন এবং যাঁহারা আমাদের কাজের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারাই আমাদের সৈনিক হইবেন। আমাদের সেনা হিংসাশ্রয়ী নহে। সহিংস সেনাতে যাহার ছাতি ৩২ ইঞ্চি তাহাকে সৈন্যদলে ভর্তি করা হয়। কিন্তু আমাদের সৈন্যদলে ভর্তি হইতে হইলে ত্যাগের ছাতি থাকা চাই।"

ভূদানযজ্ঞে গরীবের নিকট হইতে ভূমিদান গ্রহণের প্রশ্ন সম্পর্কে বিনোবাজী আরও বলিয়াছেন যে, ভূদানযজ্ঞে দান দেওয়া ধর্মকার্য। ধর্মের আচরণ একমাত্র ধনী করিবে আর গরীব তাহা করিতে পারিবে না—এমন হইতে পারে না। ধনীর অর্থ আছে বলিয়া গাড়ী চড়িয়া গিয়া কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু গরীবের গাড়ীভাড়া দিবার অর্থ নাই বলিয়া সে বিশ্বনাথ দর্শন না করিয়া থাকিবে কেন? সে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া আসিবে। এই কথা শুনিয়া হঠাৎ বিশ্বাস হয় না যে, ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কেও গরীব এইরূপ মনোভাব অবলম্বন করিতে পারিবে। কিন্তু আজ আর সেরূপ কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। বিনোবাজীর হাতে তো দরিদ্রতম ব্যক্তিরাও সর্বস্ব অর্পণ করিয়া নিজেদিগকে ধন্য মনে করিতেছে। অতিসাধারণ কর্মীদের হাতেও প্রতি প্রদেশে শত-শত দরিদ্র কৃষক তাহাদের স্বল্পতম জোতের একাংশ, কোথাও সর্বস্ব অর্পণ করিয়া ধন্য হইতেছে। যেখানে কোনরূপ প্রতিদানের প্রত্যাশা না রাখিয়া শুদ্ধ অন্তঃকরণে শত-শত দরিদ্র এরূপ ক্ষুদ্রতম দান দিতেছে, সেখানে বিচার-ক্রান্তি যে গভীরভাবে সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

আন্দোলনে দরিদ্রের কর্তব্য

সর্বাত্মক ক্রান্তি সাধনের কার্যক্রম এরূপ হওয়া চাই যাহাতে তাহার মধ্যে দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য কার্যক্রম থাকে অর্থাৎ যাহাতে সর্ব-

শ্রেণীর লোক ক্রান্তি সৃষ্টিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায় ও করে। নচেৎ প্রকৃত ক্রান্তি সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। ভূমি চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি বা ধনদৌলত-অর্থের অংশ না চাহিলে ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকে। তাই সম্পত্তিদানযজ্ঞ প্রবর্তন করা হইয়াছে। তাহাতে ভূমি যাহাদের নাই এমন ধনশালী ব্যক্তিদের এই ক্রান্তিকারক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ হইয়াছে। কিন্তু এই আন্দোলনে ভূমিহীন দরিদ্রের কর্তব্য কি?

বিনোবাজী চান যে, ভূমিহীনেরা এখন তাঁহাদের ভূমি-ক্ষুধার কথা নিজেরাই বলুন। তাই তিনি মনে করেন যে, এখন ভূমিহীনগণকে জাগ্রত করিবার সময় আসিয়াছে। তিনি বলেন—"আমি চৌদ্দ মাস বিহারে ভ্রমণ করিয়াছি। এতটা কাজ এখানে হইয়াছে। এখন সময় আসিয়াছে যখন গরীবদিগকে তাঁহাদের নিজেদের ক্ষুধার কথা নিজেদিগকে বলিতে হইবে। আমি তো তাঁহাদের ক্ষুধার কথা বলিতেছি, কিন্তু এখন তাঁহাদেরই আগাইয়া আসিবার প্রয়োজন হইয়াছে। কোন কোন লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—'আপনি দরিদ্রদিগকে জাগ্রত করিতে চাহেন না কি?' আমি বলি—'এই-জন্যই তো আমি পাদপরিক্রমা করিতেছি।' বিহারে তের লক্ষ একর ভূমি পাওয়া গিয়াছে। প্রতি মাসে এক লক্ষ একর করিয়া জমি পাওয়া গিয়াছে। তাহার মূল্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মনে করি না। কিন্তু ভূমিহীন দরিদ্র জাগ্রত হইয়াছে ও বুঝিতে পারিয়াছে যে, জমির উপর তাহাদের অধিকার আছে, শুধু অধিকার নহে—ঐ জমি আবাদ করা তাহাদের কর্তব্য। ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক বলিয়া আমি মনে করি।" বিনোবাজী চাহেন যে, ভূমি পাইবার জন্য গ্রামে-গ্রামে ভূমিহীনদিগকে দাবী তুলিতে হইবে। এ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—"শিশু কাঁদিয়াই তাহার দাবী জানায়। মা ও শিশুর মধ্যে কতই না প্রেমের সম্বন্ধ! তথাপি শিশু কাঁদিলে তবে মা তাহার দিকে মন দেন এবং তাহাকে দুধ পান করান। সেইজন্য ভূমি-হীনদের পক্ষ হইতেও দাবী উত্থাপন করা প্রয়োজন। আমি তো তাহাদেরই হইয়া চাহিতেছি। তথাপি তাহাদেরও গ্রামে-গ্রামে সভা করিয়া ভূমি পাওয়ার দাবী জানানো উচিত। তবেই তাহাদের জমি মিলিবে। অধিকারবোধ হইতে

এই দাবী করিতে হইবে, ভালবাসার সহিত করিতে হইবে এবং জোরের সহিত করিতে হইবে। দরিদ্রকে বলিতে হইবে যে, ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধিলে দেশ-রক্ষার জন্য দরিদ্রেরা প্রাণ দিবে এরূপ আশা করা হয়। যদি তাহা হয়, তবে সেই দেশমাতৃকার ভূমির সেবা করিবার অধিকার তাহার থাকিবে না—ইহা কিরূপ ন্যায় বিচার? এইজন্য গরীবের দাবী পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। এই দাবী দরিদ্রগণের নিজেদেরই উত্থাপন করিতে হইবে।"

ভূমিহীন দরিদ্রদের আরও কয়েকটি কর্তব্য আছে। সেসম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন, "প্রথম কথা হইল, দরিদ্রকে আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে যে-সকল ব্যসন আছে তাহা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। তবেই তাহাদের শক্তি বর্ধিত হইবে, নতুবা নহে। মনে করুন, কাল দরিদ্রদের মধ্যে ভূমি-বণ্টন করা হইল। যাহাদের ভূমি দেওয়া হইবে তাহারা যদি মদ্যপায়ী হয় তবে তো তাহারা জমি নিজের হাতে রাখিতেই পারিবে না। এইজন্য শহর হইতে যে-ব্যসন গ্রামের মধ্যে আসিয়াছে তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে। এই আত্মশুদ্ধির কাজ দরিদ্রদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

"দ্বিতীয় কথা, আলস্য ত্যাগ করিতে হইবে। আমার এই কথা শুনিয়া আপনারা হয়তো আশ্চর্যান্বিত হইবেন। আপনারা বলিবেন, দরিদ্রেরা তো সবসময়ই পরিশ্রম করে। আমি বলিব, তাহারা পরিশ্রম করে সত্য, কিন্তু তাহারা বাধ্য হইয়া তাহা করে। যেটুকু কাজ তাহারা করে তাহাতেও তাহাদের আলস্য থাকে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহারা যেকাজ করে সে-সম্পর্কে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, সকালে ক্ষেতে যাওয়া এবং সন্ধ্যায় সেখান হইতে ফিরিয়া আসা ইহার মধ্যে ৮ ঘণ্টা কাজ করা ব্যতীত বাকী সময়ই তাহারা আলস্যে কাটাইয়া দেয়। আলস্য এক মহারোগ। ধনীদের মধ্যে তো আছেই, উপরন্তু দরিদ্রদের মধ্যেও ইহা আসিয়া গিয়াছে। এইজন্য তাহাদিগকে আলস্য ত্যাগ করিয়া সর্বদা কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। তৃতীয় কথা, গ্রামে বিচার-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বিবাদ-বিসম্বাদ আপোষে মিটাইতে হইবে। বিবাদে শক্তি ক্ষয় হয়। এইজন্য আমাদের মধ্যে যাহাতে ঝগড়া-বিবাদ না হয় তাহা দেখিতে হইবে। অবশ্য মতভেদ হইলে নানারূপ সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু সেগুলি

গ্রামের সৎলোকের দ্বারা সমাধান করাইয়া লইতে হইবে। আপোষে যে-ঝগড়া মিটানো যায় তাহা বাহিরের লোকের নিকট লইয়া যাওয়া কেন? ঘরের বিবাদ বাহিরের লোকের নিকট লইয়া যাওয়া কি বিশ্রী ব্যাপার! প্রত্যেক গ্রামেই কোন-না-কোন প্রভাবশালী সৎলোক থাকেনই। অতএব তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার বিচারই মানিয়া লওয়া উচিত।"

সাম্যবাদ ও ভূদানযজ্ঞ

এরূপ আপত্তি করা হয় যে, সাম্যবাদীদের আন্দোলন নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন প্রবর্তন করা হইয়াছে। ইহা সত্য নহে। ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন সফল হইলে হিংস্র-বিপ্লব নিবারিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন প্রবর্তিত হয় নাই। ইহা এক স্বতন্ত্র বিচার। ইহা বিধায়ক (positive), নিষেধাত্মক (negative) নহে। যদি এমন হইত যে, সাম্যবাদীরা যে-পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা ভারতের ভূমি-সমস্যা সমাধানের অন্য কোন ভাল পন্থা নাই এবং থাকিলেও ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলনের দ্বারা সেইপথে ভূমি-সসমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করিয়া মাত্র হিংস্র-বিপ্লব ঠেকাইবার চেষ্টা করাই হইতেছে, তবে তাহা কাপুরুষতা হইত। কিন্তু সাম্যবাদীরা সংঘর্ষ, অশান্তি ও রক্তের পথে যাহা সাধন করিতে চায়, ভূদানযজ্ঞ শান্তি ও প্রেমের পথে তাহা সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। হিংস্র-বিপ্লবের দ্বাবা মাত্র বাহ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু অহিংস-বিপ্লবে আন্তরিক ও বাহ্য উভয় বিপ্লবই সৃষ্ট হয়। হিংস্র-বিপ্লবে ভূমির বাঁটোয়ারা হইলে লক্ষ্মী লাভ হইতে পারে, কিন্তু সমাজের অন্তরে বিচার বিপ্লব আসিবে না বা প্রেমের শক্তি সৃষ্টি হইবে না। অহিংস-বিপ্লবে অন্তরে চিন্তা-বিপ্লব ও বিচার-বিপ্লব আসিবে। সব ভূমি গোপালের, ভূমিতে সকলের সমান অধিকার—এইবোধ সমাজের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে এবং সেই বিচারবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া ভূস্বামীগণ তাঁহাদের কৃত অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে স্বেচ্ছায় মালিকানা বিসর্জন দিবেন এবং তাহাতে সমাজরচনায় বিপ্লব আসিবে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ইহাকে revolution by consent সম্মতিক্রমে সাধিত ক্রান্তি আখ্যা দিয়াছেন। বিরাট সমস্যার তুলনায় অত্যল্প হইলেও

৪ বৎসরের মধ্যে ৪০ লক্ষ একরের অধিক ভূমি সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই আন্দোলনের প্রতি অনুরাগ দেশের প্রায় সর্বত্র সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে। দেশের হাওয়া পরিবর্তিত হইতেছে। উপরন্তু কেবলমাত্র ভূমি-সমস্যার সমাধানেই এই আন্দোলনের পরিণতি ঘটিবে না। ভূমি-সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান অহিংস-সমাজরচনার ভিত্তি পত্তন করিবে এবং উহা অহিংস-সমাজ প্রতিষ্ঠায় পরিণতি লাভ করিবে। যদি এই পবিত্র পন্থায় ভারতের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়, তবে ভারত কোন খারাপ উপায় অবলম্বন করিবে না। বিনোবাজী বলেন—"কাহারও পিপাসা লাগিয়াছে, যদি তাহার পরিষ্কার জল মিলে তবে সে অপরিষ্কার জল পান করিবে না। কিন্তু নির্মল জল না পাইলে সে ময়লা জল পান করিতে পারে। ভারতে ভাল পথে গরীবের সমস্যার সমাধান হইলে খারাপ পথ আসিবে না।" মোট কথা যেখানে দারিদ্র্য থাকিয়া যাইবে সেখানে সাম্যবাদ আসিতে পারে। ভারতেও আসিতে পারে—পৃথিবীর অন্যত্রও আসিতে পারে, উহাতে বাহিরের আক্রমনের আবশ্যকতা নাই।

সাম্যবাদীরা এরূপ আপত্তি করেন যে, ভূদানযজ্ঞ ধীরে-ধীরে চলিবার রাস্তা। তাহাতে বিনোবাজী বলেন—"কিন্তু যে-স্থলে আজ পর্যন্ত লওয়ারই অভ্যাস ছিল, সেইস্থলে আমি তো সমাজকে দান দেওয়ার অভ্যাস শিক্ষা দিতেছি। অভ্যাস সৃষ্টির কাজ ধীরে-ধীরেই হইয়া থাকে। আমার আশা তো সারা পৃথিবীর ভূমি পুনর্বণ্টন করা। আজ পৃথিবীর ছোট-বড় সব রাষ্ট্রই ভয়গ্রস্ত। এই ভয় হইতে মুক্তি পাইবার উপায় কাহারও জানা নাই। মুক্ত হইবার উপায় বাহিরের নহে—অন্তরের হওয়া চাই। ঐ পথ আমরা খুঁজিয়া পাইয়াছি। কিন্তু লোকে বলে যে, আমার অহিংসার রাস্তা বড় লম্বা। যদি তাঁহারা তাড়াতাড়ি পৌঁছিবার রাস্তা চাহেন, তবে ভুলিলে চলিবে না যে উহা মৃত্যুর দিকে লইয়া যাইবে।"

বিহারে সাম্যবাদীরা ও ফরওয়ার্ড-ব্লকের লোকেরা জনসাধারণকে বিনোবাজীর কার্যক্রম সম্পর্কে সতর্ক হইবার জন্য বলিয়াছিলেন। সেই-বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়া বিনোবাজী বলেন—"ইঁহারা বলেন যে, সংঘর্ষই জীবনের বুনিয়াদ। তাঁহাদের কাছে সারা জীবন সংঘর্ষময়। মাতা পুত্রকে

স্তন্য পান করান। তাহা হইলে তাহা কি মাতার স্তনের সহিত বালকের সংঘর্ষ বলিতে হইবে? সারা দুনিয়া সংঘর্ষে চলে না, প্রেমেই চলে। মুমুক্ষুঃ মৃত্যুর সময় নিজের প্রিয়জনকে সম্মুখে দেখিতে পাইলে শান্তিতে তাহার মৃত্যু হয়। তবে উহা কি তাহার আঁখির সহিত প্রিয়জনের সংঘর্ষ? কিন্তু ইঁহারা ঠিকমত চিন্তাও করেন না। এইজন্য তাঁহাদের সব কাজই নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়।

"তাঁহারা বলিয়াছেন যে, লোকেরা যেন আমার মোহজালে না পড়েন। কিন্তু তাঁহারা লোককে কী বলিতে চাহেন? যাঁহারা জমি পাইয়াছেন বা পাইবেন তাঁহাদিগকে কি ইহাই বুঝাইবেন যে, সেইজমি যেন তাঁহারা গ্রহণ না করেন কিংবা ভূমিদান যিনি করিতে চান তিনি যেন তাহা না করেন? ইঁহারা এযাবৎ বরাবর শুভ সুযোগ নষ্টই করিয়াছেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামেও সাম্যবাদীরা সহযোগিতা করেন নাই এবং তাহাতে এক মস্তবড় সুযোগ তাঁহারা হারাইয়াছিলেন। এইজন্য আমি তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ দান করিতেছি, তাঁহারা যেন এইবারের সুযোগ নষ্ট না করিয়া এই আন্দোলনে সহযোগিতা করেন। তাঁহারা নিজেদের হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই বিজ্ঞানের যুগে তো দরজা সর্বদা খুলিয়া রাখা চাই।"

কমিউনিষ্টগণের আপত্তির খণ্ডন

১৯৫৩ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে বিহারের মুঙ্গের জেলার বীহট গ্রামে কমিউনিষ্ট-কর্মীদের পক্ষ হইতে বিনোবাজীর নিকট প্রেরিত এক পত্রে ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছিল। বিনোবাজী তাঁহার এক প্রার্থনান্তিক ভাষণে উহার উত্তর প্রদান করেন। মার্কসপন্থীদের পক্ষ হইতে ভূদানযজ্ঞের বিরুদ্ধে সাধারণত যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হইয়া থাকে বিনোবাজীর উক্ত জবাবে সেসমস্ত খণ্ডিত হইয়াছে। উত্তরদান প্রসঙ্গে বিনোবাজী বলেন—"প্রথমে কমিউনিষ্টরা ভূদানযজ্ঞকে কেবল ভুলই মনে করিতেন না, উপরন্তু তাঁহারা বলিতেন যে, এই আন্দোলন তাঁহাদেরই বিরুদ্ধে করা হইতেছে। কিন্তু আনন্দের কথা এই যে, যেমন-যেমন ভূদানযজ্ঞের ভাবধারা জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে, উক্ত

ভাবধারার বিকাশ হইতেছে, দানপত্র পাওয়া যাইতেছে, ভারতে জাগৃতি আসিতেছে এবং উহার প্রভাব সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হইতেছে, তেমন-তেমন কমিউনিষ্টদের মধ্য হইতেও কিছু-কিছু লোক আগাইয়া আসিতেছেন এবং আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে সহযোগিতা পাইতেছি। কয়েকটি স্থানে তাঁহারা আমাকে দানপত্র দিয়াছেন এবং মানপত্রও দিয়াছেন। আর এখন তো একজন বড় কমিউনিষ্ট-নেতা শ্রীগোপালন ঘোষণা করিয়াছেন, 'যদিও ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন হইতে বিনোবাজী যতটা আশা করেন আমরা তাহা করি না এবং আমরা মনে করি যে, আইন ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান হইবে না, তথাপি এই আন্দোলন একটি ভাল আন্দোলন বলিয়া মনে করি।' আমি মনে করি যে, শ্রীগোপালনের এই উক্তি তাঁহাদের হৃদয়-পরিবর্তনের পরিচায়ক। যাঁহারা মনে করেন যে, কাহারও হৃদয়ের পরিবর্তন হইতে পারে না, তাঁহাদের সেইরূপ মনে করা ঠিক নহে। যিনি স্বীকার করেন যে, হৃদয়-পরিবর্তন হওয়া সম্ভব তিনি গৌরবের পাত্র। যিনি নিজের হৃদয়কে অপরিবর্তনশীল বলিয়া মনে করেন তিনি জড়। কারণ এইরূপ ভাবা জড়ের লক্ষণ, চেতনের নহে। আমি জানি যে, কমিউনিষ্টরা চেতন, জড় নহে। তাই তাঁহাদের কিছু হৃদয়-পরিবর্তন হইয়াছে। প্রথমে তাঁহারা এই আন্দোলনকে কেবলমাত্র অকার্যকর বলিয়াই মনে করিতেন না, উপরন্তু ইহাকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন। আজ তাঁহারা ইহাকে অকার্যকর বলিয়া মনে করিলেও ইহাকে ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করেন না।"

কমিউনিষ্টদের আপত্তির একটি কারণ এই যে, ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন সফল হইলে ভূমি ছোট-ছোট খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইবে ও তাহাতে ভারতের ক্ষতি হইবে। পুঁজিপতিরাও ঐরূপ মনে করেন এবং এই বিষয়ে তাঁহারা কমিউনিষ্টদের সহিত একমত। বিনোবাজী বলেন, "কমিউনিষ্ট ও পুঁজি-পতি উভয়েই চান যে, উৎপাদন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হউক। কিন্তু বণ্টনের বিষয়ে উভয়ের মধ্যেই পার্থক্য রহিয়াছে। পুঁজিপতিরা বলেন যে, দক্ষতা অনুসারে বণ্টন হউক আর কমিউনিষ্টরা সমবণ্টন চান। উহাদের মধ্যে এই-টুকুই প্রভেদ। কিন্তু আমরা চাই যে, উৎপাদনও বিকেন্দ্রীকৃত হউক। এই বিষয়ে আমাদের সহিত বিরোধে তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া যান। এইরূপে

যাঁহারা পরস্পর-বিরোধী তাঁহারাও কোন-কোন বিষয়ে এক হইয়া যাইতে পারেন।" এখানে কমিউনিষ্ট ও পুঁজিপতি উভয়েই উৎপাদনব্যবস্থা কেন্দ্রীকৃত করিতে চান। তাই ভূমি-খণ্ড বৃহৎ হইলেই তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু ভূমির বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদন-ব্যবস্থায় ভূমির খণ্ড ছোট হইলেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিলে এবং উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা থাকিলে ও সার দিলে উৎপাদনের হার কেন্দ্রীকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম হয় না, বরং অনেক স্থলে বেশী হয়।

কমিউনিষ্টরা তাঁহাদের পত্রে লিখিয়াছিলেন—"আপনার আন্দোলনে কয়েকটি ত্রুটি আছে। এজন্য উহা আমরা বিশ্বাস করি না।" তাহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন—"ইহার অর্থ এই যে, যদি ত্রুটি না থাকে তবে তাঁহারা ঐই আন্দোলনে বিশ্বাস করিবেন।"

কমিউনিষ্টরা এই অভিযোগ করেন যে, বিনোবাজী দরিদ্রদের সংগঠনকে হিংসা করেন। তাহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন—"আমার সম্বন্ধে তাঁহাদের এই ধারণা ভুল। বরং আমি এই দাবী করিব যে, আমাদের এই দুই বৎসরের আন্দোলনে ভূমিহীনদের মধ্যে যে-জাগরণ আসিয়াছে তাহা অন্যকোন আন্দোলনে হয় নাই। আমার কাছে ভূমিহীনেরা হাজারে-হাজারে আসে। তাহারা স্বীকার করে যে, তাহাদেরই পক্ষ হইয়া আমি দাবী করিতেছি।"

বিনোবাজী ভূমি-ভিক্ষা চাহিয়া ভূমিহীনদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতেছেন —কমিউনিষ্টদের এই আপত্তির উত্তরে বিনোবাজী বলেন, "আমি অধিকারই চাহিতেছি, ভিক্ষা নহে। আমি ষষ্ঠাংশ দাবী করিয়া থাকি। ইহাতে যদি কাজ সফল না হয় তবে অধিক চাহিব। ভিক্ষুক কখনও বলিতে পারে না যে, আমাকে অতটা দাও। ভিক্ষুক যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। যদি আমরা আশ্রমের জন্য ভূমি প্রার্থনা করিতাম এবং যদি কেহ সামান্য কিছু ভূমি দিত, তবে আমরা তাহার উপকার স্বীকার করিতাম এবং আশ্রমের কার্য-বিবরণীতে তাহার দানের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিতাম যে, আমরা তাহার কাছে ঋণী। কিন্তু এই ব্যাপার অন্যরূপ। কেহ যদি এক হাজার একর ভূমিদান করেন এবং তাঁহার তদপেক্ষা অনেক গুণ বেশী ভূমি থাকে, তবে সেই এক হাজার একর ভূমি লইতেও আমি অস্বীকার করি। আমি বলি

যে, ইহা তো ভিক্ষা দেওয়া হইল। আমি ভিক্ষা লইতে আসি নাই. দীক্ষা দিতে আসিয়াছি।"

কমিউনিষ্টরা অনুযোগ করেন যে. ধনবানেরা বিনোবাজীকে কেবলমাত্র আবাদের অযোগ্য পতিত ভূমি দিয়াছেন। তাহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন—"আমি হনুমানের কাজ করিতেছি। সমগ্র পর্বতই আমি রামের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিব। তাহার মধ্য হইতে প্রয়োজনমত বনস্পতি বাছিয়া লওয়া যাইবে। আমি ধনবানদিগকে বলিয়াছি যে, তাঁহাদের নিকট হইতে ৩২ লক্ষ একর ভাল জমি পাইতে চাই। তাহাছাড়া পাহাড় দিলে তাহাও লইব। কারণ উহাও আমাদের মাতৃভূমির অংশ। আমরা তাহাকে ভালবাসি। উপরন্তু খারাপ জমি দিলেও তো তিনি কিছু ছাড়িতেছেন। যাহাই দিন না কেন, যখন কেহ কিছু দেন তখন তাঁহার অঙ্গনে আমাদের প্রবেশ ঘটে। অতঃপর আমরা এক-পা দুই-পা করিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহার রন্ধনশালায় পৌঁছিব এবং বলিব যে, আপনার পুত্র আসিয়াছে. তাহাকে খাইতে দিন। তখন তিনি খাওয়াইতে বাধ্য হইবেন।"

ভূদানযজ্ঞের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে কমিউনিষ্টগণের যে-আপত্তি ছিল তাহার উত্তরদান প্রসঙ্গে বিনোবাজী বলেন যে, ধনবানদের মধ্যে যাঁহারা সজ্জন ও উদারচিত্ত তাঁহাদিগকে তিনি দান দিবার ও মালিকানা ত্যাগ করিবার প্রেরণা দান করিয়া ও তাঁহাদের নিকট হইতে দানগ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার ভাবধারায় দীক্ষিত করিতেছেন এবং ধনবানদের মধ্যে যাঁহারা কৃপণ ও সংকীর্ণ-হৃদয় তাঁহাদের নিকট হইতে উক্ত সজ্জনদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছেন। কমিউনিষ্টগণ ধনবানদিগকে দরিদ্রের শত্রু বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাদের সহিত দরিদ্রের সংঘর্ষ ও লড়াই বাধাইতে চান। তাই কমিউনিষ্টগণ ভেদ, বিরোধ ও লড়াই-এর ভাষা ব্যবহার করেন। তাই ঐরূপ ভাষার মাধ্যমে তাঁহাদিগকে বুঝানো সহজ হয়। তাঁহারা ভেদের ভাষা সহজে বুঝেন। এইজন্য বিনোবাজী অভেদবাদী হইয়াও ভেদের ভাষা ও লড়াই এর ভাষা ব্যবহার করিয়া বলেন, "আমি দরিদ্রের শত্রুদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাইতেছি। কমিউনিষ্টরা দরিদ্রের সকল শত্রুকে এক করেন। ইহাতে সজ্জন ও দুর্জন এক হইয়া যায়। আর তাহাতে দুর্জনদেরই শক্তিবৃদ্ধি হয়। ধনবানদের মধ্যে

অন্তত শতকরা দশজন তো ভাল লোক আছেন। যদি সেই দশজনকে পাওয়া যায়, তবে তাঁহাদের পুণ্যের ফল বাকী নব্বইজনের মিলিবে। এজন্য তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সজ্জন তাঁহাদিগকে আমি অহিংস-উপায়ে ভাঙ্গাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছি। ভেদনীতির এই প্রয়োগকৌশল যিনি বুঝেন না, তিনি রাজনীতি বুঝেন না, নীতিশাস্ত্রও জানেন না।" তিনি আরও বলেন যে, কুস্তি লড়িবার সময় সামনের লোকের সহিত হাত মিলাইতে হয়—জয় যাহারই হউক না কেন। এবং সেইজন্য তিনি বড় বড় জমিদার ও রাজাদের সহিত কুস্তি লড়িবার জন্য হাত মিলাইয়াছেন। যদি তাঁহার পরাজয় ঘটে, তবে কমিউনিষ্টদের এই মতই প্রমাণিত হইবে যে, ধনবানদের মধ্যে শতকরা একশতজনই দুর্জন। আর তাঁহার জয় হইলে দরিদ্রের মঙ্গল সাধিত হইবে। সুতরাং তিনি যে-হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন তাহাতে কমিউনিষ্টদের কোন ক্ষতি নাই।

বর্তমান অবস্থায় আইনের দ্বারা ভূমি-সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব কিনা এই সম্পর্কে তিনি বলেন—"প্রভাব তিন প্রকারের হয়। প্রথম—হত্যা করিয়া, 'ভূমি দাও নাহিলে গুলি চলিবে'। দ্বিতীয়—আইনের প্রভাব; তৃতীয় —নীতির দ্বারা জনমতের প্রভাব। আমরা নৈতিক প্রভাব চাই। নৈতিক চাপ ব্যতীত হৃদয়-পরিবর্তন করিতে পারিব—এইরূপ দাবী আমি করি নাই। ইহার পরেই আইন তৈয়ারী করা যাইতে পারে। আপনারা আইনে বিশ্বাস করেন, কিন্তু আইনে শক্তি আসে কোথা হইতে? আইনে হয় জনতা, না-হয় সৈন্য হইতে শক্তি আসিবে। যদি ২৫ একরের 'সিলিং' (ব্যক্তিগত মালিকানায় ভূমির উচ্চতম পরিমাণ) নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে হাজার-হাজার মধ্যবিত্তের নিকট হইতে ভূমি লইতে হইবে। দুনিয়ায় মধ্যবিত্তরাই রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহারা শিক্ষিত। খবরের কাগজ তাঁহারাই পরিচালনা করেন। এইজন্য মধ্যবিত্তদের নিকট হইতে আইনের বলে বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি লওয়া যাইতে পারে না। তাঁহাদের নিকট হইতে যদি ভূমি লইতে হয়, তবে রক্তাক্ত-বিপ্লবের দ্বারাই লইতে হইবে। রক্তাক্ত-বিপ্লব এখানে অসম্ভব। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, যখন 'সিলিং'এর কথা উঠে তখন লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভূমি ভাগ করিয়া লয়। এইজন্য আইনের দ্বারা সমস্যার সমাধান তখনই সম্ভবপর

হইবে, যখন বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি লওয়ার জন্য অন্যকোন উপায় বাহির হইবে। উহাও মধ্যবিত্তদের সম্মতি অনুসারে করিতে হইবে। ভারতবর্ষের সংবিধানেও ক্ষতিপূরণের কথা আছে। উহাও কোন অনুচিত কথা নহে। কারণ আইন জনমতের উপর ভিত্তি করিয়া তৈয়ারী হইয়াছে। কমিউনিস্টদের বক্তব্য হইল 'উহা ভুল তৈয়ারী হইয়াছে'। কিন্তু যে-ভুল জনমত করে তাহাকে ভুল বলা উচিত নহে। এইজন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে আইন তৈয়ারী করিয়াও ভূমি পাওয়া যাইবে না। লোকেরা নিজেদের মধ্যে তাহা ভাগ করিয়া লইবে এবং যে-যৎসামান্য ভূমি পাওয়া যাইবে তাহাও খারাপ হইবে। আমি খারাপ ভূমি লওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভাল ভূমিও লোকদের নিকট চাই।"

মানবহৃদয়ের মৌলিক সততা ও অন্তিমে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি-সংঘটন সম্পর্কে এক আলোচনা প্রসঙ্গে বিনোবাজী বলেন—"কমিউনিস্ট-ভাইরা সজ্জনতার উপর বিশ্বাস না রাখিলে তাঁহাদের গুরু যেশিক্ষা দিয়াছেন তাহা সফল হইতে পারে না। তাঁহাদের গুরু কার্ল মার্ক্স বলিয়াছেন যে, প্রথমে দরিদ্রের রাষ্ট্র হইবে এবং তাহার পর রাষ্ট্র আর থাকিবে না। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কাহারও হাতে কোনরূপ ক্ষমতা না থাকিলেও রাষ্ট্র চলিতে পারে। যদি ইহা বিশ্বাস করা যায় তবে জনসাধারণের উপরও বিশ্বাস রাখিতেই হইবে। তাঁহারা ইহা বলেন যে, অবশেষে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি হইবে। কোনরূপ অধিকারের প্রয়োজন থাকিবে না। আর জনগণ সৎভাবে জীবনযাপন করিতে থাকিবে। তাহা হইলে সজ্জনতার উপর বিশ্বাস রাখিতে হয়। মার্ক্স যেকথা বলিয়াছেন তাহা দশ লক্ষ বৎসর পরে ঘটিবে এরূপ নহে। তাহা এখনই ঘটিবার কথা। যদি সজ্জনতার উপর বিশ্বাস না থাকে তবে রাষ্ট্রকে কায়েম রাখিতেই হইবে এবং স্বীকার করিতে হইবে যে state will wither away অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটিবে—এই কথাটি ভুল। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করেন এমন লোক কেবল কমিউনিস্টদের মধ্যেই নহে উপরন্তু কংগ্রেস এবং সর্বোদয়ে বিশ্বাসীদের মধ্যেও আছেন। এই ভাবধারা সম্পর্কে তিনটি বিভিন্ন মত আছে। (১) কমিউনিস্টরা মনে করেন যে, অবশেষে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্র অত্যন্ত পাকা এবং মজবুত হওয়া প্রয়োজন। তাই এখন

সমস্ত অধিকার কেন্দ্রীভূত থাকা প্রয়োজন। উহাকে তাঁহারা Dictatorship of Proletariate (সর্বহারার একনায়কত্ব) বলেন। তাঁহারা মনে করেন যে, বর্তমানে একনায়কত্ব হইলেও অবশেষে ক্ষমতা ক্ষীণ হইয়া যাইবে। (২) দ্বিতীয় মত হইল আমাদের। আমরা মনে করি যে, রাষ্ট্র থাকিবে না এবং এখন হইতেই উহাকে ক্ষীণ করিবার কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত। ধীরে-ধীরে অধিকার বিকেন্দ্রীকৃত হওয়া প্রয়োজন। বিকেন্দ্রীকরণ ব্যতীত অধিকার বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভব। (৩) এইকথা স্বীকার করেন এইরূপ লোক পৃথিবীতে অনেক আছেন। কংগ্রেস ও প্রজা-সোস্যালিস্টদের মধ্যেও অনেকে এইকথা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহাদের বক্তব্য হইল যে, কোন-না-কোনরূপে রাষ্ট্র সর্বদাই থাকিবে। এইজন্য আমি কমিউনিষ্টদের বলি যে, তাঁহাদের এবং আমাদের ভাবধারায় একস্থানে মিল আছে। তাহা হইল এই যে, অবশেষে রাষ্ট্র থাকিবে না। যদি তাঁহারা উহা জানেন ও ইহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উহা কোন্ সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া? এই সিদ্ধান্তের উপর নহে কি যে, মানুষের হৃদয়ে সজ্জনতা আছে আর এইজন্য অবশেষে রাষ্ট্রের প্রয়োজনই থাকিবে না? এইরূপ অবস্থায় মানুষের সজ্জনতার উপর বিশ্বাস রাখাই উচিত।"

সাম্যযোগ

একথা পূর্বে বলা হইয়াছে যে. সকল মানুষের সম্যক ও সমান বিকাশ সাধন করাই সর্বোদয়ের কাম্য। কেবলমাত্র সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যকের সর্বাপেক্ষা অধিক হিত সাধিত হইলেই চলিবে না। কারণ তাহার অর্থ হইতেছে যে, অবশিষ্ট যাহারা থাকে তাহাদের বিলোপ হয় হউক, তাহাদের নাশ হয় হউক, তাহাতে উদ্বেগ বা চিন্তার কোন কারণ নাই। বরং অধিকাংশের সম্যক বিকাশের পথ সহজ করিবার জন্য তাহাদের বিলোপসাধন আবশ্যক বিবেচিত হইতে পারে! ইহা তো মানিয়া লওয়া যায় না। কারণ আমি কি—ইহা যদি আমরা গভীরভাবে মনন করিয়া দেখি তাহা হইলে আমরা বুঝিব যে, আমি যাহা, অন্যেও তাহাই। আমি অন্যের মধ্যে ও অন্যে আমার মধ্যে

সমানভাবে আছে। আমার বিকাশ বা অভ্যুদয় পূর্ণ হইতে পারে না, যদি-না ও যতক্ষণ-না অন্যের বিকাশ বা অভ্যুদয় হয়। ইহার কারণ এই যে, সকল মানুষের মধ্যে একই আত্মা বিরাজমান। এই আত্মা অনন্ত গুণসম্পন্ন এবং অনন্তভাবেই বিকাশশীল। সকেলর মধ্যে একই আত্মা। অতএব সকলেরই সমান বিকাশ হইতে পারে, যদিও একই জীবনে তাহা সম্ভব হয় না। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য। জীবনকে বিভক্ত করিয়া দেখা যায় না। তাই আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই এই সমদর্শন হওয়া চাই ও সমতা সাধন করা চাই। আজ যদি আমরা ব্যক্তিগত জীবন তথা সামাজিক ও জাগতিক জীবনপ্রবাহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তবে আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব। আজ জগতের বিভিন্ন দেশের মধ্যে এত দ্বেষ, হিংসা ও দ্বন্দ্ব কেন? একদেশ অন্যদেশের ভয়ে ভীত কেন? ইহার মূলে ইহাই রহিয়াছে যে, একদেশ নিজেকে অন্যদেশ অপেক্ষা বড় মনে করে এবং তাহাকে বাদ দিয়া নিজেই উন্নতি ও সুখ ভোগ করিতে চায়। কারণ ঐ-দেশ মনে করে যে, অন্যার উন্নতি তাহার নিজের উন্নতির পথে বিঘ্নস্বরূপ হইবে। এই ভ্রমাত্মক মনোবৃত্তি হইতে হিংসা ও দ্বেষের উদ্ভব হয় এবং নিজের ধ্বংসকে ডাকিয়া আনে। সমাজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায় যে, মানুষ যেখানে জন্মের জন্য নিজেকে উচ্চ মনে করিয়া অন্যের সংস্পর্শকে দূরে সরাইয়া রাখে, সেখানে সে নিজেই সংকীর্ণ হইয়া যায় এবং ঐ মনোবৃত্তি তাহাকে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সংকুচিত করিয়া ফেলে। আমি যাহাকে নীচে বাঁধিবার বা দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিব সে-ও আমাকে নীচে টানিয়া নামাইবে। যদি আমাদের আশেপাশের সকলে নৈতিক দিক হইতে অধঃপতিত হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রতিক্রিয়া আমার নৈতিক জীবনেও কিছু-না-কিছু না আসিয়া থাকিতে পারে না। অর্থনৈতিকক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির মানের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। সর্বভূতে একই আত্মা বিরাজমান এইমূল বিশ্বাস থাকিলে, তবেই নিজেকে সকলের মধ্যে ও সকলকে নিজের মধ্যে দেখার দৃষ্টি লাভ করা যায় এবং তাহা হইতে সুখে-দুঃখে সকলকে নিজের সহিত সমান করিয়া

দেখার শিক্ষা লাভ হয়। বিনোবাজী ইহাকে "সাম্যযোগ" আখ্যা দিয়াছেন। সাম্যযোগই ভূদানযজ্ঞের মূল বিচারধারা। শ্রীমদ্ভাগবত গীতার ষষ্ঠ-অধ্যায়ের ২৯—৩২ এই চারিটি শ্লোকে 'সাম্যযোগ' ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উহা এই :—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥—২৯
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥—৩০
সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥—৩১
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥—৩২

'যোগে সমাহিত চিত্ত, সর্বত্র সমদর্শী সেই যোগী নিজেকে সর্বভূতের মধ্যে এবং সর্বভূতকে নিজের মধ্যে দেখিয়া থাকেন।'—২৯

'যিনি আমাকে (আত্মাকে) সর্বভূতে দর্শন করেন এবং সর্বভূতকে আমাতে দেখিতে পান তিনি আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হন না এবং আমিও তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হই না।'—৩০

'যিনি সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে (আত্মাকে) নিজের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া সাধনা করেন সেই যোগী যেকোন অবস্থায় অবস্থান করুন না কেন, তিনি আমাতেই অবস্থান করেন।'—৩১

'হে অর্জুন, যিনি সুখে বা দুঃখে সকল জীবকে নিজের সহিত সমান করিয়া দেখেন সেই (সর্বভূতানুকম্পী) যোগী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহা আমার অভিমত।'—৩২

ইহাই সাম্যের সমগ্র দৃষ্টি। বিনোবাজী যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী। তাই তাঁহার প্রাথমিক দৃষ্টি আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে তাঁহার সাম্যের প্রাথমিক দৃষ্টি ছিল—সাম্যযোগ বা সাম্যের সমগ্র দৃষ্টি। এই মৌলিক আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত তাঁহার জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে। তাঁহার সমদৃষ্টি সামান্য হইতে বিশেষে, সমষ্টি হইতে ব্যষ্টিতে সংক্রমিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিকতার সমগ্রতা অর্থাৎ আত্মার

একত্ববোধ হইতে জীবনের বিশেষ-বিশেষ ব্যবহারিকক্ষেত্রে এই একত্ববোধ পৌঁছিয়াছে। অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধী রাস্কিনের 'আন্ টু দিস্ লাস্ট' গ্রন্থ হইতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ জীবনের এক বিশেষ ক্ষেত্রে সমদৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেন। ক্রমশঃ ঐ সমদৃষ্টি জীবনের অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় এবং অবশেষে উহা সাম্যযোগে বা সাম্যের সমগ্র দৃষ্টিতে পরিণতি লাভ করে। তাই মহাত্মা গান্ধীর জীবন-দর্শনের প্রগতির প্রণালী inductive (আরোহ) এবং বিনোবাজীর জীবন-দৃষ্টির প্রগতির প্রণালী deductive (অবরোহ)। তাঁহাদের নিজ নিজ জীবন-প্রারম্ভের বৈশিষ্ট্য হইতে দৃষ্টি-প্রগতির প্রণালীর এই পার্থক্য সংঘটিত হয়।

সাম্যবাদ ও সাম্যযোগ

বিনোবাজী ভূদানযজ্ঞের মূল বিচারধারার নাম দিয়াছেন—সাম্যযোগ। ইহার কিছু আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে। সাম্যযোগের ভিত্তির উপর সর্বোদয়-সমাজ গঠন করিতে হইবে। আজ জগতে যেসব বিচারপ্রবাহ চলিতেছে তাহার সহিত তুলনামূলকভাবে সাম্যযোগের আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে সাম্যযোগের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ অনুধাবন করা সহজ হইবে। উপরন্তু জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্যযোগ কিরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে তাহাও বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। উহাতে সর্বোদয়ের স্বরূপ আমরা সহজে বুঝিতে সক্ষম হইব।

পৃথিবীতে আজ তিনটি প্রধান বিচারপ্রবাহ চলিতেছে—(১) পুঁজি-বাদ, (২) গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ও (৩) সাম্যবাদ। ইহার মধ্যে পুঁজিবাদ সর্বাপেক্ষা পুরাতন। যোগ্যতা বা কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি করাই পুঁজিবাদের কম্য। বিনোবাজী বলেন—"পুঁজিবাদ কেবলমাত্র কার্যদক্ষতাকেই স্বীকার করে। পুঁজিবাদ বলে যে, কিছুলোকের কার্যদক্ষতা কম, সুতরাং তাহা-দিগকে কম করিয়া দিতে হইবে। আর কিছুলোকের কার্যদক্ষতা বেশী, তাই তাহাদিগকে বেশী করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কার্যদক্ষতা অনুসারে পারিশ্রমিক দিয়া পুঁজিবাদ সমাজে যোগ্যতা বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রয়াসী। পুঁজিবাদ প্রচলিত থাকার ফলে কিছুলোকের জীবনযাত্রার মান উচ্চতম স্তর

পর্যন্ত উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার ফলে বহুতর লোকের জীবন অবনতির অধঃস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে। পুঁজিবাদের কাছে ইহার কোন প্রতিকার নাই। পুঁজিবাদ সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছে যে, যাহারা কার্যদক্ষ নহে তাহারা অবনতই থাকিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আর যিনি যোগ্যতাসম্পন্ন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবার অধিকার কেবলমাত্র তাহারই—ইহা অনিবার্য। এইকারণে সারা জগৎ আজ দুঃখার্ত এবং এইজন্যই পুঁজিবাদের সমর্থকও আজ নিতান্ত কম। আজ হউক আর কাল হউক, ইহার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী।"

গণতান্ত্রিক সমাজবাদে সার্বজনীন ভোটাধিকার সমাজ-কল্যাণ সাধনের একমাত্র হাতিয়ার। কিন্তু ভোটের বলে কাজ চলিলে বহুক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। তাহার প্রতিকার গণতান্ত্রিক সমাজবাদে নাই। তাই বিনোবাজী বলেন—"গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির এক ভোট। এখানে ভোটের বলে কাজ চলিয়া থাকে। তাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষা হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠেরই কল্যাণ সাধিত হয়। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ দাবী করে যে, উহাতেই সকলের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিকতার জন্য যেসব দোষ ঘটিয়া থাকে তাহা দূর করিবার উপায় সমাজবাদের হাতে নাই। যতদিন পর্যন্ত বহুসংখ্যকের রায়ের দ্বারা সংখ্যাল্পের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করা হইবে ততদিন পর্যন্ত পূর্ণ সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে না।"

এখন সাম্যবাদের কথা আলোচনা করা যাউক। বিনোবাজী বলেন—"সাম্যবাদ বলে যে, উচ্চশ্রেণীর বিলোপ না করিলে সাম্যপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে না। শ্রেণী-সংঘর্ষ ব্যতীত এবং আজ যাহার হাতে ক্ষমতা রহিয়াছে তাহার বিলোপ সাধন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এতদূর পর্যন্ত হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক এবং উহাই হইতেছে ধর্ম। ইহা সুবিদিত যে ইহার দ্বারা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ হিংসা হইতে প্রতিহিংসারই উদ্ভব হয়, যদিও হিংসার সাহায্যে তাহাকে কিছুদিন দাবাইয়া রাখা সম্ভব হয় মাত্র। কেবলমাত্র তাহাই নহে, এই কারণে মনুষ্যত্বের মূল্যও ক্ষুণ্ণ হইতেছে এবং মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইতেছে।"

তাই সাম্যযোগের বিচারধারা সকলের গভীরভাবে বুঝা আবশ্যক। সাম্যযোগ কি তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—"সাম্যযোগ বলে যে, সকল মানুষের মধ্যে একই আত্মা সমানভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। মানুষে মানুষে কোনরূপ ভেদ আছে তাহা সাম্যযোগ স্বীকার করে না। উপরন্তু মানুষের আত্মা এবং প্রাণীমাত্রের আত্মার মধ্যে কোন মৌলিক ভেদ নাই। তবে উহা এই পর্যন্ত স্বীকার করে যে, মানুষের আত্মার যে-বিকাশ হওয়া সম্ভব অন্য প্রাণীদের পক্ষে তাহা নহে। যদিও অনুশীলনের দ্বারা মানুষের আত্মার বিকাশ সাধন করা যায় তথাপি মানুষের মধ্যে সকলের বিকাশ সমানভাবে হয় না। প্রাণীমাত্রেই একই আত্মা অধিষ্ঠিত। তাই যতদূর সম্ভব প্রাণী-দিগকে রক্ষার জন্য প্রযত্ন করা কর্তব্য।

"সাম্যবাদ ও সাম্যযোগের পার্থক্য এই যে, সাম্যবাদ আত্মার অভিন্নতা বিশ্বাস করে না, কিন্তু সাম্যযোগ তাহা করে। সাম্যযোগ কেবলমাত্র আত্মার অভিন্নতা বিশ্বাস করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, উহা এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই আরও গভীর প্রদেশে প্রবেশ করে। তাহার ফলে নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিণতি সংঘটিত হইয়া থাকে।

"যখন আমরা কোন মৌলিক আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তখন তাহা জীবনের অনেক শাখায় অনুপ্রবেশ করিয়া ক্রিয়া করিতে থাকে। আমাদের নিজেদের বুদ্ধিশক্তির মালিক আমরা নহি, তাহার মালিক একমাত্র ভগবান। আমরা যেসব গুণের অধিকারী হই তাহা সমাজেরই জন্য। অতএব আমরা যেসব শক্তি লাভ করিয়াছি তাহা সমাজের সেবায় নিয়োজিত করিতে হইবে। আমরা তো নিজেদের শরীরের মালিক নহি। আমরা উহার তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। যাহাকিছু সম্পত্তি আমাদের কাছে আছে তাহার মালিক আমরা নহি, তাহার মালিক ভগবান। ট্রাস্টীশিপ বা তত্ত্বাবধায়কতার বিচার-ধারা গ্রহণ করিলে পূর্ণ বিচার-ক্রান্তি আসিয়া যায়। আমাদের যাহাকিছু সবই সমাজকে সেবা করিবার জন্য। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি হইতেছে ব্যক্তি-গত স্বার্থকে সমাজের চরণে অর্পণ করিয়া দেওয়া। সাম্যযোগ ও সাম্যবাদের মধ্যে এই বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান।"

সাম্যযোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তাহা আর্থিকক্ষেত্রে কিরূপ বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সৃষ্টি করে তাহাব ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—"যেব্যক্তি নিজের সাধ্যমত পূরামাত্রায় সমাজের কাজ করিবে সেইব্যক্তি তাহার জীবন নির্বাহের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা পাওয়ার অধিকারী হইবে। যেব্যক্তির চক্ষু নাই সে যদি তাহার চক্ষু না থাকা সত্ত্বেও যতটুকু সম্ভব কাজ করিয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ণভাবে ভরণপোষণ পাইবার অধিকার তাহারও আছে। যেব্যক্তি দৃষ্টিশক্তিহীন সেব্যক্তি সাধ্যমত পূর্ণভাবে কাজ করিলেও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নব্যক্তি অপেক্ষা তাহার কাজের পরিমাণ কম হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কাজ করিবার শক্তি ও তারতম্য অনুসারে পোষণের ব্যবস্থায়ও তারতম্য করা অন্যায়। পোষণ ভৌতিক বস্তু এবং সেবা নৈতিক বস্তু। নৈতিক বস্তুর মূল্য ভৌতিক বস্তুর মূল্য দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে না। নিমজ্জমান ব্যক্তিকে যে উদ্ধার করিয়াছে তাহার সেই দশ মিনিটের সেবার মূল্য মজুরীর হিসাবে পরিমাপ করা যায় কি? মা সন্তানকে, পুত্র পিতাকে, শিষ্য গুরুকে. মন্ত্রী সমাজকে সেবা করেন, কিন্তু এইসব সেবাকার্যের মূল্য পয়সার হিসাবে নির্ধারিণ করা যায় না। যে-সেবায় হৃদয় ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার মূল্য কেমন করিয়া পয়সার দ্বারা নিরূপণ করা সম্ভব হইবে? পুত্র মাতাকে যাহাকিছু দিয়াছে. বিদ্যার্থী গুরুকে যাহাকিছু দিয়াছে. কিষাণ সমাজকে যাহাকিছু দিয়াছে তাহা অমূল্য। নৈতিক মূল্যের মত আর্থিকক্ষেত্রেও শ্রমের মূল্য সমান হওয়া চাই। কিন্তু আজ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে। শারীরিক কাজ অপেক্ষা বুদ্ধির কাজের মূল্য বেশী দেওয়া হইতেছে, উহার প্রতিষ্ঠাও বেশী। কিন্তু ঐ প্রকারের বৈষম্য একেবারে ভিত্তিহীন। সাম্যযোগের বিচারধারা আত্মার সমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই উহাতে আর্থিকক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্য স্বীকার করা হয় না। তবে সেবকের ভূমিকা অনুসারে সেবার প্রকার ভেদ হইতে পারে। যে-সেবা মা করিতে পারেন তাহা পুত্রের দ্বারা সম্ভব নহে, আবার যে-সেবা পুত্র করিয়া থাকেন তাহা মা করিতে পারেন না। যে-সেবা প্রভু করিতে পারেন তাহা ভৃত্যের দ্বারা সম্ভব নহে, আবার ভৃত্য যে-সেবা করেন তাহা প্রভু করিতে পারেন না। ভাই যে-সেবা করেন ভগ্নী তাহা করিতে পারেন না।

আবার ভগ্নীর কাজ ভাই করিতে পারেন না। এরূপে ব্যক্তির পার্থক্য ও শক্তির পার্থক্য অনুসারে সেবার পার্থক্য খুবই হইতে পারে। কিন্তু সকলের জন্য সমানভাবে চিন্তা করিতে হইবে।

"অঙ্গুলীসমূহ কমবেশী কাজ দেয় কিন্তু তাহারা সবই সমান। একটির দ্বারা যেকাজ হয় অন্যটির দ্বারা সেকাজ পাওয়া যায় না। এভাবে বুঝা আবশ্যক যে, সমাজে একের সেবা অন্যের সেবা হইতে ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহার আর্থিক মূল্য সমান হওয়া চাই।

"আমরা বুঝিয়াছি যে, সাম্যযোগের সিদ্ধান্ত অনুসারে যখন নৈতিক মূল্যের কোন পার্থক্য হয় না তখন আর্থিকক্ষেত্রেও পার্থক্য হওয়া উচিত নহে। বিকাশের জন্য প্রত্যেকের সমান সুযোগ পাওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার সুযোগ সমানভাবে পাওয়া আবশ্যক। বিদ্যার্থী তাহার গ্রহণশক্তি অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করিবে একথা সত্য, কিন্তু তাহাতে পারিশ্রমিকের পরিমাণ কম-বেশী করিলে সকলের উন্নতি ঠিকভাবে হইবে না। তাহাতে ক্ষেত্র পরিবর্তন করিয়া অন্যক্ষেত্রে যাইবার জন্য আকর্ষণ আসিয়া থাকে—আজকাল যেমন হইতেছে। সমান বেতনের ব্যবস্থা করিলে এই মনোবৃত্তি দমিত হইবে।

"আর্থিকক্ষেত্রে সাম্যযোগের পরিণাম এই হইবে যে, প্রত্যেক গ্রাম সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে। শস্য, বস্ত্র, দুধ, ঘি প্রভৃতি যেসব জিনিসের মৌলিক প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা প্রত্যেক গ্রামে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইবে এবং তাহাতে গ্রাম স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে। এই গ্রাম স্বাবলম্বী হইবে আবার ঐ গ্রামও স্বাবলম্বী হইবে। এইভাবে উভয়েই স্বাবলম্বী হইলে সাম্যের উদ্ভব হইবে। যদি এই গ্রাম অপূর্ণ থাকে এবং ঐ গ্রামও অপূর্ণ থাকে, তবে উভয়ের অপূর্ণতার জন্য সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। যেসব জিনিসের মৌলিক প্রয়োজন আছে সেইসব জিনিস গ্রামে উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। ভগবান সকলকে পরিপূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বুদ্ধি ও শক্তি কমবেশী আছে। কিন্তু ভগবানের ব্যবস্থা এমন বিকেন্দ্রিত যে, তাহাতে সকলের বিকাশ হইতে পারে। এরূপ বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা আর্থিকক্ষেত্রেও হওয়া প্রয়োজন।"

রাজনৈতিকক্ষেত্রে সাম্যযোগের ফল ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন,

"সাম্যযোগের ফলে রাজনৈতিকক্ষেত্রেও বর্তমান মূল্যের পরিবর্তন হইবে। আমরা মাত্র শোষণহীন সমাজ চাই না, আমরা শাসনহীন সমাজও চাই। সাম্যযোগের সিদ্ধান্ত অনুসারে শাসনক্ষমতা গ্রামে-গ্রামে বণ্টন করা হইবে। অর্থাৎ গ্রামে-গ্রামে নিজেরই রাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। মুখ্যকেন্দ্রে নামে মাত্র ক্ষমতা থাকিবে এবং এরূপ হইতে হইতে অবশেষে শাসনহীন সমাজ গড়িয়া উঠিবে।"

সাম্যযোগ সামাজিকক্ষেত্রে যে-বিপ্লবাত্মক পরিণাম সৃষ্টি করিবে তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিনোবাজী বলেন—"সামাজিকক্ষেত্রেও জাতিভেদ বা উচ্চনীচ ভেদাভেদ থাকিবে না। যদি কাহারও ব্রাহ্মণের গুণ থাকে তবে তাহাকে তদনুরূপ কাজ দেওয়া যাইবে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে অন্যের অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া গণ্য করা হইবে না। সেইরূপ মেথর, মুচি প্রভৃতিকে নীচ বলিয়া গণ্য করা চলিবে না। কারণ তাহাদের অবর্তমানে সমাজ চলিতে পারে না।"

প্রকৃত ক্রান্তি বা বিপ্লব একমাত্র সাম্যযোগের দ্বারাই আসিতে পারে। ইহা দাবী করিয়া বিনোবাজী বলেন—"এইভাবে নৈতিক, আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় উক্তরূপ পরিবর্তন আনয়ন করা সাম্যযোগের কাম্য। ইহাকে ক্রান্তি বলা হয়। আজকাল হিংসাকেই বিপ্লব বা ক্রান্তি বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু যেখানে মৌলিক বিষয়ে ক্রান্তি হয় না সেখানে মাত্র উপরে উপরে পরিবর্তন আসিলে তাহাকে বিপ্লব বলা ভুল। বিপ্লব তখনই হইবে যখন আমরা নৈতিক জীবনে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন করিতে সক্ষম হইব। আমরা এই দাবী করি যে, সাম্যযোগ নৈতিক মূল্যের পরিবর্তন সাধন করে। কারণ সাম্যযোগের ভিত্তি আধ্যাত্মিক এবং উহা জীবনের সমস্ত শাখা-প্রশাখায় ক্রান্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে।" অর্থাৎ আত্মার একত্ব মান্য করিলে তবেই নৈতিকক্ষেত্রে সমতার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হইতে পারে—নচেৎ নহে। যেখানে নৈতিকক্ষেত্রে সমতা-বৃত্তির অভাব সেখানে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে মৌলিক সমতা সৃষ্টি করা সম্ভব নহে।

সাম্যযোগের ব্যাপক দৃষ্টি ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—"সাম্যযোগের বিচার হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রথমে মোহ মমতা হইতে মুক্ত হওয়া

প্রয়োজন। ভূদানযজ্ঞ মোহ মমতা মুক্ত হওয়ার উপায়স্বরূপ। কিরূপে মুক্ত হওয়া যাইবে? জমির মালিকানা বিসর্জন দিয়া এই মুক্তির সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে। ভূমিদান দেওয়া কাহারও প্রতি কৃপা করা নহে। আরও অগ্রসর হইয়া আমি বলিব যে, কোন প্রদেশে যদি জমি কম ও লোক-সংখ্যা বেশী থাকে, তবে একপ্রদেশের লোক অন্যপ্রদেশে গিয়া বসবাস করিতে পারিবে। তদ্রূপ একদেশ হইতে অন্যদেশেও লোক গিয়া বসবাস করিতে পারিবে। পৃথিবী-মাতার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত। যিনি যেখানে থাকিতে চান তিনি সেখানে থাকিতে পারিবেন। এইভাবে আমরা জগতের নাগরিক হইতে চাই এবং সর্বপ্রকার আর্থিক, সামাজিক তথা রাজনৈতিক ভেদ দূর করিতে চাই। জমি অল্প হউক, ছোট টুকরা হউক কিংবা বড় হউক, তৎ সমস্তই পরমেশ্বরের দান। আমরা তাহার মালিক হইতে পারি না। ভারতবর্ষের অধিবাসী ভারতবর্ষের মালিক, জার্মাণীর অধিবাসী জার্মাণীর মালিক এ ধারণা ভুল! পৃথিবীতে যত বায়ু আছে, যত জল আছে, যত আলো আছে, যত ভূমি আছে, উহা সকলেরই সম্পত্তি—ইহা সাম্যযোগের ব্যাপক দৃষ্টি।”

এখন সখ্য-ভক্তির যুগ

অনাদিকাল হইতে মানবসমাজের বিকাশ হইয়া আসিতেছে। আত্মা অনন্ত-গুণসম্পন্ন। এক-এক যুগের প্রয়োজন অনুসারে আত্মার এক-এক গুণের বিকাশের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তখন সেইগুণের বিকাশ হয় এবং সেইসময়ে সমাজে সেইগুণের চিন্তন ও মনন হইতে থাকে। এরূপে সমাজে এক সময়ে পরিচ্ছন্নতা-গুণের বিকাশের আবশ্যকতা হইয়াছিল। সেইযুগে সমাজে পরিচ্ছন্নতাকেই ধর্ম বলিয়া গণ্য করা হইত। আরেক যুগে কাম-নিয়মনের প্রয়োজন হইয়াছিল। তখন কাম-নিয়মনের প্রচেষ্টায় বিবাহ-প্রথার সৃষ্টি করা হইল। গুণমাত্রকেই লোকে আদর করে সত্য, কিন্তু যুগের প্রয়োজন অনুসারে ও পরিস্থিতির পরিণতির ফলস্বরূপে সমাজে যেগুণ বিকাশের প্রয়োজন হয় সেইগুণকে প্রয়োগ করিবার জন্য সমাজ উৎসুক হইয়া উঠে। পরিচ্ছন্নতাকে আজ মানুষ আদর করে। কাম-নিয়মনকে মানুষ

নিশ্চয়ই আদর করে। কিন্তু আজ আর উহার বিকাশের জন্য সমাজ উৎসুক হইয়া নাই। যে-গুণের প্রয়োগ ও বিকাশের জন্য সমাজ আজ উৎসুক হইয়াছে তাহা কি বা কি কি? বিনোবাজী বলেন যে, আজ তিনটি গুণের আবশ্যকতার উদ্ভব হইয়াছে—(১) নির্ভয়তা, (২) সমতা ও (৩) সমাজ-নিষ্ঠা। সমতার বিষয় আমরা এখানে আলোচনা করিবৃ। একযুগে ভাল উদ্দেশ্য লইয়া শ্রেণী সৃষ্টি করা হইয়াছিল। বিনোবাজী এ সম্পর্কে বলেন—"এরূপ ব্যবস্থা ছিল যে, প্রত্যেকে যেন নিজ-নিজ যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। সেইযুগে মানুষের যোগ্যতা দেখা হইত। সেইযুগের লোকে মনে করিতেন যে, যাহার বুদ্ধি কম তাহার লেখাপড়ার আবশ্যকতা কি? তাহাকে শ্রমের কাজে লাগাইলে ভাল কাজ হইবে, আর যদি তাহাকে বুদ্ধির কাজে লাগানো হয় তবে তাহার দ্বারা বুদ্ধির কাজও হইবে না, আর পরিশ্রমের কাজও হইবে না।" এজন্য শ্রেণী বা বর্ণের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। কাহারও উপর রাজ্যভার ও দেশরক্ষার ভার দেওয়া হইল। কাহারও উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের ভারার্পণ করা হইল। আর কাহারও উপর দৈহিক শ্রমের কাজ করিবার ভার দেওয়া হইল। অন্যান্য বর্ণের সেবা করার কাজ আরেক শ্রেণীর উপর অর্পিত হইল। এখন আমাদের মনে হইতে পারে যে, শ্রেণী সৃষ্টি করার ব্যাপারে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভাল ছিল না। ইহা ঠিক নহে। কোন খারাপ উদ্দেশ্য লইয়া শ্রেণী বা বর্ণের সৃষ্টি করা হয় নাই। বিনোবাজী বলেন—"পরে অসমতা বৃদ্ধি পাইল এবং লোকেরা মনে করিল যে, প্রত্যেকেরই যোগ্যতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। যেযুগে বিজ্ঞান ছিল না সেইযুগে শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু যখন বিজ্ঞানের বিকাশ হইতে লাগিল তখন হইতে মনে হইতে লাগিল যে, বিজ্ঞানের সহায়তায় সকল মানুষের সমান বিকাশ হইতে পারে। অতএব শ্রেণীর আর কোন প্রয়োজন নাই।" সমাজের অন্যান্য অসমতামূলক বা সমতার পরিপন্থী যেসব ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল বা যাহা সৃষ্টি করা হইয়াছিল তৎসম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ আজ বিজ্ঞানের যুগে ঐসব অসম-ব্যবস্থা রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাই আজ সমাজে সমতার তীব্র বুভুক্ষা জাগিয়াছে। সমতা বিরোধী কোন কথা সমাজের ভাল লাগে না। সমাজে সমতা আনিবার যে-

কোন আন্দোলনই জনগণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। কারণ আজ তাহা যুগের প্রয়োজন।

আজ সমতার যুগ আসিয়াছে। তাই সমাজে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে যে প্রেম, শ্রদ্ধা বা ভক্তি বিদ্যমান ছিল তাহার ভূমিকায়ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিতে বাধ্য। পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন হয়, পারস্পরিক প্রেম, ভক্তি বা শ্রদ্ধার প্রকারও তেমনি হইবে। পারস্পরিক সম্পর্কের ভূমিকায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন হইতেছে। তাই প্রেম, শ্রদ্ধা বা ভক্তির প্রকৃতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিতেছে। সমতার যুগে ভক্তির প্রকার হইতেছে—'সখ্য-ভক্তি'। শাস্ত্রে পাঁচপ্রকার প্রেমভাব বা ভক্তিভাবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলে যে, প্রেমভাব বা ভক্তিভাব পাঁচপ্রকার। যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। শান্তভাব হইতেছে ঋষিদের ভাব। "স্বানন্দভাবে পরিতুষ্ট"। "আত্মন্যেবাত্মনাতুষ্টঃ"। মা-র সন্তানের প্রতি যেভাব তাহা হইতেছে বাৎসল্যভাব। যেমন ননীগোপালের প্রতি যশোদার ভাব। মধুর ভাব হইতেছে শ্রীমতীর ভাব, গোপিনীর ভাব। দাস্যভাব হইতেছে স্বামীর প্রতি সেবকের ভাব। রামচন্দ্রের প্রতি হনুমানের ভাব হইতেছে দাস্যভাব। আর সখ্যভাব হইতেছে বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, সখার প্রতি সখার ভাব। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের যেভক্তি, শ্রদ্ধা বা প্রেমের ভাব তাহা হইতেছে সখ্য-ভক্তি। যেব্যক্তি অন্যকে যেমন দেখে বা ভাবে সেইব্যক্তির ভাবও তেমন হয়। যে যেমন দেখে তাহার ভাবও তেমনি। আবার যাহার যেমন ভাব সে-ও তেমনি। "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ"। যাহার যেমন শ্রদ্ধা সে সেইপ্রকার হয়। আজ সমতার যুগ। ইহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন—"অর্জুন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সখ্য-ভক্তির ভূমিকা ছিল। একে অন্যের সমান এইভাব লইয়া উভয়ে কাজ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন। অর্জুনের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি পরাক্রমশালী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শক্তি পরিমিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অসীম ছিল। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে সখ্যতা ছিল, উভয়ের মধ্যে সমতার সম্পর্ক ছিল। ভগবানের প্রতি অর্জুনের মনে আদর শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু উহার মূল ছিল সমতায়। উহার পূর্বে এক যুগ ছিল যাহা দাস্যভক্তির

যুগ। ঐযুগে স্বামী-সেবকের ভাব ছিল। স্বামী এবং সেবকের পরস্পরের মধ্যে প্রেম ছিল। কিন্তু স্বামী সেবকের পালনপোষণ করিতেন এবং সেবক স্বামীকে ভক্তি করিতেন। উহা হনুমানের যুগে ছিল। হনুমান রামকে যে-ভক্তি করিতেন তাহা ছিল দাস্য-ভক্তি। আজ পৃথিবীতে সখ্যভক্তির ক্ষুধা খুব বেশী। ইহার অর্থ এই নহে যে, যিনি পূজ্য-পুরুষ তাঁহার প্রতি ভক্তি থাকিবে না। কিন্তু ভক্তির সঙ্গে-সঙ্গে এখন সমতার সম্বন্ধ থাকিবে। যখন যুদ্ধ আসিল তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন কি? আপনি আমার সারথি হউন এবং আমার অশ্বগুলির দেখাশুনা করুন।' এইরূপে অর্জুন তাঁহার পরম পূজ্য ব্যক্তিকে অশ্বসেবার কাজ দিয়াছিলেন। মিত্রতার সম্বন্ধ ছিল বলিয়া এরূপ করিয়াছিলেন।

"হনুমানের আমলে সমাজের গঠন এরূপ ছিল যে, শক্তিশালীব্যক্তি প্রভু হইতেন এবং সেবাপরায়ণ ব্যক্তি দাস হইতেন। প্রভু এবং দাসের মধ্যে প্রেম ও আদর থাকিত, কোনরূপ বিবাদ থাকিত না। কিন্তু সেইযুগে বিকাশের সীমা নির্দিষ্ট ছিল।

"রামচন্দ্র রাজারাম ছিলেন কিন্তু কৃষ্ণ রাজাকৃষ্ণ ছিলেন না। তিনি গোপালকৃষ্ণ ছিলেন, বন্ধুই ছিলেন। বর্তমান যুগে পরস্পরের মধ্যে যতই প্রেম থাকুক না কেন প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক উপযোগী বলিয়া মনে করা হয় না। মধ্যে এমন সময় আসিয়াছিল যখন স্বামী অত্যাচারী হইয়াছিল এবং সেবকের মনে স্বামীর প্রতি কোন শ্রদ্ধার ভাব ছিল না। আজ স্বামী-সেবকের সম্বন্ধ ভাল হইতে পারে, কিন্তু আজ যুগের দাবী হইতেছে সখ্য-ভক্তি। স্বামী-সেবকের সম্বন্ধ এইযুগে পর্যাপ্ত নহে।

"এই জন্য আমরা যখন দান চাহি তখন ইহা বলি না যে, 'আপনি শ্রেষ্ঠ, আপনি স্বামী, আপনি মালিক, আমাদিগকে দান দিন। আমরা আপনার সেবা করিব। আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।' আমরা তো ইহা বলি যে, সকলে ভাই-ভাই। আমি সম-অংশীদার। আমাকে আমার অংশ দিন। দানের অর্থ সম-বিভাজন, সমান বণ্টন। ইহা শঙ্করাচার্যের অর্থ। এইজন্য যখন কেহ আমাকে একশত একরের মধ্য হইতে দুই একর দান দেন

তখন আমি তাহা গ্রহণ করি না। যদি আমি দাসের মনোভাব লইয়া চাহিতাম, তবে দুই একরও গ্রহণ করিতাম এবং তাঁহাকে প্রণাম করিতাম, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতাম, তাঁহার উপকার মানিতাম। কিন্তু আজ আমরা সখার সম্বন্ধের ভিত্তিতে চাহিতেছি। আজকার সমাজ-গঠন সখ্যভাবকে মানিয়া লইবে। আজ গুরু-শিষ্য একে অন্যের মিত্র হইবে। একের অন্যের প্রতি প্রেম থাকিবে। গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিবেন এবং শিষ্যও গুরুকে শিক্ষা দিবেন। যাহার কাছে যাহা আছে তাহা অন্যকে দিবেন। উভয়ে উভয়ের উপকার স্বীকার করিবেন। এইভাবে সমতার সম্পর্ক স্বীকার করিয়া গুরু-শিষ্য থাকিবেন, মালিক-শ্রমিক থাকিবেন, স্বামী-সেবক থাকিবেন।

"একসময় ছিল যখন পত্নী পতিকে পতিদেব বলিয়া মনে করিতেন এবং নিজেকে দাসী বলিতেন। সেসময় খারাপ ছিল না। কিন্তু আজ আমরা একপদ অগ্রসর হইয়াছি। বর্তমান যুগের পত্নী পতিব্রতা হইবেন এবং পতি পত্নীব্রত হইবেন। একে অন্যকে দেবতা মনে করিবেন। যাঁহারা যোগ্যতা বেশী তিনি আদরণীয় হইবেন। যদি পতির যোগ্যতা বেশী হয় তবে পত্নী তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবেন এবং পত্নীর যোগ্যতা অধিক হইলে পতি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের সম্পর্ক হইবে সমানতার সম্পর্ক। ইহাকেই আমি সখ্য-ভক্তির যুগ বলিতেছি।"

বর্তমান যুগের এই পরিবর্তনের লক্ষণ আরও দুই-একটি পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে। পূর্বে বাঙ্গালী-পরিবারে ভ্রাতৃবধূকে কন্যাস্থানীয়া মনে করা হইত এবং ভ্রাতৃবধূ স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃসম জ্ঞান করিতেন, আর সেইমত পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন করিতেন। আজকাল আধুনিক রুচিসম্পন্ন বাঙ্গালী পরিবারে ভ্রাতৃবধূ স্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদরকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং স্বামীর জ্যেষ্ঠ সহদরও ভ্রাতৃবধূকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা বা ভক্তির অভাব হয় নাই, তবে আজ তাহা সখ্য-ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। আধুনিক রুচিসম্পন্ন গুজরাটী পরিবারে পুত্র বিশেষত বালক-বালিকা পিতাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। যথা—পিতার নাম 'মনুভাই'।

পুত্র পিতাকে সম্বোধন করে 'মনুভাই'। এখানে পিতা-পুত্রের মধ্যে প্রেমভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যুগের পরিবর্তনে উহার প্রকার ভেদ হইয়াছে মাত্র।

বিনোবাজী আরও বলেন—"যুগের দাবী অনুসারে আমাদিগকে সমাজ গঠন করিতে হইবে। আজ তো ইহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক যে, পুরাতন যুগের যেমূল্য ছিল তাহা ঠিক তেমনিভাবে আজ টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। তুলসী-রামায়ণের সময়ে যাহার যেমূল্য ছিল, আজকার যুগে সেই মূল্য আর থাকিবে না। সেইযুগে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু বর্তমান যুগের রামায়ণে কেবল ব্রাহ্মণই যে শ্রেষ্ঠ—ইহা মানা হইবে না। যিনি ভাল হইবেন তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবেন (কিন্তু সমতার সম্বন্ধ থাকিবে)।

"বর্তমান যুগে কারখানার মালিক এবং শ্রমিক থাকিবেন। একজনের বুদ্ধি অধিক অন্যের শারীরিক শক্তি অধিক। শ্রমিক ইহা বলিবেন না যে, 'আপনি মালিক এবং আমি আপনার চাকর'। এই সম্পর্ক আর চলিবে না। এখন তো উভয়েই অংশীদার হইবেন। বুদ্ধির জন্য মালিকের যে-পারিশ্রমিক মিলিবে, শারীরিক শক্তির জন্য শ্রমিকেরও সেই পরিমাণ পারিশ্রমিক মিলিবে। পারিশ্রমিক সমান হইলে, কিন্তু যাহার যোগ্যতা বেশী তিনি আদরণীয় হইবেন। একে অন্যের মিত্র হইবেন, সাথী হইবেন।

"বর্তমান যুগে ভাই-ভাই-এর, গুরু-শিষ্যের, পতি-পত্নীর সম্বন্ধ নূতন ঢঙে গঠিত হইবে। উহাতে এক নূতন রুচি আসিবে। পুরাতন যুগেও পারস্পরিক সম্পর্কে স্বাদ ছিল। কিন্তু এখন উহা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। পতি মহারাজ বিগড়াইয়া গিয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে করা হইয়াছে, এবং পত্নী সাধ্বী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার আদর নাই। যেখানে সম্বন্ধই খারাপ হইয়াছে সেখানে নূতন যুগের দাবী সম্মুখে আসিয়াছে।

"আজ যদি স্বয়ং রামচন্দ্রও পৃথিবীতে আসিয়া রাজারাম হইতে চাহেন আমরা তাহা স্বীকার করিব না। মহাত্মা গান্ধীও যদি আসেন আমরা তাঁহাকে রাজা গান্ধী করিব না। তিনি মহাত্মা গান্ধী রহিবেন। পুরাকালে ভাল রাজা ছিলেন, কিন্তু উহা অপেক্ষা অনেক বেশী খারাপ রাজা ছিলেন। পূর্বে

প্রজার বিকাশ সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ সময় আগাইয়া গিয়াছে। যেব্যক্তি সময়ের পরিবর্তন অনুসারে চলিতে শিখে না সেব্যক্তি হারও খায়, মারও খায়। প্রবাহের মধ্যে পড়িয়া যদি মানুষ সাঁতারও না দেয় তথাপি প্রবাহ তাহাকে আগে লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি সে প্রবাহের বিপরীত দিকে যাইবার চেষ্টা করে, তবে তাহার কিছু ব্যায়াম হইবে সত্য, কিন্তু সে অগ্রসর হইতে পারিবে না।

"মানুষ যতই বড় হউক না কেন তাহার পুরাতন প্রতিষ্ঠা ও আড়ম্বর আজ আর চলিবে না। আমাদের কাছে ইহার এক উদাহরণ আছে। পরশুরাম কত বড় মহান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বিরাট খ্যাতিও ছিল। তিনি একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। তিনি অবতার ছিলেন। কিন্তু যখন রামচন্দ্র আসিলেন তখন তাঁহার চিনিয়া লওয়া আবশ্যক ছিল যে নূতন অবতার আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহা চিনিলেন না এবং রামচন্দ্রের সহিত লড়াই করিতে অগ্রসর হইলেন। উহাতে তিনি পরাজিত হইলেন। পরশুরামের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ যুগের বিরুদ্ধে যাইয়া যখন টিকিতে পারিলেন না তখন অন্য কেহ টিকিবে কিরূপে? পুরাতন রীতি যতই ভাল হউক না কেন তাহা নূতন যুগে ভাল প্রতিপন্ন হইবে না।

"আজ যখন কর্মীদের সহিত আমার কথা হইয়াছিল তখন আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি যে, আমার এক-ষষ্ঠাংশ চাই ইহা যেন ট্যাক্স আদায় করা হইতেছে। আমি তো বিচার বুঝাইতেছি যে, জমি সম্পত্তি ও উৎপাদনের সাধনের উপর এখন সকলের সমান অধিকার। যুগের দাবীর কথা যেব্যক্তি বলিয়া থাকে তাহাকে লোকে উদ্ধত বলে। যদি উহাকে উদ্ধত বলিয়া মনে করা হয়, তবে সে উদ্ধত হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি যুগের ক্ষুধাকে চিনিয়া লওয়া হয়, তবে যাহারা চাহিতে আসিবে তাহারা নম্র হইয়া থাকিবে এবং ছোট বড়কে শ্রদ্ধা করিবে।"

পিতামাতার সহিত সন্তানের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বিনোবাজী বলেন—"লোকে বলে যে, আজকাল সন্তানেরা মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করে না। সন্তান তো বাল্যাবস্থা হইতেই মায়ের উপর পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখিয়া চলিয়া থাকে। মা যদি বলেন যে, উহা চাঁদ তবে ছেলে তাহা মানিয়া লয়।

ছেলে তখন ইহা বলে না যে, থাম, আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখি সত্যসত্যই চাঁদ কি না। এত শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও লোকে বলে যে, সন্তানেরা মা-বাপকে মানে না। আমি তো ইহা বলিব যে, মাতাপিতা যুগের প্রকৃতি বুঝেন না। মাতাপিতা সন্তানের সহিত সমানতার সম্বন্ধ রাখিয়া চলুন এবং সমতার ভিত্তিতে তাহাদিগকে স্নেহ করুন। তাহাদিগকে যেন মাতাপিতা হুকুম না দেন, পরামর্শ দেন। আজ্ঞা না দেন। প্রহারও না করেন। পূর্বেও মাতাপিতা প্রহার করিতেন এবং ভালবাসার ভাব লইয়াই প্রহার করিতেন। এ যুগে উহা আর চলিবে না। এইযুগে মাতা বলিবেন যে, আমি তোমাকে শাস্তি দিব না, আমি নিজেকে দণ্ড দিব, আমি উপবাসী থাকিব।

"সকলেরই আপন আপন বিশেষত্ব আছে। শ্রমিকের বুদ্ধি কম হইলেও তাহার হৃদয়বত্তা অধিক হইতে পারে। কাহারও জন্য সে মরণকে বরণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারে। আমাদের বুদ্ধি অধিক হইতে পারে, কিন্তু আমাদের দৈহিক দুর্বলতা আছে। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু-না-কিছু দুর্বলতা আছে আবার কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে। এইজন্য সমতার সম্বন্ধের ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে প্রেম থাকা চাই।"

এই দৃষ্টিতে যদি ভূদানযজ্ঞকে দেখা যায়, তবে ইহা যে এইযুগের দাবী তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। যদি ইহা যুগের দাবী না হইত, তবে গরীবেরা পর্যন্ত দান দিতেন না এবং ধনী লোকেরা বিনোবাজীকে বাধা দান করিতেন। তাই বিনোবাজী এ সম্পর্কে বলেন—"এই নব বিচার আমি আমার থলীর মধ্য হইতে বাহির করি নাই। যুগ-প্রবাহ হইতে আমি ইহা গ্রহণ করিয়াছি। এই বিচারধারাকে প্রসার করিবার দৃষ্টি লইয়া কাজ করুন—কেবলমাত্র কোটা পূর্ণ করিবার দৃষ্টিতে নহে। কেবলমাত্র কোটা পূর্ণ করিলে কাজ চলিবে না। যখন আপনারা জনগণকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন যে, সখ্য-ভক্তির যুগ আসিয়া গিয়াছে, তখনই আপনাদের কার্যে সফলতা লাভ হইল বলিয়া মনে করিবেন।"

সাম্যের স্বরূপ

বর্তমানের সমাজ-সংগঠন নিতান্ত বিকারগ্রস্ত। বিনোবাজী বলেন, উহা সংগঠন নহে, উহা বিধ্বংস। উহার সব চাইতে বড় ত্রুটি—বিরাট

বৈষম্য। এই বৈষম্য দূর করিয়া সমাজে সাম্য-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সাম্য কিরূপ হইবে? বিনোবাজী বলেন—"আমাদিগকে নূতন সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহার জন্য হাতের পাঁচ অঙ্গুলীর নিকট হইতে আমাদিগকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। এই অঙ্গুলীগুলি পুরাপুরি সমান নহে, আবার একেবারে অসমানও নহে। প্রত্যেক অঙ্গুলীর নিজের স্বাধীনতা আছে। উপরন্তু অন্য অঙ্গুলীর সহযোগিতা লইয়া প্রত্যেকে কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ঐভিত্তিতে আমাদিগকেও সমাজ রচনা করিতে হইবে—যাহাতে সেই নূতন সমাজে অত্যন্ত অসাম্য না থাকে অথচ অত্যন্ত সমানতাও না হয়। সেইসমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক-পৃথক ব্যক্তিত্ব থাকিবে, প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে এবং প্রত্যেকেই অন্যের সহযোগিতায় কাজ করিবে। ইহা বুঝাইবার জন্যই আমি দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।" সমাজে সাম্য-প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া আমাদিগকে বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা হাতের পঞ্চ-অঙ্গুলীর শিক্ষা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব। বিনোবাজী এক উদাহরণ দিয়া উহা বুঝাইয়াছেন। মাতা তাঁহার সন্তানদিগকে গণিতের হিসাবে সমান খাদ্য খাইতে দেন না। সবচাইতে ছোটকে শুধু দুধ খাইতে দেন। তার চাইতে বড়কে কিছু দুধ ও কিছু রুটি দেন এবং বড়কে শুধু রুটি দেন। ইহাই বিবেকযুক্ত সমতা। অহিংসার পথে সমতা আসিলে এইপ্রকার সমতা আসিবে। কিন্তু অন্য দেশে হিংসার পথে যে-সমতা আনয়নের চেষ্টা হইয়াছে সে-সমতা নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিনোবাজী বলেন—"ঐ প্রকার সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষুধা ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তি দেখিয়া উহার খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে হিংসার দ্বারা সমতা স্থাপন করা হইয়াছে সেখানে সকলকেই এক ছাঁচে ঢালা হইয়া থাকে। আমরা এই রকম সকলকে এক ছাঁচে ঢালা কখনও পছন্দ করিব না। আমরা বিবেকের দ্বারা সমতা আনিতে চাহিতেছি। আধ্যাত্মিক সমতা প্রতিষ্ঠা করা আমাদের লক্ষ্য।" আধ্যাত্মিক সমতার ভিত্তি হইতেছে—মালিকানার মোহ ত্যাগ। এ জমি আমার, এ গৃহ আমার, এ কৃষিক্ষেত্র আমার—এরূপ মোহ বিসর্জন দিতে হইবে। এইসব যাহা আমার রহিয়াছে তাহা সবই সকলের সেবার জন্য, আমি

উহার রক্ষক মাত্র। আমি ট্রাষ্টী মাত্র। এরূপ বিচারবোধ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তবেই সাম্যের আদর্শ সার্থক হইতে পারিবে। সম্পদ যাহা আছে তাহাতে যদি সকলের সংকুলান না হয়, তবে সকলেই কিছু-কিছু কম করিয়া ভোগ করিবে। একখানা রুটিতে পেট ভরে। আট জন লোক, কিন্তু আছে মোট ছয়খানা রুটি। একজনের তিনখানা, আরেকজনের দুইখানা এবং বাকী ছয়জনের কাছে মাত্র একখানা রুটি রহিয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্তন এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে সকলেই কিছু কম করিয়া খাইতে স্বীকৃত হয় এবং কেহ পৌনে একখানার বেশী না খায়। এরূপ সমতাত্মক মনোবৃত্তির একটি দৃষ্টান্ত বিনোবাজী দিয়াছেন—"এক তামিল সাধু ছোট কুঁড়ে ঘরের বাহিরে শুইয়া রাত্রি যাপন করিতেন। এক রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়ায় তিনি উঠিয়া ভিতরে গিয়া শুইলেন। তখন বাহির হইতে একজন দরজায় ধাক্কা দিল। সাধু বলিলেন—'ভাই এসো, ঘরে একজন শুইতে পারে কিন্তু দুইজন বসিয়া থাকিতে পারে।' তিনি তাঁহাকে ভিতরে লইলেন এবং উভয়ে বসিয়া রহিলেন। ইহার পর এক তৃতীয় ব্যক্তি বাহির হইতে দরজায় খট্ খট্ করিল। সাধু বলিলেন—'একজন শুইতে পারে, দুইজন বসিতে পারে, কিন্তু তিনজন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। অতএব এসো, আমরা তিনজনেই দাঁড়াইয়া থাকিব।' তাঁহাকেও তিনি ভিতরে আসিতে দিয়া তিনজনেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।" ভারতে সাম্যের এই আদর্শ গড়িয়া উঠিবে। এই-প্রসঙ্গে রুমীর মসনবীর এক গল্পের কথা মনে পড়ে।* এক ছিল সুফী। সে তার বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া দরজায় আঘাত করিল। বন্ধু বাড়ীর ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল—'Who is there?' (কে?) সুফী বন্ধু বলিল, 'I am' (আমি তোমার বন্ধু)। বন্ধুটি তখন উত্তর দিল, 'Begone: at my table there is no place for the two' (ফিরিয়া যাও বন্ধু, আমার টেবিলে দুইজনের স্থান হইবে না)। সুফী বন্ধু তখন মনে দুঃখ লইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু বিরহের

* 'বিশ্ববাণী'—কার্তিক, ১৩৫৯। পৃঃ ৩৯৫—'মন ও মানুষ' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

আগুনে তাহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছিল। তাই সে ভয় ও শ্রদ্ধা লইয়া ফিরিল এবং আবার তাহার বন্ধুর দরজায় আঘাত করিল। ভিতর হইতে আগের মতই শব্দ আসিল, 'Who is there?' (কে?)। সুফী উত্তর দিল, 'Thou beloved thou.' (হে প্রিয়তম. তুমি)। তখন দরজা খুলিয়া গেল এবং বন্ধু বলিল— 'Since thou art I, come in. there is no room for two I's in this room.' (তুমি যখন আমার সঙ্গে এক হইয়াছ, তোমার আমিত্ব যখন ঘুচিয়া গিয়াছে তখন ভিতরে আইস। কেননা আমার ঘরে দুইজন 'আমি'র স্থান নাই)।

শ্মশানের শান্তি

একস্থানে এরূপ আপত্তি করা হইয়াছিল যে, সেখানে শান্তি বিরাজ করিতেছিল কিন্তু বিনোবাজীর আন্দোলনের ফলেই স্থানীয় লোকের মনে ভূমিক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে এবং তাহাতে অশান্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। তাহাতে বিনোবাজী বলেন যে, সেশান্তি হইতেছে 'শ্মশানের শান্তি' এবং ঐরূপ শান্তির পরিবর্তে কোনরূপ অশান্তি ঘটিলে তাহা তিনি সহ্য করিয়া লইবেন। কারণ সুপ্ত জনতা অপেক্ষা জাগ্রত জনতা শ্রেয়ঃ।

বিফলতার প্রতিক্রিয়া

যদি ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন পূর্ণভাবে সফল না হয়, তবে জনসাধারণ তথা ভূমিহীনদের উপর উহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে তৎসম্পর্কে অনেকে চিন্তা ও আলোচনা করিতে আগ্রহশীল হন। কিন্তু এখন এই-বিষয়ের আলোচনায় বিশেষ কোন লাভ নাই, বরং ক্ষতির সম্ভাবনাই আছে। জ্বলন্ত বিশ্বাস লইয়া ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত একাগ্রচিত্ত হইয়া বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হয়। নতুবা পূর্ণ ফলোদয় হয় না। তাই বিফলতার সম্ভাবনার বিষয় চিন্তা ও আলোচনা করিলে তাহার প্রতিক্রিয়া অবসাদকর হইতে পারে। যাহা হউক এ-সম্পর্কে এইমাত্র বলা যায় যে, যেহেতু এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য শান্তির পথে মানুষের হৃদয়ে প্রতিবেশী-প্রেম জাগ্রত করা ও পরিবারের গণ্ডির বিস্তার সাধন করা, সেজন্য এই ধর্ম-

কার্য যতটুকুই সাধিত হউক না কেন উহার ফল ও প্রতিক্রিয়া ভালই হইবে। গীতার ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, এই মহান ধর্মকার্যের আরম্ভ-মাত্রও বিফলে যাইবে না। অল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও ইহা মহাভয় হইতে ত্রাণ করিবে।

কিন্তু এই আন্দোলনের বিফলতার প্রতিক্রিয়া স্বয়ং বিনোবাজীর উপর কিরূপ হইতে পারে সে-সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে। কৌতুহলী ব্যক্তিগণ মাঝে-মাঝে বিনোবাজীকে প্রশ্ন করেন, যদি ভূদানযজ্ঞ পূর্ণভাবে সফল না হয় তবে তিনি কি করিবেন? তাহার উত্তরে বিনোবাজী দুই-একবার এরূপ আভাস দিয়াছেন যে, তিনি সত্যাগ্রহ করিতে পারেন। সে-ক্ষেত্রে বিনোবাজী যে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিতে পারেন তাহার স্বরূপ ও প্রকৃতি কিরূপ হইবে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। ঐ সত্যাগ্রহ কিরূপ হইবে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন, "যদি ধনীদের হৃদয় না খুলে, তবে আমি আরও এক পদ অগ্রসর হইব। আজ যাহা করিতেছি তাহা হইতে একপা-ও অগ্রসর হইব না—এরূপ বন্ধন বা সীমারেখা আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়া রাখি নাই। আমার এরূপ বন্ধনের প্রতি বিশ্বাসও নাই। আমাদের প্রেমের শক্তি থাকা চাই। মা তাঁহার সন্তানদের জন্য কতই না ত্যাগস্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যখন দেখেন যে, তাঁহার সন্তান খারাপ পথে যাইতেছে এবং তাহাতে তাঁহার দুঃখ হইতেছে, তখন তিনি কি করেন? তিনি তো তখন সত্যাগ্রহ করেন। তিনি উপবাসী থাকেন ও নিজেই সন্তানকে বুঝাইতে থাকেন। অন্যকে দুঃখ না দিয়া নিজে দুঃখবরণ করা ও বুঝাইতে থাকা—ইহারই নাম সত্যাগ্রহ।" কিন্তু আজকাল চারিদিকে যেকোন ছোটখাট ব্যাপারেই সত্যাগ্রহের নামে যাহা করা হইয়া থাকে তাহা সেই 'সত্যাগ্রহ' নহে। সত্যাগ্রহের কথা শুনিয়া লোকের মনে যেন সেভুল ধারণার সৃষ্টি না হয়। তাহার প্রতিক্রিয়া আদৌ ভাল হয় না, উহাতে যাহাদের উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ করা হয় তাহাদের মনে প্রেমভাবের উদ্রেক হওয়ার পরিবর্তে বিরোধের ভাবই বরং বৃদ্ধি পায়। এই সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন —"সত্যাগ্রহের কথা তুলিয়া আমি ভীতি প্রদর্শন করিতেছি না। আমি জানি যে, সত্যাগ্রহের 'দুরুপয়োগ' হইয়া থাকে এবং আজকাল সচরাচর এরূপ

হইতেছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, আগ্রহপূর্বক সত্যের আচরণ করা চাই, যাহাতে আশেপাশের সকলের হৃদয় দ্রবীভূত হয়। ইহার জন্য যেকোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হওয়া সত্যাগ্রহ। এবং আমি ইহাও বিশ্বাস করি, যদি পৃথিবীতে একজন খাঁটি সত্যাগ্রহী থাকেন তবে তাঁহার প্রভাব সমগ্র পৃথিবীর উপর পড়িবে ও সারা পৃথিবীর হৃদয় দ্রবীভূত হইবে। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে সারা জগতের প্রতি প্রেম থাকা চাই।"

যেখানে উপবাসের ফলে সকলের হৃদয়ে প্রেমভাব জন্মে উহাই খাঁটি উপবাস। কিন্তু যাহাতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়, দ্বেষভাব ও বিরোধভাব আসে, সে উপবাস ভুল। যাঁহাদের উদ্দেশ্যে উপবাস করা হয় তাঁহাদের এরূপ লাগা চাই যে, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। অতএব সত্যাগ্রহের কথা শুনিয়া কাহারও ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। তিনি বলেন যে—"আমি আমার বিচারধারাকে সুস্পষ্ট করিবার জন্য সত্যাগ্রহের কথা উঠাইয়া থাকি। আর আমি ইহা মনে করি যে, দুই বৎসর যাবৎ যেকাজ চলিতেছে তাহা এক-রকমের সত্যাগ্রহই। সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আমি অধ্যয়ন করিয়াছি। তাই সত্যাগ্রহ কি তাহা আমি কিছু বুঝি। সত্যাগ্রহের অর্থ ইহা নহে যে, কোনও এক ব্যাপারে কাহারও বিরুদ্ধে কিছু করা। মাত্র ইহাই যে সত্যাগ্রহ—তাহা নহে। তাই যেসব কাজ চলিয়া আসিতেছে, যথা—পদব্রজে ভ্রমণ করা, গ্রামে-গ্রামে যাইয়া লোককে বিচার বুঝাইয়া দেওয়া, জমি চাওয়া—এই সমস্তও সত্যাগ্রহ।"

উগ্র সত্যাগ্রহ

কেহ কেহ মনে করেন যে, ভূমি-সমস্যা সমাধানের জন্য যদি অহিংস আন্দোলনের আশ্রয় লইতে হয়, তবে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যেরূপ সত্যাগ্রহ করা হইয়াছিল সেরূপ সত্যাগ্রহ ভূমির মালিকদের বিরুদ্ধেও অবলম্বিত হইবে না কেন। এরূপ ভিক্ষামূলক আন্দোলনে ক্রান্তি আসা সম্ভব নহে। তাঁহাদের এইকথার উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, স্বাধীনতা-আন্দোলনে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যে-সত্যাগ্রহ করা হইয়াছিল তাহা ছিল উগ্র সত্যাগ্রহ। কিন্তু পূর্বের আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট হইবে যে, বাহ্য

বলপ্রয়োগ না করিয়া কাহারও বিরুদ্ধে কিছু করাই যে একমাত্র সত্যাগ্রহ, এমন নহে। অন্যান্য প্রকারেও সত্যাগ্রহ করা চলে। কোন্ ব্যাপারে কোন্ অবস্থায় কিরূপ সত্যাগ্রহ অবলম্বন করা বিধেয় তাহাই বিচার্য বিষয়। স্বরাজ্য বা স্বাধীনতালাভের জন্য ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করা হইয়াছিল। গান্ধীজীর পূর্বে স্বরাজ্য বা স্বাধীনতা কংগ্রেসের কাম্য ছিল। পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে এবং স্বাধীনতা লাভ করা চাই—এই বিচার লোকের নিকট নূতন ছিল না। সুতরাং কোন চিন্তা-বিপ্লবের আবশ্যকতা সেখানে ছিল না। কেবলমাত্র প্রশ্ন এই ছিল যে, কোন্ কার্য-পন্থা অবলম্বন করিলে তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে। তাই সেইক্ষেত্রে ঐরূপ সত্যাগ্রহ যে উপযোগী ছিল ইহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু ভারতের ভূমি-সমস্যা সমাধানের জন্য এক অভিনব বিচারবোধ সমাজে জাগ্রত করিতে হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধের উপর বর্তমান সমাজ অধিষ্ঠিত। ইহার বিপরীত এক বিচার সমাজমানসে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ভূমি ভগবানের। ভূমিতে সকলের সমান অধিকার। শুধু তাহাই নহে, আমাদের যাহাকিছু, জগতের যাহাকিছু সবই ভগবানের। তাই সবই ভগবানকে অর্থাৎ সমাজকে অর্পণ করিয়া উদ্বৃত্ত কিঞ্চিৎ প্রসাদস্বরূপ ভোগ করিতে হইবে। এরূপ ক্রান্তিকারক বিচারবোধ প্রতিষ্ঠার পক্ষে কোনওরূপ উগ্র সত্যাগ্রহ সম্পূর্ণ নিষ্ফল। সুতরাং যদি প্রথমেই জমির মালিকদের বিরুদ্ধে বা ধনীদের বিরুদ্ধে উগ্র সত্যাগ্রহ অবলম্বন করা হইত তাহা হইলে উহা জবরদস্তি মাত্র হইত এবং উহাতে বিচার-প্রচার বা বিচার-প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইত না। উপরন্তু সমাজে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইত মাত্র, অন্য কোন ফলোদয় হইত না। বর্তমানে যে-পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে উহাও একপ্রকারের সত্যাগ্রহ। যদি বর্তমানের অবলম্বিত পন্থা পূর্ণভাবে সফল না-ও হয় তবুও উক্ত ক্রান্তিকারক বিচার যে সমাজের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। এইবিচার সমাজমানসে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর উক্ত বিচারমূলক কার্যে পূর্ণতার জন্য অন্যপ্রকারের সত্যাগ্রহ অবলম্বিত হইতে পারিবে। তবে তাহা কোনরূপ উগ্র সত্যাগ্রহ হইবে না।

সৌম্য, সৌম্যতর ও সৌম্যতম সত্যাগ্রহ

একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভূদানযজ্ঞে উগ্র সত্যাগ্রহের স্থান নাই এবং এখন যাহা করা হইতেছে—যেমন পদব্রজে ভ্রমণ করা, গ্রামে-গ্রামে যাইয়া বিচার বুঝানো ও প্রেমপূর্বক ভূমিদান চাওয়া—ইহাও সত্যাগ্রহ এবং সৌম্য সত্যাগ্রহ। যদি ইহা বিফল হয়, তবে পরবর্তী পন্থাস্বরূপ কি করা হইবে? বিহারে পদযাত্রার সময় বিনোবাজী এইপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বর্তমানে যাহা করিতেছেন তাহা হইতে এক পা-ও অগ্রসর হইবেন না—এমন নহে। অর্থাৎ বিফলতায় তিনি আরও এক বা একাধিক পা অগ্রসর হইতে পারেন। সেইপদক্ষেপ কি ধরণের হইতে পারে তাহার আভাস দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, মা যখন দেখেন তাঁহার সন্তান কু-পথে যাইতেছে তখন তিনি উপবাসী থাকেন এবং সন্তানকে বুঝাইতে থাকেন। অর্থাৎ সন্তানকে দুঃখ না দিয়া নিজে দুঃখবরণ করেন এবং সন্তানকে বুঝাইতে থাকেন। ইহা সত্যাগ্রহ এবং সৌম্য সত্যাগ্রহ। এতদিন তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই যে, সত্যাগ্রহের পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ অধিকাধিকভাবে সৌম্য হওয়া আবশ্যক—কিংবা পরবর্তী সত্যাগ্রহসমূহ সৌম্য, সৌম্যতর ও সৌম্যতম হইবে। কিন্তু পুরী সর্বোদয় সম্মেলনে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, আমাদের সত্যাগ্রহের মাত্রা উত্তরোত্তর অধিক সৌম্য করিতে হইবে। উহা সৌম্য হইতে সৌম্যতর, সৌম্যতর হইতে সৌম্যতম—এইভাবে অগ্রসর হইবে। এইভাবে তিনি সমগ্র সত্যাগ্রহ-শাস্ত্রের উপরই এক অভিনব আলোকসম্পাত করিয়াছেন। তাই সত্যাগ্রহের প্রকৃতি ও স্বরূপ কিরূপ হওয়া উচিত তাহা এখন খুবই পরিষ্কার হইয়াছে। হিংসার শক্তি নির্ভর করে উগ্রতার উপর। হিংসার প্রথম প্রয়োগ বিফল হইলে পরবর্তী প্রয়োগে উহার উগ্রতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। তবেই উহা অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকরী হইবে। অন্যদিকে অহিংসার শক্তি ও কার্যকারিতার উৎস হইতেছে সৌম্যতা। সৌম্যতার উপরেই উহার শক্তি নির্ভর করে। তাই অহিংসার প্রথম প্রয়োগ বিফল হইলে পরবর্তী প্রয়োগে উহা অধিকতর সৌম্য করা প্রয়োজন এবং প্রথম প্রয়োগে যদি কিছু উগ্রতা থাকিয়া যায় তবে তাহা নিষ্কাশিত করিতে হইবে। তাহা হইলে শক্তি ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হইবে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রে ঔষধের সূক্ষ্মতার উপর ঔষধের শক্তি নির্ভর করে। তাই প্রথম মাত্রা প্রয়োগ করিয়া যদি ভাল ফল না পাওয়া যায় তবে পরবর্তী মাত্রা প্রয়োগের সময় ঔষধের অধিকতর সূক্ষ্ম মাত্রার প্রয়োগ করিতে হয়। উহাতে ঔষধের শক্তির সঙ্গে কার্যকারিতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অহিংস-প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। 'তাই 'উগ্র সত্যাগ্রহ' পরিপূর্ণ আদর্শানুগ সত্যাগ্রহ নহে। পুরী সম্মেলনে বিনোবাজী বলিয়াছেন, "এখন সত্যাগ্রহ-শাস্ত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। যাঁহারা সত্যাগ্রহের কথা চিন্তা করেন তাঁহারা মোটামুটি ইহা মনে করেন যে, মানব-সমাজ ক্ষুদ্র-হিংসা হইতে বৃহৎ-হিংসা এবং বৃহৎ-হিংসা হইতে অতি-হিংসার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহারা মনে করেন যে, প্রথমে সৌম্য সত্যাগ্রহ করিতে হইবে। আমাদের এই পদযাত্রাকে আমি সত্যাগ্রহই মনে করি। লোকে বলে, হাঁ, ইহা সৌম্য সত্যাগ্রহ, কিন্তু ইহাতে ঠিকমত কাজ না হইলে তীব্র সত্যাগ্রহ করিতে হইবে। তাহাতেও কাজ না হইলে তীব্রতর সত্যাগ্রহের প্রয়োজন হইবে। এইভাবে তীব্রতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের চিন্তা ঠিক ইহার বিপরীত হওয়া আবশ্যক। আমরা যে-সৌম্য সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছি তাহাতে কাজ না হইলে, তাহা অপেক্ষা সৌম্যতর সত্যাগ্রহের অন্বেষণ করিতে হইবে, যাহাতে শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহাতেও কাজ না হইলে শক্তি আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য সৌম্যতম সত্যাগ্রহ করিতে হইবে। আপনারা জানেন, হোমিওপ্যাথি এই শিক্ষা দেয় যে, ঔষধ কর্ম মাত্রাতেই ব্যবহার করিতে হয়। বার-বার ডায়ালিউশান্ করিতে করিতে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়াই উহা অধিক ফলদায়ী হয়। হিংসার ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, সৌম্য-অস্ত্রে কাজ না হইলে তীব্র অস্ত্র ব্যবহারে শক্তিবৃদ্ধি হইবে এবং তাহাতে কাজ হইবে। হিংসার এই প্রক্রিয়া হইতে আমাদের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের দৃঢ় ধারণা থাকা চাই যে, আমরা যাহা করিতেছি তাহাতে কাজ না হইলে এবং তাহাতে প্রতিষ্ঠা না পাইলে আমাদের সৌম্যতাতেই ন্যূনতা রহিয়াছে এবং আমাদের সৌম্যতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ইহাই সত্যাগ্রহের স্বরূপ। স্বাধীনতালাভের জন্য যে-সত্যাগ্রহ অবলম্বন করা হইয়াছিল

তাহা ছিল চাপ প্রয়োগ করিয়া ইংরেজদের রাজশক্তি দূর করিবার 'নেগেটিভ্' কাজ। সেই সময় ও সেই অবস্থায় ভারতবর্ষ নিঃশস্ত্র হইয়া থাকিতে থাকিতে নিরাশায় ডুবিয়া গিয়াছিল। কিছুলোক ভ্রান্ত হইয়া এদিক-সেদিক কিছু ছোট-বড় হত্যাকান্ড করিতেছিল। তখন হয় হিংসার পথ গ্রহণ করা, না-হয় নিরাশ হইয়া বসিয়া থাকা—ইহাই ছিল সাধারণ মনোভাব। সেই অবস্থায় অহিংসার বিচার আসিল ও লোকে যতটা মাত্রায় পারিল তাহা গ্রহণ করিল। তাই সত্যাগ্রহের যে-প্রক্রিয়ার প্রয়োগ তখন করা হইয়াছিল তাহাই যে সত্যাগ্রহের পরিপূর্ণ রূপ একথা মনে করা ঠিক হইবে না। সেই বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে একরূপ প্রক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছিল। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর আজ যে-অবস্থা দেখা যাইতেছে এবং সারা জগতে আজ যে-শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহার সূক্ষ্মদর্শন লাভ করিয়া বুঝিতে হইবে যে, সত্যাগ্রহের মাত্রা আমাদিগকে উত্তরোত্তর অধিকতর সৌম্য করিতে হইবে। সৌম্য হইতে সৌম্যতর, সৌম্যতর হইতে সৌম্যতম এইভাবে যদি সত্যাগ্রহ অগ্রসর হয়, তবে তাহা অধিক কার্যকরী ও শক্তিশালী হইবে। তুলসীদাসকৃত রামায়ণে সুরসা রাক্ষসীর গল্প আছে। —"সুরসা নাম অহিনকী মাতা।" সুরসা হনুমানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এক যোজন হাঁ করিল। তাহা দেখিয়া হনুমান দুই যোজন হইয়া গেল। তখন সুরসা দুই যোজন হাঁ করিল। তাহা দেখিয়া হনুমান চার যোজন হইল। তখন সুরসার মুখ আট যোজন হইল। তাহাতে হনুমান ষোল যোজন হইল। তখন সুরসা "বত্তীশ ভয়উ"। সুরসার মুখও বত্রিশ যোজন হইল। হনুমান বুঝিতে পারিল যে, ইহার কাছে এইভাবে গুণন-ক্রিয়া করিতে থাকিলে কোন কাজ হইবে না। বত্রিশ হইলে চৌষট্টি হইবে। আর চৌষট্টি হইলে তাহার দ্বিগুণ একশত আটাশ হইবে। এরূপে বাড়িতে-বাড়িতে ইহার কোন অন্তই থাকিবে না। "নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স্" পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। ইহাতে কোন সার নাই। তখন "অতিলঘুরূপ ধরউ হনুমান"। হনুমান তখন অতিলঘুরূপ ধারণ করিল এবং সুরসার মুখের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার নাসারন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহাতে ব্যাপার চুকিয়া গেল। আমাদের বুঝিতে হইবে যে, যেখানে বিশাল সুরসা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া এটম-হাইড্রোজেন বম্-

রূপে মুখব্যাদান করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান, সেখানে আমাদিগকে অতি সূক্ষ্মরূপে ধারণ করিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং তাহার নাসারন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া আসিতে হইবে। আমি এই প্রেরণাই পাইতেছি।”

একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাস

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বিচারধারার সমগ্রতার সুস্পষ্ট ধারণা দিবার জন্য বিনোবাজী সত্যাগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন না যে, এই সত্যাগ্রহ করিবার প্রয়োজন হইবে। সকলের মনে, বিশেষত কর্মীদের মনে অনুরূপ বিশ্বাস থাকা চাই এবং এই বিশ্বাস অন্তরে সদা-জাগ্রত রাখিয়া কাজে অগ্রসর হওয়া চাই। সম্ভাবিত সত্যাগ্রহের কথা মনে রাখিলে তাঁহাদের একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাস নষ্ট হইবে এবং এই আন্দোলনের ক্ষতি হইবে। সন্তানের অসুখ হইলে, মা মনে করেন যে, তাঁহার সন্তান নিশ্চয় বাঁচিবে এবং এই বিশ্বাসেই তিনি চলিতে থাকেন। সন্তানের অবস্থা যতই খারাপ হউক তাঁহার ঐ বিশ্বাস অক্ষুণ্ণই থাকে। উহাতে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করা সুষ্ঠুভাবে হয়। সন্তান বিপথে যাইলে মা মনে করেন যে, তাঁহার সন্তান নিশ্চয় একদিন-না-একদিন সংশোধিত হইবে এবং বার-বার বিফলতায়ও তাঁহার সে-বিশ্বাস টলে না। তিনি সন্তানকে অবিরত বুঝাইতে থাকেন। বৃদ্ধ পিতার অসুখ হইয়াছে। পুত্র তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা ও ঔষধাদি খাওয়াইবার ভার লইয়াছে। যদি সে মনে করে বাবার বৃদ্ধ বয়স, বাবা না বাঁচিতে পারেন, এবং বাবার মৃত্যু হইলে খাটিয়া ও কাঠের প্রয়োজন হইবে বলিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে চেষ্টিত হয়, তবে বাবাকে ঔষধ ও পথ্য দিতে তাহার আগ্রহ কম হইবে। নিয়মিত ঔষধ খাওয়াইতে পুত্রের সবসময় খেয়াল থাকিবে না এবং তাহাতে বাবার মৃত্যুও আগাইয়া আসিবে। এইক্ষেত্রেও সেইরূপ। বিশেষত অহিংসার কাজে বিশ্বাস রাখা চাই-ই। নচেৎ তাহাতে সফলতার আশা করা দুরাশা।

সম্পত্তিদানযজ্ঞ

ভূদানযজ্ঞের সঙ্গে-সঙ্গে সম্পত্তিদানযজ্ঞ প্রবর্তনের কথা বিনোবাজী বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভূমি-সমস্যা হইতেছে বুনিয়াদী সমস্যা। ভূমি-সমস্যা সমাধানের জন্য তেলঙ্গানায় তখনই কিছু না করিলে এক বিপৎপাতের আশংকা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভূমি ভগবানের দান, উৎপাদনের মৌলিক সাধন। এইজন্যই গরীবের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা প্রথমে ভূমি-সমস্যায় সীমাবদ্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। অন্যদিকে ইহাও তাঁহার মনে হয় যে, সম্পত্তিদান ব্যতীত ভূমিদান সফল হইবে না। ভূদানযজ্ঞের সংকল্প পূর্ণ করা এককথা আর উহাকে সফল করা অন্যকথা। যাহারা জমি পাইবে তাহারা যখন সর্বোদয়-বৃত্তি গ্রহণ করিবে এবং আমাদের কর্মী হইয়া উঠিবে, তখনই ভূদানযজ্ঞ সফল হইবে। বিনোবাজী বলিয়াছেন —"পরন্তু আমি ভাবিলাম যে, প্রথম হইতে দুইটি ব্যাপার একসঙ্গে উঠানো ঠিক নহে। এবং উভয় কাজ একসঙ্গে আরম্ভ করিবার ইঙ্গিতও আমি পাই নাই। যদি বিনা ইঙ্গিতে কোনকাজ হাতে লই, তবে উহা অহংকার হইবে। উহা হইতে কোন ফল হইবে না এবং আমার যেশক্তি আছে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সেইসময় কেবলমাত্র ভূদানের ইঙ্গিতই আমি পাইয়াছিলাম।" কিন্তু ভূদানযজ্ঞের কাজ যখন অগ্রসর হইতে থাকিল তখন ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে লাগিল যে, ভূমির সঙ্গে-সঙ্গে অর্থের অংশ না চাহিলে আন্দোলনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যখন তিনি বিহারে পদার্পণ করিলেন তখন সম্পত্তিদানযজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করিলেন এবং যে সম্রাট অশোক ভগবান বুদ্ধের বিচারকে রূপদান করিয়াছিলেন তাঁহারই পাটলীপুত্র শহরে ১৯৫২ সালের ২৩শে অক্টোবর তারিখে, বিনোবাজী সম্পত্তিদানযজ্ঞ ঘোষণা করিলেন ও আয়ের এক-ষষ্ঠাংশ সম্পত্তিদানযজ্ঞে দান দিবার জন্য আবেদন জানাইলেন। নিজের পরিশ্রমের দ্বারা ধন-অর্থ উপার্জন করা হইলেও উহা কেবল নিজের জন্য নহে। পরন্তু সকলের ভোগের জন্য ভগবান উহা অর্পণ করিয়াছেন। যে-বুদ্ধি, শক্তি ও পুরুষার্থের সাহায্যে ঐ ধন উপার্জন করা হইয়াছে তাহা পরমেশ্বরেরই দান। ধন-অর্থ চাওয়ার পশ্চাতে এই ভাবধারা রহিয়াছে।

সম্পত্তিদানযজ্ঞে 'সম্পত্তি' শব্দের অর্থ কি তাহা জানা প্রয়োজন। এখানে 'সম্পত্তি'-শব্দ হিন্দী-শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাংলাভাষায় 'সম্পত্তি' বলিতে ভূমিসমেত অন্যান্য সমস্ত ধন-সম্পত্তিও বুঝায়। হিন্দীতে 'সম্পত্তি' শব্দের অর্থ ধন-দৌলত বা টাকা-পয়সা, কিন্তু ভূমি নহে। অতএব সম্পত্তিদানের অর্থ ধনদান, অর্থদান, আয়দান ইত্যাদি। সম্পত্তিদানযজ্ঞে আয়ের এক-ষষ্ঠাংশ চাওয়া হইয়াছে। এই যজ্ঞের মারফৎ কোনও একটি ধনভাণ্ডার সংগ্রহ করিবার কল্পনা নাই। কিরূপ মনোভাব লইয়া সম্পত্তি-দানযজ্ঞে দান দেওয়া কর্তব্য ও উহা কি পদ্ধতিতে পরিচালনা করা উচিত তাহা বুঝাইয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন—"যেব্যক্তি নিত্যজীবনের বিচার উপলব্ধি করিয়া সম্পত্তিদান করিবেন তাঁহারেই সম্পত্তির ব্যবহার আমরা করিতে চাই। কাহারও উৎসাহবশে সম্পত্তিদান করিবার কথা নহে, পরন্তু উহা চিন্তা করিয়া, বিচার করিয়া করিবার কথা। বর্তমান বর্ষে ব্যক্তিগতক্ষেত্রে উহাকে সীমাবদ্ধ রাখিবার কথা আমি ভাবিয়াছি। যিনি সম্পত্তিদানকে নিত্য-ধর্ম-স্বরূপ মনে করিবেন তাঁহারই দান স্থায়ী হইবে। উহা সহজ ধর্ম হওয়া চাই। ইহাতে ভারবোধ যেন না হয়। আমাদের শরীরের ওজন যদি ঠিক পরিমাণ মত হয় তবে উহার বোঝা অনুভূত হয় না। সেইরূপ সম্পত্তিদানযজ্ঞে সহজ দান হওয়া চাই। ঘরে শিশু জন্মিলে সে পান-আহার করে, কিন্তু তাহার বোঝা অনুভূত হয় না। গার্হস্থ্য-জীবনে উহা সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ—এইরূপ মনে করা হয়। উহাতে সকলের আনন্দ হয়। সেইরূপ সম্পত্তিদানযজ্ঞে যিনি দান দিবেন তাঁহার আনন্দ হওয়া চাই। এইজন্য সম্পত্তিদানযজ্ঞ ব্যক্তিগত-ভাবে চালাইবার কাজ—অন্তত এই বৎসর পর্যন্ত। আগামী বৎসরের কথা পরে চিন্তা করা যাইবে।" তিনি বলেন—"যিনি দিবেন তিনি যেন সারা জীবনের জন্য দেন। একবার দান দিলে সারা জীবনের জন্য দিতে হইবে—এই বিচারের মর্ম অনেকে উপলব্ধি করেন না। কিন্তু তাঁহারা একথা চিন্তা করেন না যে, একবার বিবাহ করিলে তাহার দ্বারা সারা জীবনের বন্ধন হইয়া যায়।" সম্পত্তিদানযজ্ঞ কেন প্রথম হইতে আরম্ভ করা হয় নাই ও কেন উহার উপর এখনও জোর দেওয়া হয় নাই সেসম্পর্কে বিনোবাজী অন্যত্র বলিয়াছেন—"গঙ্গার চাইতে যমুনা ছোট, কিন্তু যমুনা গঙ্গায় মিলিত

হইয়াছে। তেমনি আজ সম্পত্তিদানযজ্ঞ যমুনার মত। ভূমি যেমন উৎপাদনের অনিবার্য সাধন, টাকা-পয়সা সেরূপ অনিবার্য সাধন নহে। টাকা-পয়সা তো মোহময় সাধন। টাকা-পয়সার কোন মূল্যই নাই। উহা তো নাসিকের প্রেসে তৈয়ারী হয়। কিন্তু কোন প্রেস ভূমি তৈয়ারী করিতে পারে না। এইজন্য ভূমির সঙ্গে টাকা-পয়সার তুলনা হইতে পারে না। অর্থশালীদের অর্থকে আমরা মূল্যহীন করিয়া দিতে পারি। তাই ভূমির তুলনায় ধন-দৌলত বহুগুণ গৌণ। ভূমি বুনিয়াদী। এই চিন্তা করিয়া আমরা ভূমিসমস্যায় প্রথমে হাত দিয়াছি। সম্পত্তিদানযজ্ঞের উপর এখন এইকারণে বেশী জোর দিতেছি না যে, উহা এমন একটি চারা গাছ যাহার শীঘ্র উদ্ভেদ হয়, কিন্তু যাহা আবার শীঘ্র শুকাইয়া যায়।"

বিনোবাজী অর্থ গ্রহণ করেন না। অথচ এখন তিনি অর্থ চাহিতেছেন; এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কিভাবে করা যায়? বিনোবাজী দাতার নিকট হইতে অর্থ নিজের হাতে লইবেন না। উহা দাতারই নিকট থাকিবে এবং দাতা বিনোবাজীর নির্দেশ অনুসারে উহা ব্যয় করিয়া তাহার হিসাব বিনোবাজীকে দিবেন। এইসম্পর্কে তিনি তাঁহার আবেদনে বলিয়াছেন—"আমি ঐ অর্থ নিজের হাতে লইব না এবং উহা রাখিবার দায়িত্বও লইব না। উহা খরচ করিবার বা উহার হিসাব রাখিবার দায়িত্বও আমি গ্রহণ করিব না। ইহা হইতে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিব। জনসাধারণের উপকারার্থে যেঅর্থ সংগ্রহ করা হয় তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য সাধারণত ট্রাষ্ট সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। আমি সেরূপ ট্রাষ্ট গঠন করিবার কল্পনাও করিতেছি না। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সংগৃহীত ফাণ্ড ও এই সম্পত্তিদানযজ্ঞের মধ্যে একটি গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। তাহা এই যে, আয়ের একটি অংশ প্রতি বৎসর এইযজ্ঞে আহুতি দিতে হইবে। এজন্য আমি স্থির করিয়াছি যে, দাতার কাছেই এই অর্থ রাখা হইবে। তিনি আমার নির্দেশ অনুসারে উহা ব্যয় করিবেন এবং তাহার হিসাব প্রতিবৎসর আমার কাছে পাঠাইবেন। ইহার অর্থ এই যে, দাতা কেবলমাত্র তাঁহার ধন-অর্থের একাংশ দিয়া মুক্তি পাইবেন না। পরন্তু ব্যয়ের ব্যাপারেও তাঁহার বুদ্ধি খাটাইতে হইবে। ইহা সত্য যে, আমার অভিপ্রায় অনুসারে দাতাকে তাঁহার প্রদত্ত অর্থ বিনিয়োগ করিতে

হইবে। কিন্তু এইসম্পর্কে তাঁহার নিজের অভিপ্রায় কি তাহা তিনি আমাকে জানাইতে পারিবেন।”

এইব্যাপারে দাতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। সমালোচকেরা এইব্যবস্থায় দোষ দেখিতে পারেন। তাই বিনোবাজী বলিয়াছেন—“কিন্তু বিশ্বাসই ধর্মপ্রেরণার আধার। মানুষকে বিশ্বাস করিলে তাহার সততা সম্বন্ধে যতটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কোনরূপ আইনের বন্ধনের দ্বারা তাহা সম্ভব হয় না। এই দৃষ্টিতে সম্পত্তি-দানের এইরীতি আমি স্থির করিয়াছি।”

এইপ্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর ‘ট্রাষ্টীশিপ থিয়োরী’র কথা মনে উদিত হয়। মহাত্মা গান্ধী ধনীদিগের উদ্দেশ্যে বলিতেন—‘দেখ ধনিক, তোমার হাতে যেধন-সম্পত্তি সঞ্চিত হইয়াছে তাহার মালিক তুমি নহ। তাহা সকলের। তাহা দরিদ্রের। দরিদ্রের ধন ভগবান তোমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন। তুমি দরিদ্রের ট্রাষ্টী। অতএব তুমি তোমার ধন-সম্পত্তি দরিদ্রদের হিতার্থে বিনিয়োগ কর।’ মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাস করিতেন যে, একদিন ধনীরা শুভ-বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া তাঁহাদের ধন-সম্পত্তি দরিদ্রের কল্যাণের জন্য বিনিয়োগ করিবেন। উহা মহাত্মা গান্ধীর ট্রাষ্টীশিপ থিওরী (বিশ্বস্ত বৃত্তি) বলিয়া আখ্যাত হয়। উহার মধ্যেই ভূদানযজ্ঞ ও সম্পত্তিদানযজ্ঞের বীজ নিহিত ছিল। সম্পত্তিদানযজ্ঞ ও ভূদানযজ্ঞের দ্বারা গান্ধীজীর ট্রাষ্টীশিপ থিওরীর (বিশ্বস্ত বৃত্তির) প্রয়োগ করা হইতেছে। ট্রাষ্টীকে কোনও ক্ষতিপূরণ দিবার প্রশ্নই উঠে না। যিনি ট্রাষ্টী, ট্রাষ্ট-সম্পত্তি তো তাঁহার বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। উহা নিজের করিয়া রাখা চলে না। ট্রাষ্টীও আমাদের ভাই। তাঁহার জীবন নির্বাহের জন্য কিছু পাওয়াও চাই। তাই ভূদানযজ্ঞ বা সম্পত্তিদানযজ্ঞে পুরা ভূমি চাওয়া হয় না। দরিদ্রনারায়ণের ভাগই চাওয়া হইয়া থাকে। তখন লোকে ট্রাষ্টীশিপ থিওরীর কথায় উপহাস করিত। আজ তাহার সফলতা মানুষ প্রত্যক্ষ করিবে। বিনোবাজী ‘ট্রাষ্টীশিপ্’ শব্দ ব্যবহার করিবার পক্ষপাতী নহেন। তবে ট্রাষ্টীশিপের ভাবধারা যাহা সম্পত্তিদানযজ্ঞে নিহিত রহিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—“ভূমিদানের মত একবার দান দেওয়ার ব্যাপার ইহা (সম্পত্তিদান)

নহে। ইহাতে প্রতি বৎসর আয়ের এক অংশ দিতে হইবে। অতএব উহার জন্য জীবনকে নৈষ্ঠিক করিয়া তোলা প্রয়োজন। ইহাতে অন্তরের নিষ্ঠার বিকাশ হওয়া চাই। যখন ভরত রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে-ছিলেন তখন তাঁহার অন্তর এইভাবে পূর্ণ ছিল যে, কখন রামের সহিত মিলিত হইবেন। কিন্তু তিনি কিছুক্ষণের জন্য থামিলেন। রাজ্যের তত্ত্বাবধায়কগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'আমি রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। এইজন্য সে-অবধি আপনারা রাজ্য ঠিকমত পরিচালনা করুন।' তুলসীদাস লিখিতেছেন যে, ভরত এত উদারচেতা হইয়াও ইহা করিলেন, কেননা সকল সম্পত্তি রামের। এইজন্য তাহার ঠিকমত তত্ত্বাবধান করা ভরতের কর্তব্য। যেমন গান্ধীজী বলিতেন যে, নিজেদের সম্পত্তির ট্রাষ্টী হইয়া আমাদের থাকা উচিত। ট্রাষ্টী কথাটি আধুনিক। উহার বহু অপ-প্রয়োগ হইয়াছে। এইজন্য আমি ট্রাষ্টী-শব্দ ব্যবহার করি নাই। কিন্তু গান্ধীজী ট্রাষ্টী-শব্দ ব্যবহার করিতেন, কেননা তিনি আইনজ্ঞ ছিলেন। এইজন্য ঐ শব্দের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল। অতটা আকর্ষণ আমার নাই। আমি এইবিচার উপনিষদের ভাষায় প্রকাশ করিতে চাই। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—যাহা ভোগ করিতে হইবে তাহা ত্যাগ করিয়াই ভোগ করা চাই। তুলসীদাসজীও বলিয়াছেন যে, সব সম্পত্তি রঘুবরের। অতএব এক-ষষ্ঠাংশ দেওয়া গৌণ। নিজের সমস্তই সমাজকে দেওয়া প্রয়োজন। নিজের শরীরের প্রয়োজনের জন্য তাহা হইতে কিছু গ্রহণ করিতে পারা যায়মাত্র। কিন্তু এখন সমাজের মধ্যে এইপ্রকারের ব্যবস্থা নাই এবং শীঘ্র তাহা করাও যাইবে না। এইজন্য এখন এক-ষষ্ঠাংশ দিতে হইবে এবং বাকী যাহা থাকিবে তাহা হইতে আরও কিছু দেওয়ার জন্য ভাবিতে হইবে। ষষ্ঠাংশ দান দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, সারাজীবনের মত নিশ্চয় করিয়া উহা দিতে হইবে। যদি অতটুকু অংশ না দেওয়া যায়, তবে আমরা পাপী বিবেচিত হইব এবং আমাদের জীবনও পাপময় হইয়া উঠিবে। এইজন্য সম্পত্তিদান দেওয়া কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।"

যাঁহারা সম্পত্তিদানযজ্ঞে দান করিতে চান তাঁহারা যেন তাঁহাদের পরিবারস্থ সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং এইবিষয়ে সকলের সন্তোষ

সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে দান করেন। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"এখন এখানে যেসব ভাই বসিয়া আছেন তাঁহাদের অন্তরে যদি ধর্ম-ভাব আসিয়া থাকে, তবে তাঁহারা নিজেদের ঘরের সকলের সঙ্গে—মাতা, পত্নী এবং সন্তানদের সঙ্গে কথা বলিয়া সম্পত্তিদান দিতে পারেন। এইকাজের জন্য তাঁহাদের পরিবারস্থ সকলের অত্যন্ত আনন্দ অনুভব হওয়া চাই। তাঁহাদের এইরূপ লাগা চাই যে, তাঁহারা যেন আজ মিষ্ট আম ভক্ষণ করিয়াছেন এবং উহার মধুরত্বের আস্বাদ পাইয়াছেন। সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ দেওয়াতে তাঁহাদের খুবই আনন্দ হওয়া চাই। তাঁহাদের হৃদয় নৃত্য করিতে থাকিবে। কোনপ্রকারের চাপে পড়িয়া দেওয়া অথবা লজ্জায় অথবা ভয়ে দেওয়া উচিত নহে। কেননা সারা জীবন ধরিয়া পঞ্চমাংশ বা ষষ্ঠাংশ ত্যাগ করিতে হইবে।"

ভূদানযজ্ঞে ভূমিদান লওয়া হয় এবং সেইভূমি ভূমিহীনকে দেওয়া হয়। ভূমি কোন ভোগ্য দ্রব্য নহে। উহা উৎপাদনের সাধন (উপায়) এবং মৌলিক সাধন। উহাতে হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করিলে তবে ভোগ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়। আবার দানপ্রাপ্ত ভূমি ভূমিহীনকে যে দেওয়া হয়, তাহা যেকোনও ভূমিহীনকে দেওয়া হয় না। যে ভূমিহীন দরিদ্র চাষ করিতে জানে ও চাষ করিয়া জীবিকা উপার্জন করিবে এবং যাহার অন্যকোন জীবিকা নাই মাত্র তাহাকেই ঐ ভূমি দেওয়া হয়। ভূদানযজ্ঞে যে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে চায় তাহার নিকট হইতে নগদ অর্থ লওয়া হয় না। তাহাকে চাষের যন্ত্র ও সরঞ্জামাদি খরিদ করিয়া দিতে হয়। সুতরাং ভূদানযজ্ঞের মূলগত উদ্দেশ্য—উৎপাদনের সাধন (উপায়) উৎপাদকের হাতে আনিয়া দেওয়া, অর্থের প্রতিষ্ঠার বিলোপ সাধন করা ও উৎপাদক-শ্রমের প্রতিষ্ঠা সৃজন করা। কিন্তু সম্পত্তিদানযজ্ঞে এরূপ কোন ক্রান্তিকারক উদ্দেশ্য আছে বলিয়া আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় না। সম্পত্তিদানযজ্ঞে অর্থ দান লওয়া হয়—যদিও ঐ অর্থ দাতার হাতে থাকিয়া যায়। অর্থ উৎপাদনের সাধন নহে। উহা উপভোগ্য দ্রব্যাদি খরিদ করিবার মাধ্যম। উপরন্তু একজন বড় কারখানার মালিক যিনি শ্রমিকদিগকে শোষণ করিয়া অর্থ উপার্জন করেন, তিনি তাঁহার এক-ষষ্ঠাংশ আয় সম্পত্তিদানযজ্ঞে দান করিলেন; কিন্তু তাঁহার শ্রমিক-শোষণ

ও উক্ত কলকারখানা সমানভাবেই চলিতে থাকিল। এরূপ দান গ্রহণ করা হইলে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বজায় রাখার পক্ষে পরোক্ষভাবে সম্মতিদানই করা হয়। এক নর্তকী, এক বেশ্যা, এক মাদকদ্রব্য বিক্রেতা—তাহাদের উপার্জনের এক-ষষ্ঠাংশ করিয়া দান করিল; কিন্তু তাহাদের উপার্জনের পথ তাহারা ত্যাগ করিল না। ইহাতেও তাহাদের উপার্জনের পন্থায় পরোক্ষ-ভাবে সম্মতি দেওয়া হয়। এই অবস্থায় বিনোবাজীর এই নূতন আন্দোলনের অর্থ কি? 'সর্বোদয়'-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীদাদা ধর্মাধিকারী তাঁহার সম্পত্তি-দানযজ্ঞ সম্পর্কীয় এক সুচিন্তিত প্রবন্ধে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন এবং উহাতে তিনি উহার সদুত্তরও প্রদান করিয়াছেন। দানকৃত অর্থের বিনিয়োগ বিনোবাজীর নির্দেশ অনুসারে দাতাকে করিতে হইবে। ইহার মধ্যেই সম্পত্তিদানযজ্ঞের ক্রান্তিকারক গতি নিহিত রহিয়াছে। কারখানার মালিক যদি দাতা হন, তবে বিনোবাজী তাঁহাকে নির্দেশ দিতে পারেন যে, উক্ত অর্থের দ্বারা কারখানার শ্রমিকদের অধিকাধিক স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে এই উপদেশও দিতে পারেন যে, তিনি এমনভাবে চলিবেন যাহাতে ক্রমে-ক্রমে ঐ কারখানা বিনোবাজীর হাতে সঁপিয়া দিতে পারেন। কোন মহাজন-দাতাকে এই নির্দেশ দিতে পারেন যাহাতে দাতা চাষের বা অন্যরূপ উৎপাদনের সরঞ্জামাদি ঐ অর্থে খরিদ করিয়া উৎপাদককে দান করেন। সেইসঙ্গে বিনোবাজী দাতাকে ইহাও বলিতে পারেন 'আপনার এই উপার্জন পাপময়। এই উপার্জন ক্রমে-ক্রমে বন্ধ করিবার চেষ্টা করুন।' যেকোন অনুৎপাদক-দাতাকে ঐভাবে উৎপাদনের সহায়কপ্রচেষ্টায় নিয়োজিত করিয়া তাঁহার অনুৎপাদক ব্যবসায় বিসর্জন দিবার জন্য প্রেরণা দান করিতে পারেন। এইভাবে বিনোবাজী যখন দানকৃত অর্থ বিনিয়োগের জন্য নির্দেশ দান করিতে থাকিবেন তখন হইতে এই নূতন আন্দোলনের উদ্দেশ্য ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে থাকিবে।

অপরিগ্রহ ও অস্তেয়ের অনুসরণ ব্যতীত অর্থনৈতিকক্ষেত্রে অহিংস বিপ্লব অর্থাৎ অর্থনৈতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। তাই সম্পত্তিদান-যজ্ঞের মূল বিচারধারা অপরিগ্রহ ও অস্তেয়ের ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। উহার ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—'অস্তেয়' ও 'অপরিগ্রহ' উভয়ে

মিলিত হইলে অর্থ-শুচিত্ব পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে ধর্মের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নহে। সত্য ও অহিংসা তো মূল, কিন্তু আর্থিকক্ষেত্রেও এই দুইয়ের আবির্ভাব কেবলমাত্র অস্তেয় ও অপরিগ্রহের মধ্যমে হওয়া সম্ভব। আর আর্থিকক্ষেত্র জীবনের এক খুব বড় অংশ। এইজন্য ধর্মশাস্ত্র উহাকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। পরন্তু উহা নিয়মন ও নিয়োজন করিবার দায়িত্ব ধর্মবিচারের উপর আসিয়া পড়ে। তাই মনু বিশদভাবে বলিয়াছেন—"যঃ অর্থশুচিঃ স শুচিঃ"। অর্থাৎ যাঁহার জীবনে আর্থিক শুচিতা সাধিত হইয়াছে তাঁহার জীবনে শুচি আসিয়াছে।

"অস্তেয় অর্থ-প্রাপ্তির পদ্ধতির নিয়মন করিয়া থাকে এবং অপরিগ্রহ উহার মাত্রার নিয়মন করে। অস্তেয় বলে যে, প্রধানত শরীর-শ্রমের দ্বারা অর্থাৎ উৎপাদক-শ্রমের দ্বারা শরীর নির্বাহ হওয়া চাই। শরীর-শ্রম ব্যতীত যদি আমরা অন্ন গ্রহণ করি, তবে আমরা এক বিপদ সৃষ্টি করিয়া থাকি। শরীর-শ্রম করিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি কোনব্যক্তি কোনরূপ শরীর-শ্রম করিতে না পায়, তবে অন্যদিকে তাহার খুব কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। তবেই সেই বিপদ্ দূর হইবে। ঐ পরিশ্রম এরূপ শক্ত হইবে, অর্থাৎ উহা এতই তপস্যায় ভরা হইবে যে, উহার তুলনায় শরীর-শ্রম কম কষ্টসাধ্য হইত অর্থাৎ সাধারণ লোকের পক্ষে অস্তেয় পালন তখনই সম্ভব হইবে যখন যাহার শরীর-ক্ষুধা আছে সে শরীর-শ্রম করিবে। পৃথিবীতে আজিকার বহুতর বৈষম্য, বহুতর দুঃখ-কষ্ট ও বহুতর পাপের হেতু হইতেছে শরীর-শ্রম না করিবার অভিলাষ। শরীর-শ্রম হইতে বিরক্ত থাকা যাহার সংকল্প সেব্যক্তির গুপ্ত অথবা প্রকাশ্যভাবে চুরি করিতে হয়।

"শরীর-শ্রমের দ্বারা যে-উৎপাদন হইবে কেবলমাত্র তাহাই ব্যবহার করিবে—এই নিয়ম যদি আমরা মানিয়া চলি, তবে তদ্দ্বারা অপরিগ্রহ বহু-পরিমাণে সিদ্ধ হইবে। কারণ শরীর-শ্রমের দ্বারা এত অত্যধিক উৎপাদন হইতে পারে না যাহার দ্বারা মানুষ বহুসংগ্রহ করিতে পারিবে। তথাপি অস্তেয় হইতে পৃথকভাবে অপরিগ্রহের নিয়মনের প্রয়োজনীয়তা থাকিয়া যায়। কারণ যদিও শরীর-শ্রমের দ্বারা উৎপাদন অত্যধিক হইতে পারে না, তথাপি উৎপাদন অধিক হওয়া সম্ভব। এবং যদি সেই অধিক উৎপাদনের

ব্যবহার অপরিগ্রহের দ্বারা করা না হয়, তবে বিপদ সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয় না। বাল্যকাল হইতে আমরা অনেকের উপকার গ্রহণ করিয়াছি। ঐ উপকারের ঋণ পরিশোধের জন্য শরীর-শ্রমের মান্য-পন্থায় আমরা যাহা উপার্জন করিয়াছি, উহার অংশ সমাজকে প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। উহাতে সম্যক বিভাজনের উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। তাই যদিও উহা একরূপ ঋণমুক্তি তথাপি উহাতে দানের স্বরূপ রহিয়াছে।"

সম্পত্তিদানযজ্ঞে আয়ের (বা ব্যয়ের) এক-ষষ্ঠাংশ চাওয়া হয়। তাহা হইলে পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ যাহা থাকে তাহা মানিয়া লওয়া হয় না কি? উহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন যে, উহা মান্য করিবার প্রশ্নই আসে না। দাতা তো ছয়-ষষ্ঠাংশেরই সংগ্রহ মানিতেছিলেন। এক-ষষ্ঠাংশ চাহিয়া তাঁহার সেই মানাকে ধাক্কা দেওয়া হইতেছে। বিচার বুঝিয়া লইবার জন্য তাহাকে প্রেরণা দান করা হইতেছে। ভক্ত বলেন, যিনি একবার হরিনাম করিয়াছেন তিনি মোক্ষ-প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। যিনি এক-ষষ্ঠাংশ সমাজকে যাবজ্জীবন অর্পণ করিবার নিয়ম এক জীবন-নিষ্ঠাস্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তিনি নিজের সমস্ত সম্পত্তি, নিজের সারা জীবন, এমন কি নিজের শরীর নির্বাহ পর্যন্ত সমাজকে অর্পণ করিবার পথে পদার্পণ করিয়াছেন। ইহাই ধর্মনীতি। ধর্ম আসক্ত মানুষকে আসক্তি ত্যাগ করিবার দীক্ষাদানের পর একটু-একটু করিয়া আসক্তি ত্যাগ করাইয়া মোক্ষের দিকে অগ্রসর করাইয়া দেয়। তাই ভোগ ও মোক্ষের মধ্যে ধর্ম সেতুস্বরূপ কাজ করে। ধর্মনীতির এই বিচারধারা হৃদয়ঙ্গম করিলে এক-ষষ্ঠাংশ চাহিবার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিতে পারা যায়। ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন—"শরীর ও আত্মার মধ্যে, অথবা ব্যবহার ও তত্ত্ববিচারের মধ্যে, অথবা বর্তমান স্থিতি ও প্রাপ্তব্য স্থিতির মধ্যে ধর্ম সেতুস্বরূপ কাজ করিয়া থাকে। সেতু নদীর একপারে খাড়া করা যায় না। পরন্তু উহা নদীর দুই পারেই খাড়া হইয়া থাকে। ভোগ এপারের, মোক্ষ ওপারের, আর ধর্ম উভয় পারের। সমাজের বর্তমান অবস্থায় উহাকে আদর্শের অভিমুখে লইয়া যাওয়ার জন্য যে-বিচার প্রস্তুত করা হইবে তাহা ধর্ম-বিচার হইবে। ঐ বিচার কেবল পরিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ গ্রহণ করিবে না, পরিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানে পোঁছাইয়া দিবার জন্যও উহা

বাহনস্বরূপ হইবে। পথ ও ঘরের মধ্যে যে পার্থক্য ও সম্বন্ধ, ধর্ম ও মোক্ষের মধ্যে সেই সম্বন্ধ।"

যিনি সম্পত্তিদানযজ্ঞে দান দিবেন তিনি সারা জীবন উহা দিয়া যাইবেন। সারা জীবন আয়ের এক-ষষ্ঠাংশ বা এক-অষ্টমাংশ কি তাহার কম হইলেও তাহা দিয়া যাওয়ার সংকল্প অনেকের কাছে কঠিন বোধ হয়। বিনোবাজী তাঁহাদিগকে বলেন—"কিন্তু তাঁহারা ভাবেন না যে, একবার বিবাহ করিলে সারা জীবনের জন্য তাঁহারা নিজেদেরকে বন্ধনের মধ্যে আবন্ধ করেন।" এ সম্পর্কে তিনি পরে আরও যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্যই মহৎ প্রেরণা-দানকারী। তিনি বলিয়াছেন—"লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে—'আজীবন দান দিয়া যাওয়া সম্ভব কি?' আমি জিজ্ঞাসা করি, আজীবন ভোজন করিয়া যাওয়া সম্ভব হয় কেমন করিয়া? আপনি এই কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন যে, জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত ভোজন করিয়া যাইবেন। আজীবন ব্রত গ্রহণ করা সহজ ব্যাপার। বেদ বলিয়াছেন—মরণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাপূর্বক শ্বাস লইতে থাকিবে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্রত কঠিন ব্রত। এই ব্রত গ্রহণ করার কথা এই উদ্দেশ্যে বেদ বলিয়াছেন যে, শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে রামনাম করিতে হইবে। যেন বৃথা শ্বাস গ্রহণ করা না হয়। রামের কাজের জন্য প্রতিটি ক্ষণ নিয়োজিত করা আবশ্যক। ঐ প্রতিজ্ঞার এই অর্থ। আমাদের চক্ষু আজীবন দর্শন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের পদযুগল আজীবন চলিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। ঐ ব্রত তাহাদের কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ উহা নৈসর্গিক এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। ঐরূপে ত্যাগের ব্রতও নৈসর্গিক এবং স্বাভাবিক। ঘরে-ঘরে মা এই ব্রত প্রতিপালন করিতেছেন। মা সন্তানকে কতই না আদর করেন। কিন্তু তাঁহার ঐ ধর্ম-ভাবকে ঘরের মধ্যে সীমাবন্ধ না রাখিয়া আমরা উহাকে প্রসারিত করিতে চাহিতেছি। আমরা বলি, 'মা, তুই মূর্তিমতী ধর্ম, তুই মূর্তিমতী ত্যাগ। তুই এত ত্যাগ করিতেছিস্, আর একটু ত্যাগ কর্। যাহার খাওয়ার কিছু নাই তাহার জন্য তুই কিছু ত্যাগ কর্।' ত্যাগের ব্রত কঠিন নহে। ত্যাগের দ্বারা ভোগ অধিকতর রুচিকর হইয়া থাকে।"

সম্পত্তিদান কে করিবে? সর্বাপেক্ষা অর্থশালী ব্যক্তি দান করিবেন,

আবার অন্যদিকে দরিদ্রতম ব্যক্তিও দান দিবেন। এই ত্যাগ-ধর্ম পালন করিবার সুযোগ সকলেরই রহিয়াছে। বালক-বালিকারাও এইযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করিয়া বাল্যকাল হইতেই ত্যাগধর্মে দীক্ষিত হইতে পারে।

সম্পত্তিদানযজ্ঞের মধ্যে এক গভীর জীবন-বিচার নিহিত রহিয়াছে। উহা গার্হস্থ্য-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া গণ্য করা হয়। যিনি সম্পত্তি-দান দিবেন তাঁহার ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলের অন্তরে পরম আনন্দের সঞ্চার হওয়া চাই। তাই প্রথম পর্যায়ে সম্পত্তিদানযজ্ঞকে ব্যক্তিগতক্ষেত্রে নিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, যাহাতে উহা জীবনের গভীরদেশে প্রবেশ করিয়া ধীরে-ধীরে বৃদ্ধিলাভ করিতে পারে। তাই উহাকে প্রথমে সার্বজনিক আন্দোলনস্বরূপ ব্যাপক রূপ দেওয়া হয় নাই। বিহারে ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন যখন আশাতীত অগ্রগতি লাভ করিল তখন গত ১৯৫৩ সালের শরৎকালে বিনোবাজী সম্পত্তিদানযজ্ঞের সার্বজনিক আকার দান করিয়া সর্বসাধারণকে সম্পত্তিদানযজ্ঞে দান দিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। এবং বুদ্ধগয়া সম্মেলনের সময় হইতে দেশের সর্বত্র উহা ব্যাপকভাবে চালাইবার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

সম্পত্তিদানযজ্ঞের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করিয়া বিনোবাজী লিখিয়াছেন—"আমি বিশ্বাস করি, যদি ভক্তজন বিশ্বাস ও শুভেচ্ছা লইয়া এইযজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন, তবে এই কল্পনায় যে-নূতন জীবন-বিচার উন্মুক্ত হইতেছে উহা দেশের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে এবং সাম্যযোগের অভিমুখে সমাজ সহজেই অগ্রসর হইবে। এই উদ্দেশ্যে আমি সজ্জন ও সাধু ব্যক্তিগণের সুবিবেচনার জন্য এই বিচারধারাকে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি।"

যাঁহাদের নিকট ভূমিদান ও সম্পত্তিদান চাওয়া হয় তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বিনোবাজী ঋগ্বেদের এক মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বলেন—

"অদিৎসন্তং চিৎ আঘৃণে।
পূষন্ দানায় চোদয়।
পণেশ্ চিৎ বি ম্রদা মনঃ।"

"অন্তর হইতে মানসিক তাপ, বাহির হইতে পরিস্থিতির তাপ—এই

উভয়বিধ দহন-দানে শুদ্ধিদানকারী হে দেব! যিনি আজ দান দিতে চাহিতেছেন না, তাঁহার মনকে দান দিবার জন্য প্রেরিত কর। কৃপণের মনকেও মৃদু করিয়া দাও।"

শ্রমদানযজ্ঞ

সম্পত্তিদানযজ্ঞের পর বিনোবাজী শ্রমদানযজ্ঞ প্রবর্তন করেন। সম্পত্তি-দানের ন্যায় শ্রমদানেও গভীর অর্থ নিহিত আছে। যাহার জমি নাই, অর্থও নাই, তাহার কি দিবার মত কিছুই নাই? তাহার কি কোন সম্পত্তিই নাই? সে কি এতই নিঃস্ব, এতই কাঙ্গাল? ইহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন যে, ভূমিবান বা অর্থশালী লোকের দান দিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু যাহার জমি নাই বা অর্থ নাই অথচ শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্য আছে তাহার দানের শক্তি অপরিসীম। জমি বা অর্থ একেবারে সমস্তই দান করিয়া দেওয়া যায়। তাহার পর দেওয়ার মত তাহার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু যাহার ভগবানের প্রদত্ত সুস্থ ও সবল দেহ আছে তাহার দানশক্তি কখনও নিঃশেষ হয় না। সারা জীবন প্রতিদিন সে দান করিতে পারে। বিনোবাজী বলেন—"তাহার তুল্য দান আর কে করিতে পারে? ভূদানযজ্ঞে ভূমিদান পাওয়া গেল। কিন্তু ভূমিতে পরিশ্রম না করিলে তাহা আবাদযোগ্য হইবে না। গ্রামের চরিত্রবান ও সম্মানিত ব্যক্তিরা একযোগে শোভাযাত্রা করিয়া ঐ জমিতে মাটি খুঁড়িতে গেলেন। শুধু তাহা নহে। ভূমি বিতরণ করা হইল। যাহাকে ভূমি দেওয়া হইল সেব্যক্তি কোন আকস্মিক কারণে ভূমি ভালভাবে আবাদ করিতে পারিতেছে না। গ্রামের চরিত্রবান ও সেবাপরায়ণ প্রভাবশালী ব্যক্তিরা একযোগে ঐজমিতে আবাদের কাজে সাহায্য করিতে গেলেন। ইহার ফলে সমস্ত গ্রামে এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে যে, গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তি শ্রমদানের কাজে যোগদান করিতে গৌরব বোধ করিবেন। লোকে বুঝিতে পারিবে যে, ইহা মাত্র রামের জমি লইয়া শ্যামকে দেওয়া নহে। কেন-যে জমি দেওয়া হইতেছে সে-সম্পর্কে গ্রাম-বাসীদের চিন্তন ও মনন হইতে থাকিবে। এরূপে শ্রমের লুপ্ত মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ সুগম হইবে।" তাই বিনোবাজী তাঁহার দুর্বল

ও অসুস্থ শরীরে ১০।১২ মাইল পাদপরিক্রমা করিয়া আসিয়াও ক্লান্তি ভুলিয়া গিয়া সদলবলে একঘণ্টা কোদালী চালান, এবং শ্রমদানযজ্ঞ করিয়া সমাজকে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহান শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন।

প্রেম ও বুদ্ধিদানযজ্ঞ

মনুষ্যের পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে। সেরূপ মানুষ পঞ্চবিধ ধনেরও অধিকারী। যথা—হৃদয়, মস্তিষ্ক, দেহ, স্থাবর-সম্পত্তি ও অস্থাবর-সম্পত্তি অর্থাৎ প্রেম, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা, শারীরিক শ্রম, ভূমি ও অর্থ। তবে একই ব্যক্তি সকল রকম ধনের অধিকারী না হইতে পারেন। কিন্তু এমন ব্যক্তি নাই যাঁহার কোন এক প্রকারেরও ধন নাই। নিঃস্ব ও সর্বপ্রকারের অক্ষম ব্যক্তির তো হৃদয় থাকিবে। তাই বিনোবাজী পঞ্চপ্রকার যজ্ঞ করিবার জন্য আহবান করিয়াছেন। ভূদান, সম্পত্তিদান ও শ্রমদানযজ্ঞের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। প্রেমদান ও বুদ্ধিদানযজ্ঞের বিষয় এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। যাঁহার আর কিছুই নাই তিনি নিজের প্রতিবেশীকে অন্তর হইতে নিজের মত করিয়া দেখিবেন ও তাহার প্রতি প্রেমভাব পোষণ করিবেন। নিজের আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইবে তাঁহার সাধনা। উহা হইবে প্রেমদানযজ্ঞ। যাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা আছে, তাঁহারা প্রত্যহ কিছু সময় তাঁহাদের বিদ্যা ও বুদ্ধি নিঃস্বার্থ সেবায় নিয়োজিত করিয়া বুদ্ধিদানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। বিচারক আপোষে বিবাদ মীমাংসা করাইবেন। আইন-জীবী কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া অত্যাচারিত দরিদ্রের পক্ষাবলম্বন করিবেন। চিকিৎসক দরিদ্রকে বিনা অর্থে চিকিৎসা করিবেন। শিক্ষক ও ছাত্র তাঁহাদের অবসর সময়ে দরিদ্রকে শিক্ষাদান করিবেন। হিসাবনবীশ বিনা বেতনে কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে হিসাব সংক্রান্ত কাজ করিয়া দিবেন ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া সেবকের জন্য এক মহত্তম যজ্ঞের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা হইতেছে—জীবনদান।

জীবনদান

বিপ্লবের এক লক্ষণ এই যে, উহা এক বিষয় লইয়া আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু অচিরে উহা জীবনের অন্যান্যক্ষেত্রেও প্রসারিত হয় এবং অবশেষে সর্বগ্রাসী হইয়া উঠে। জীবনের একক্ষেত্রে আরম্ভ হইয়া উহা তথায় নিবদ্ধ থাকিলে তাহা বিপ্লবই হইল না। আচার্য কৃপালানী বুদ্ধগয়া সর্বোদয় সম্মেলনে ভূদানযজ্ঞের বৈপ্লবিক প্রকৃতির কথা আলোচনা করিতে গিয়া বিপ্লবের এই লক্ষণের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরও বলেন যে, বুদ্ধদেব নির্বাণের একপথ আবিষ্কার করিলেন। উহা তো ধর্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাপার। কিন্তু উহা ছিল বৈপ্লবিক। তাই উহা জীবনের অন্যান্যক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হইল। নূতন রাজ্য সৃষ্টি হইল, নূতন সমাজ-ব্যবস্থা রচিত হইল, নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিল। মহাত্মা গান্ধী রাজ-নৈতিকক্ষেত্রে তাঁহার কাজ সুরু করিলেন। দেশকে বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ তিনি উহার ভিত্তিতে দেশকে সার্বজনিক মুক্তির পথ দেখাইলেন। সেরূপ ভূমি-সমস্যার সমাধানকল্পে ভূদানযজ্ঞ আরম্ভ হয়। এখন উহার ভিত্তিতে দেশের কায়া পাল্টাইবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সর্বোদয়ের সমস্ত দিকই উহার রঙে রাঙিয়া উঠিতেছে। ভূমির মালিকানা ব্যক্তিগত হইতে পারে না। ভূদানযজ্ঞের বিচারধারার ভিত্তিভূমি আধ্যাত্মিকতা—আত্মার একত্ব। জগতে যাহাকিছু সবই ভগবানের। ভূমির মালিক আমরা নহি, ভগবান। তেমনি আমাদের বুদ্ধির মালিকও আমরা নহি। আমাদের সম্পত্তি, ধন, অর্থের মালিকও আমরা নহি। আমাদের শরীরের মালিকও আমরা নহি। আমাদের ভূমি, ধন-সম্পত্তি, বুদ্ধি, শরীর যাহাকিছু সবই সমাজসেবার জন্য অর্পণ করা চাই। তাই ভূদানযজ্ঞের বৈপ্লবিক তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু এই পরম অভীষ্ট সাধন প্রসারিত হইল সম্পত্তিদানে, শ্রমদানে, বুদ্ধিদানে। এখানেও উহা নিবদ্ধ থাকিল না। আমাদের জীবন কি আমাদের? আমাদের জীবন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থেই যাপিত হইবে? জীবনও তো আমাদের নহে—ভগবানের। উহা ভগবানের দান। তাঁহার কাজে, সমাজসেবার কাজে উহাকে উৎসর্গ করা চাই। তাই যজ্ঞ সর্বগ্রাসী হইল। জীবনদানে উহার পরিণতি না হইয়া

থাকিল না। বুদ্ধগয়া সর্বোদয়-সম্মেলনের এক মহান অবদান—জীবনদান। কিন্তু বিনোবাজী এই জীবনদানের আভাস উহার কয়েকমাস পূর্বে তাঁহার এক প্রার্থনান্তিক ভাষণে দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"আজ নূতন মানুষ, নূতন সমাজ তৈয়ারী করিতে হইবে। এইজন্য ভূদান, সম্পত্তিদান, শ্রমদান প্রভৃতি আন্দোলন শুরু করা হইয়াছে। এইকাজের জন্য এমন বিচারধারা উৎপন্ন করিতে হইবে যাহাতে লোকে জীবন সমর্পণ করিতে অগ্রসর হয়।"

সর্বাঙ্গীন বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, দেশের আবহাওয়ায় বৈপ্লবিক তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু এই পরম অভীষ্ট সাধন করিবার মত উৎসগীকৃত-প্রাণ, পর্যাপ্ত সংখ্যক সাধক কোথায়? সেবক কোথায়? বুদ্ধগয়া সর্বোদয়-সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণজী ভাষণ দিতে উঠিলেন। তিনি ক্ষুন্ন, বিষন্ন। যদি একনিষ্ঠ কর্মী যথেষ্ট সংখ্যক থাকিত, তবে বিহারে ৩২ লক্ষ একর ভূমিদান সংগ্রহ পূর্বেই হইয়া যাইত। সন্ত বিনোবাকে এতদিন বিহারে রাখিয়া কষ্ট দিতে হইত না। আন্দোলনে তীব্রতা আনাইবার প্রেরণা দান করিবার জন্য তিনি বলিলেন যে, আজকার যুগ এই আন্দোলনের জন্য অধিক সময় দিবে না। অহিংস-ক্রান্তি হইবে এইজন্য ইতিহাস দাঁড়াইয়া থাকিয়া অপেক্ষা করিবে না। তিনি পূর্ব বৎসর ছাত্রগণকে এই আন্দোলনে এক বৎসর সময় দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু বৎসরের কথা বলিলে এখন আর কাজ চলিবে না। এখন তো জীবন অর্পণ করিবার সময় আসিতেছে। অতঃপর তিনি তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে আপনার জীবনদান ঘোষণা করিলেন। সমগ্র সম্মেলন-ক্ষেত্রে এক অপূর্ব গাম্ভীর্য পরিব্যাপ্ত হইল। বিনোবাজীর হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি ধীর, স্থির, গম্ভীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—"আমরা এইমাত্র এক ভাষণ শুনিলাম। তাহাতে হৃদয় কথা বলিতেছিল। ইহাতে আমার রুক্মিণীর পত্রের কথা স্মরণ হইল। রুক্মিণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। আজকাল পত্র-সাহিত্যকে সাহিত্যের অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। রুক্মিণীর পত্র পত্র-সাহিত্যে প্রথমস্থান অধিকার করিয়া আছে।

ঐ পত্রকে শুকযোগী কবিতাবন্ধ করিয়াছিলেন। পত্রে রুক্মিণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লিখিয়াছিলেন—'আমার শতবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় করিব, প্রাণ পরিত্যাগ করিব, শরীর কৃশ হইতে কৃশতর করিয়া জীবনধারণ করিব, কিন্তু তথাপি তোমাকেই বরণ করিব।'* এইরূপ শুভ সংকল্পের কথা শুনিলে হৃদয়ে আনন্দ আসে। আমি মনে করি যে, এইযজ্ঞ সফল হইতে হইতে আমাদের জীবনকেও সফল করিবে।" এইখানেই ইহার শেষ হইল না—হইবারও কথা নহে। তখন হইতে বুদ্ধগয়া সম্মেলন-ক্ষেত্রের হাওয়া বদলাইয়া গেল। সকলের হৃদয় শীতল হইয়া গেল। পরদিন ভোর হইতেই বিনোবাজী চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ঐবিষয়ে তাঁহার কিছু করা চাই। সুতরাং তিনি প্রত্যুষেই জয়প্রকাশ নারায়ণজীকে এক পত্র লিখিয়া দিলেন, "ভূদানযজ্ঞমূলক, গ্রামোদ্যোগ-প্রধান, অহিংসক ক্রান্তির জন্য আমার জীবন সমর্পণ।" অতঃপর সম্মেলনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনেব প্রারম্ভেই বিনোবাজীর উক্ত পত্র পঠিত হইল। উহার সঙ্গে-সঙ্গে নেতৃবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের সাধারণ কর্মী পর্যন্ত একে-একে তাঁহাদের জীবন-দানের সংকল্প লিখিতভাবে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। উহাতে প্রাতঃকালীন অধিবেশনের সমগ্র তিন ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইল। জীবনদানকারীর সংখ্যা সাড়ে তিনশতেরও উপর উঠিল। উহার পরও জয়প্রকাশ নারায়ণজীর

---

* রুক্মিণী দেবীর পত্রের অংশ ঃ

* * * যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজস্নপনং মহান্তো,
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতি রিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং,
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশাঞ্ছতজন্মভিঃ স্যাৎ॥ ৪৩॥

—উমাপতি ভগবান শঙ্করের ন্যায় মহাপুরুষগণও আত্মশুদ্ধিলাভের জন্য আপনার চরণকমলের ধূলিতে স্নান করিতে চাহেন। যদি আমি আপনার ঐ প্রসাদ, আপনার ঐ চরণধূলি লাভ করিতে না পারি, তবে ব্রতের দ্বারা শরীরকে শুষ্ক করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। যদি উহার জন্য শত-শতবার জন্ম লইতে হয়, তবে তাহাই লইব। কখনও-না-কখন আপনার ঐ প্রসাদ নিশ্চয় লাভ করিব।—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ, ৫২-তম অধ্যায়।

নিকট জীবনদানের সংকল্প আসিতে থাকিল। এখন প্রশ্ন এই যে, এই জীবনদানের অর্থ কি?—কায়, বাক্য, মন ও বুদ্ধি সবই এই মহান কার্যের জন্যই উৎসর্গ করা। ইহা ঠিক। কিন্তু শুধু কি তাই? জীবনদান-কারীদের মধ্যে এমন কেহ-কেহ থাকিতে পারেন—আছেনও, যাঁহারা পূর্বেই তাঁহাদের জীবনদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পুনরায় জীবনদানের অন্ত-র্নিহিত তাৎপর্য কি? বিনোবাজী সম্মেলনের উপসংহারে তাহা পরিষ্কার-ভাবে বুঝাইয়া বলিলেন। জীবনদানের তাৎপর্য কি তাহার আভাস কৃপালানীজী পূর্বদিনের প্রার্থনা-সভায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দিয়াছিলেন। বিনোবাজী সেইকথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"উহার মধ্যে গভীর জিনিস রহিয়াছে। যাহার আভাস কৃপালানীজী গতকল্য প্রার্থনা-সভায় দিয়াছেন। তিনি এক বিশিষ্ট প্রকৃতির মানুষ এবং তাঁহার বলিবার ভঙ্গিও বিশিষ্ট। বলিতে গিয়া তিনি উপনিষদের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু সহজে বুঝা যায় না—তিনি কি বলিলেন। লোকের মনে হয় তিনি উপহাস বা বিদ্রূপ করিতেছেন। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে এবং আমি বলিব যে, অহিংসভাবে বুঝাইয়াছেন—ভাইসব, জীবন তো দান করিতেছেন। কিন্তু কোন ময়লা জিনিস দান করিতেছেন না তো? এই খেয়াল যেন থাকে। শুদ্ধবস্তু অর্পণ করিতে হয়। জীবনদানের বিচার ভাল। কিন্তু যিনি অন্তরে জীবনদানের সংকল্প করিবেন, তাঁহার এইদিকে দৃষ্টি থাকা চাই যেন আবর্জনা দান না করা হয়। জীবনদানের সংকল্পের অর্থ জীবন-শুদ্ধি—এইকথা তিনি অত্যন্ত রুচিকরভাবে আমাদের সামনে রাখিয়াছেন। উহা কোনরূপ ঠাট্টা-তামাসা নহে। আজ যে আপনারা আমার সম্মুখে এবং আপনাদের নিজেদের সম্মুখে একে অন্যকে সাক্ষী রাখিয়া জীবন অর্পণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, উহার সঙ্গে-সঙ্গে জীবনশুদ্ধির সাধনা করা চাই। আমরা সার্বজনিক কাজ করিয়াছি। ইহার উপর ভূদানযজ্ঞের ন্যায় বুনিয়াদী কাজ, যাহার দ্বারা দেশের কায়া বদলাইবে, তাহার জন্য যদি জীবন-দান করা হয় তবে এযাবৎ চিত্তশুদ্ধির জন্য যতটা প্রযত্ন করা হইত তদপেক্ষা অধিক প্রযত্ন করিতে হইবে।"

ইহার কয়েক মাস পরে বিহারে জীবনদান-শিবির উদ্ঘাটন করিবার

সময় বিনোবাজী জীবনদান যে আরও গভীর অর্থপূর্ণ এবং সেজন্য জীবন-দাতাকে যে উচ্চতর আধ্যাত্মিক আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া বলেন। আমরা কে? সারা জাগতিক ব্যাপার কে পরিচালনা করিতেছেন? জাগতিক ব্যাপারের যোজনা কাহার এবং উহা কি? এই যোজনায় কি মনুষ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারে? ঈশ্বরই সমস্ত জাগতিক ব্যাপার পরিচালনা করিতেছেন। সবই তাঁহার যোজনা। আমরা কিছুই নহি। মনুষ্য তুচ্ছ। ঈশ্বর যদি তাঁহার কাজের জন্য কাহাকেও যন্ত্রস্বরূপ বাছিয়া লন তবেই তাহার কিছু মূল্য হয়। কেবলমাত্র তখনই মনুষ্য তাঁহার যোজনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। নচেৎ মনুষ্য তুচ্ছ থাকিয়া যায়। কি করিলে বা কিরূপ হইলে মনুষ্য ভগবানের হাতের যন্ত্র হইবার যোগ্য হয়? বীজ নিজেকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিলে তবেই বৃক্ষ জন্ম গ্রহণ করে। বীজের অস্তিত্ব থাকিতে বৃক্ষ জন্মিতে পারে না। তদ্রূপ মনুষ্য আপনার 'আমিত্বের' বিনাশসাধন করিয়া নবজীবন লাভ না করিলে ঈশ্বরের যোজনায় অংশগ্রহণ করিবার যোগ্য হয় না এবং ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ করেন না। এসম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—"যদি ঈশ্বরের যোজনায় যোগদান করিতে হয়, তবে বীজের মত আপনাকে নিঃশেষ করিতে হইবে, খতম করিতে হইবে। বীজ খতম হইলে তবে বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। এইজন্য বৌদ্ধগণ এক সিদ্ধান্তের কথা বলেন যে, একটি বিনাশ হইতে একটি অস্তিত্বের জন্ম হয়। যদি আমরা নিজেদের রূপ বজায় রাখি, তবে আমরা ঈশ্বরের কাজের যোগ্য হই না। কিন্তু লোককে প্রায়ই খালি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার অহম্-এর চারিদিকে কল্পনাজাল, কর্তব্যক্ষেত্র এবং মমত্ব ঘিরিয়া থাকে। যদি কেহ উহাদিগকে কায়েম রাখিয়া ঈশ্বরের যোজনায় যোগদান করিতে চায় তবে ঈশ্বর বলেন, তুই আমার জন্য জায়গা খালি করিয়া রাখিস্ নাই। যদি তুই খালি হইয়া যাস্, তবেই না আমার জন্য স্থান হইবে।' এই হইল জীবনদাতার স্বরূপ। যিনি খালি হইয়াছেন, যিনি নিজেকে শূন্য করিয়া ফেলিয়াছেন, যিনি নিজের জায়গা ছাড়িয়া দিয়াছেন, কেবলমাত্র তিনিই জীবনদাতা হইতে পারেন। যিনি শূন্য হন নাই, তাহাতে তাঁহার নিজেরই চলিতে পারে, ঈশ্বরের চলিবে না। তুলসীদাসজী বলেন—বাবা, "অপনে

করত মেরী ঘনী ঘটী ভঈ" আমি নিজে করায় আমার ইজ্জত নষ্ট হইয়াছে। এইজন্য এখন হইতে আপনিই করিবেন, আমি করিব না। আমাকে দিয়া করাইয়া লইবেন, আমি শূন্য হইয়াছি। যখন মন এই অবস্থায় উপনীত হয় তখনই মনুষ্য জীবনদাতা হয়। গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলিলেন—"যথেচ্ছসি তথা কুরু" অর্থাৎ তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় সেরূপ কর। এই কথা বলিয়া ভগবান পরীক্ষা করিতে চাহিলেন যে, অর্জুনের ইচ্ছা বলিয়া কিছু অবশিষ্ট আছে কি না। যদি অর্জুন বলিতেন 'আমার এই ইচ্ছা,' তবে ভগবান বলিতেন —তুমি অযোগ্য, তুমি আমার যোগ্য নহ। অর্জুন বলিলেন—আমার আবার ইচ্ছা কি? "নষ্টো মোহঃ"-আমার মোহ দূরীভূত হইয়াছে। এইজন্য "করিষ্যে বচনং তব" অর্থাৎ তোমারই আজ্ঞা পালন করিব। গীতা-প্রবচনের শেষের দিকে দাদুর এক বচনের উল্লেখ করা হইয়াছে। ছাগ "ম্যায়, ম্যায়" (আমি, আমি) করিয়া ডাকে। কিন্তু মৃত্যুর পর যখন ছাগদেহের অংশবিশেষ হইতে তাঁত তৈয়ারী হইয়া পিঞ্জনে লাগানো হয়, তখন উহা হইতে "তু-হী, তু-হী" (তুই) নির্গত হয়। অহংকারের অন্ত হইবার পর 'তু, তু' (তুই, তুই) শুরু হয়। তখনই ভগবান ঐব্যক্তির দ্বারা তাঁহার কাজ করাইয়া লন।"

এই জগৎ এক রঙ্গমঞ্চ। এখানে এক নাটকের অভিনয় চলিতেছে। প্রত্যেক মানুষ এক-একজন অভিনেতা। অভিনয় করিবার সময় যদি অভিনেতা মনে করিতে থাকে যে, সে প্রকৃতপক্ষে অমুক লোক, তবে তাহার অভিনয় সফল হয় না। সেরূপ ভগবানের কাজ করিবার সময় যদি আমরা আমাদের আমিত্বকে স্মরণ রাখি, তবে ভগবানের কাজ আমরা করিতে পারিব না। তাই বিনোবাজী বলেন—"বিনোবা যদি কাল হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকা অভিনয় করে তবে সেসময় তাহার ইহা স্মরণ করা উচিত হইবে না যে, সে বিনোবা।"

মানুষ নিঃশেষে তাহার অহংকার বিসর্জন দিলে তবেই জীবনদাতা বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহার চরম প্রমাণ তো জীবন থাকিতে হইতে পারে না। মৃত্যুর পর ইহা নির্ণীত হইবে—কে তাহার জীবন সমর্পণ করিয়াছিল, আর কে করে নাই। তাই 'অমুক জীবনদাতা'—একথা বলা যাইতে পারে না। 'অমুক জীবনদাতা হইবে'—একথা একমাত্র অন্তর্যামী বলিতে পারেন। কেবলমাত্র মৃত্যুর পর বলা যাইতে পারে যে, অমুক জীবনদাতা

ছিল। এইবিচার বুঝাইয়া বিনোবাজী বলেন—"যিনি বলিবেন 'আমি জীবন-দাতা' 'ম্যাঁয় জীবনদানী হুঁ', তাঁহার 'হুঁ' খতম হইবে এবং 'ম্যাঁয়' 'আমি' থাকিয়া যাইবে। এইজন্যই ইহা বলা ঠিক নহে যে, আমি জীবনদাতা। তাই জীবনদাতাগণের সভা স্বর্গে হইতে পারে। পৃথিবীতে আমাদের ন্যায় সামান্য মনুষ্যদেরই সভা হইবে। জীবনদাতাদের সম্মেলন হইবে স্বর্গে: মৃত্যুর পরে, পূর্বে নহে।"

মনুষ্যের পূর্বেকার চরিত্র দেখিয়া বলা যাইতে পারে না যে, তিনি জীবনদানের সংকল্প গ্রহণ করিয়া জীবনদাতার যোগ্য-অবস্থা লাভ করিতে সক্ষম হইবেন কি না। এমন হইতে পারে যে, একজন সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকও জীবনদান করিয়া শেষপর্যন্ত অহং ত্যাগ না করিতে পারায় জীবন-দানের অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইলেন। আবার অন্যদিকে এক রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতির লোক শ্রদ্ধার সহিত জীবনদানের সংকল্প গ্রহণ করিবার পর তাঁহার এমন পরিবর্ত্তন আসিয়া গেল যাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম হইল এবং তিনি নিজেকে নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের হাতে পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া দিয়া প্রকৃত জীবনদাতা হইলেন। অতএব জীবনদাতাদের মধ্যে যাঁহারা রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হয়, তাঁহা-দিগকে বাদ দিবার প্রশ্ন উঠে না। তাই বিনোবাজী বলেন—"কাহাকেও বাদ দিবার আমি কে? মৃত্যুর পর আমিই জীবনদাতা ছিলাম কি-না সেইবিচার হইয়া তবেই আমার কোনস্থান পাওয়া উচিত তাহা নির্ণীত হইবে।" অতএব যিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি জীবনদান করিতেছেন, তিনিই জীবনদাতা, ইহা মানিয়া লওয়া উচিত। এসম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"আমরা শব্দ প্রমাণ মানিয়া থাকি। লোক-গণনার সময় কে হিন্দু, কে মুসলমান তাহা লেখা হইয়া থাকে। মুখে যে যাহা বলে তাহাই সত্য বলিয়া লিপিবন্ধ করা হয়। এসম্পর্কে শাস্ত্রের প্রমাণ চাওয়া হয় না। লোকে বলে—আমি জানি অমুক কেমন লোক; সে বৃথা নাম দিয়াছে। অর্থাৎ আমরা যেন মানুষের অন্তর্যামী।" কাঠ পুড়িয়া ছাই হইবার পর বুঝিতে পারা যায় না উহা কি ছিল। সেরূপ আজ যে যে-প্রকৃতিরই হউক না কেন, জীবনদান ঘোষণার পর যদি নিজেকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া ফেলে অর্থাৎ নিজেকে নিঃশেষে

ভগবানের হাতে সমর্পণ করে, তবে সেই অবস্থায় বুঝা যায় না (এবং তাহা জানিবার প্রয়োজন থাকে না) যে সেইব্যক্তি পূর্বে কোন্ প্রকৃতির ছিল। এই-বিচার বুঝাইয়া বিনোবাজী বলেন—"কাষ্ঠে অগ্নি প্রয়োগ করা হইল। কাষ্ঠ পুড়িয়া অঙ্গারে পরিণত হইল। তখন উহা বকুল বা আম থাকে না। দেখিয়া যদি কেহ বলিতে পারে যে, উহা অমুক কাষ্ঠ ছিল তবে বুঝিতে হইবে—তাহা সম্পূর্ণ অঙ্গার হয় নাই। ভিতরের কাষ্ঠ এখনও পুড়িয়া ছাই হইতে বাকী আছে।"

কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন যাঁহারা জীবনদান দিয়াছেন তাঁহাদের জীবিকার ব্যবস্থা কি হইবে? ইহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন—"ইহার উত্তর এই যে, যিনি বিশ্বম্ভর তিনিই সেইব্যবস্থা করিবেন। 'যোহ সৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স ভক্তান্ কিং উপেক্ষতে?'—ঈশ্বর তাঁহার ভক্তকে উপেক্ষা করিবেন না। তিনি বিশ্বম্ভর, ইহা কখনও মিথ্যা প্রমাণিত হয় নাই। যদি জীবনদাতাগণ ভক্ত হন তবে বিশ্বম্ভর তাঁহাদের চিন্তা করিবেন। ইংরেজী ভাষার অর্থে আমাদের এইকাজ 'সার্ভিস' নহে। ইহা পরিশুদ্ধ সেবা। অত-এব জীবিকার ব্যবস্থার জন্য কোনরূপ গ্যারাণ্টি ইহাতে নাই। শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা যে করা হইবেই—ইহাও নিশ্চিন্ত-রূপে বলা যাইতে পারে না। কাজের মাধ্যমে তাঁহাদের শিক্ষা হইবে। জীবনদাতাগণের মিত্র-মণ্ডল যথেষ্ট বড়। ঐ মিত্র-মণ্ডলের দ্বারা তাঁহাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা হইয়া যাইতে পারে। ঐ মিত্র-মণ্ডল হইতেছে বিশাল জনতা। সুতরাং জীবনদাতাগণের ভরণ-পোষণের জন্য কিছু ব্যবস্থা করিতেই হইবে এবং ঐজন্য চিন্তা করিতে হইবে—এরূপ আমি মনে করি না। ভগবানের হাতে আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি। তিনিই আমাদের একমাত্র ভরসা—ইহাই বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গ। প্রথমেই আমি বলিয়াছি যে, যদি অহঙ্কার থাকিয়া যায়, তবে জীবনদানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। ভক্তির সঙ্কল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। ভক্তিলাভ হইবার পর যাহার যতটুকু শক্তি সেরূপ কাজ হইবে। কাজ করিতে করিতে শক্তি বৃদ্ধি হইবে। এইরূপে যুক্তিরও বিকাশ হইবে। যাঁহারা জীবনদান করিয়াছেন তাঁহাদের শক্তি ও যুক্তি কম থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের ভক্তি যেন কম না থাকে।"

যাঁহারা জীবনদান করিয়াছেন তাঁহাদের দ্বারা কিভাবে কাজ করাইয়া লওয়া যায়—এইসমস্যা আছে। এসম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"যিনি জীবনদান দিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি সেইক্ষণ হইতে এই-কাজে লাগিয়া গিয়াছেন—এরূপ মনে করিয়া লইতে হইবে। অতএব আমার নিকট হইতে যদি কোন পরামর্শ চান তবে আমি নিশ্চয়ই তাহা দিব। যদি আমার সাহায্য চান তবে আমি নিশ্চয়ই সাহায্য দিব। যিনি জীবনদান করিয়াছেন তিনি কোন ব্যক্তির হাতে তাঁহার জীবন সমর্পণ করেন নাই।" অতএব তাঁহাদের পরিচালক কেহ নাই বা থাকিবে না। বিনোবাজী বলেন যে, তাঁহারা ভেড়ার দল নহেন, তাহারা প্রত্যেকেই ব্যাঘ্র। তাঁহারা নিজেদের শক্তিতে কাজ করিবেন। তাঁহাদের জন্য কোন মেষ-পালকের প্রয়োজন হইবে না। যাঁহারা জীবনদান করিয়াছেন তাঁহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া লইবেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে উপদেশ ও পরামর্শের আদান-প্রদান হইবে। বিনোবাজী বলেন—"ইহা ভক্তের এক লক্ষণ। 'বোধয়ন্তি পরস্পরম্'। বোধ দিবার জন্য একজন কোন ধর্মাধিকারী থাকিবেন না। প্রত্যেকে প্রত্যেককে উপদেশ দিবেন, পরামর্শ দিবেন।"

জীবনদান যে কেবলমাত্র পরিণত বয়সের ব্যক্তিরা করিবেন এমন নহে। বালক-বালিকাগণও জীবনদান করিতে পারেন।

বিনোবাজী আরও বলেন—"জীবনদানের অর্থ অন্তিম প্রবাস। ইহা অন্তিম কার্য। যিনি জীবনদান দিয়াছেন তিনি অখন্ড পান্থিক হইয়া গিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যাইবেন। কখনও পশ্চাদ্ধাবন করিবেন না। এই অন্তিম কার্যে কাহারও জন্য কেহ অপেক্ষা করিবেন না। কাহারও জন্য কেহ পিছাইয়া থাকিবেন না। চলিতে চলিতে যিনি পড়িয়া গেলেন, তিনি পড়িয়াই থাকিলেন। চলিতে চলিতে যিনি চলা বন্ধ করিলেন, তিনি থাকিয়াই গেলেন। কাহারও জন্য কেহ অপেক্ষা করিবে না।" এইসম্পর্কে তিনি পান্ডবগণের স্বর্গারোহণ-যাত্রার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। পঞ্চপান্ডব ও দ্রৌপদী চলিতে লাগিলেন। ভীম পড়িয়া গেলেন এবং ধর্মরাজকে বলিলেন, সাহায্য করুন। ধর্মরাজ বলিলেন—ভাই, উঠিয়া দাঁড়াও। তবে কিছু সাহায্য করা সম্ভব। তিনি ভীমের জন্য

থামিয়া গেলেন না। একে-একে অন্য সকলেই এইভাবে পড়িয়া থাকিলেন। স্বর্গদ্বারে তাঁহার একজন মাত্র সংগী থাকিল। সে হইতেছে তাঁহার কুকুর। তাহাকে ছাড়িয়া তিনি স্বর্গের ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন না। এ-সম্পর্কে বিনোবাজী আরও বলেন—"এই ব্যাপারে সকলেই মুক্ত। মুক্ত থাকিয়া সম্মুখে ঐ-যে একমাত্র কার্য তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এরূপ বিচার অন্তরে গ্রহণ করিলে কাজ সহজ হইয়া যাইবে এবং এইকাজের কোন দুষ্পরিণামের আশংকা থাকিবে না। প্রত্যেকেরই পরীক্ষা হইবে। যে টিঁকিয়া গেল তো গেল। যে টিঁকিল না তো টিঁকিল না। যিনি আমাদের সংগে চলিতে চাহিবেন, তাঁহার সংগে আমরা আছি। যিনি আমাদের সংগ ত্যাগ করিলেন তাঁহার ঐরূপ করিবার অধিকার আছে এবং আমাদের আগাইয়া যাইবারও অধিকার আছে।"

বুদ্ধগয়ায় জীবনদানের যে-লহরী উঠিয়াছিল তাহা মন্দীভূত হয় নাই। অবিরতভাবে জীবনদানের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। এযাবৎ (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫) এক হাজারেরও অধিক ব্যক্তি জীবনদানের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। জীবনদানকারীদিগকে চিত্তশুদ্ধির প্রেরণাদানের জন্য তথা তাঁহাদের পক্ষে যোগ্য জীবন-শৃংখলায় দীক্ষিত করিবার জন্য শিবিরের ব্যবস্থা করা হইতেছে। তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদের যোগ্যতা ও মানসিক ঝুঁকি অনুসারে বিভিন্নক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন তাহার জন্য প্রযত্ন করা হইতেছে। জীবনদানের প্রক্রিয়ায় এক দৈবী-শক্তি নির্মিত হইতেছে এবং ভূদানযজ্ঞ তথা সর্বোদয়-সাধনায় এক নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে। সর্বোদয় প্রতিষ্ঠায় ইহার সম্ভাবনা অপরিমেয়।

ষষ্ঠাংশ দানের রহস্য

ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কে কেহ-কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন যে, জমিদার-জোতদারেরা এক-ষষ্ঠাংশ ভূমিদান করিয়া অবশিষ্ট পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ আরামে ও নিরাপদে ভোগ করিতে থাকিবে এবং তাঁহাদের জীবনযাত্রা পূর্ববৎ চলিবে। ইহাতে সমাজে ক্রান্তি আসার সম্ভাবনা কম।—যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহারা ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলনের রহস্য হৃদয়ংগম করিতে পারেন নাই। ভূদান-

যজ্ঞ ভূমি ও সম্পত্তির স্বামিত্ব বিসর্জনের দীক্ষাদানের আন্দোলন। যিনি আজ এক-ষষ্ঠাংশ দান করিলেন তিনি কাল উহা অপেক্ষা অধিক দান করিবেন এবং যতদিন পর্যন্ত তাঁহার সম্পত্তি-বিসর্জন সম্পূর্ণ না হয় ততদিন তাঁহার দান চলিতে থাকিবে। বিনোবাজী বলিয়াছেন—"রবারকে খুব বেশী টানিলে উহা ছিঁড়িয়া যায়। অতএব ধীরে-ধীরে উহা টানা চাই। এইজন্য আমি এখন মাত্র এক-ষষ্ঠাংশ চাহিতেছি। আজ তো সবটাই মালিক নিজের কাছে সঞ্চিত রাখিয়া থাকে। সমাজের এই রীতি চলিতেছে। তাই আমি প্রথমে এক-ষষ্ঠাংশ চাহিতেছি। পরে অধিক চাহিব। ব্যক্তির গুণ বিকাশ করিবার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া আবশ্যক।" সম্পত্তিদান সম্পর্কে বিনোবাজী এই কথা বলিয়াছেন। ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। তিনি সম্প্রতি রাঁচীতে বিহার প্রদেশের ভূদানকর্মীদের শিবিরে যে-প্রবচন দিয়াছেন তাহাতে এই কথা আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—"বিহারে আমরা অধিক গভীরতায় প্রবেশ করিতেছি। আমি এখানে কেবলমাত্র জমি ও দানপত্রের কোটা বৃদ্ধি করি নাই, পরন্তু গ্রামবাসীদিগকে ইহা বুঝাইতেছি যে, গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্রদিগকে ভূমি দেওয়ার ব্যবস্থা আপনাদিগকে করিতে হইবে এবং সকলে মিলিয়া আপনাদের ইহা করা চাই। প্রথমে আমি বলিব, প্রত্যেক গ্রাম হইতে ৫।১০ একর পাওয়া চাই। পরে আরও এক-পা অগ্রসর হইব। গভীরতায় প্রবেশ করিতে হইলে ধীরে-ধীরে যাইতে হয়। প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক কৃষকের নিকট হইতে দানপত্র লইতে হইবে। অতঃপর অন্তিম পদক্ষেপ লইব এবং লোককে বলিব—এখন মালিকানা একেবারেই বিসর্জন দিতে হইবে। এরূপে কর্মীদের ভূদানযজ্ঞের পূর্ণদর্শনের জ্ঞান থাকা চাই। আপনাদের সকলের মনে এই দৃষ্টি থাকা চাই এবং ক্রমে-ক্রমে এক-এক পা অগ্রসর হওয়া চাই।" এ সম্পর্কে তিনি আর একস্থলে বলিয়াছেন—"লোকে জিজ্ঞাসা করে যে, এক-ষষ্ঠাংশ দিলে পরে আবার চাহিবেন না তো? আমি বলি, ধর্মকার্য হইতে কি কখনও মুক্তি পাইতে আছে? তাহাতে তো বন্ধন আসে? পরে তো সবকিছু দিয়া গরীবের সেবায় লাগিয়া যাওয়া চাই। বামনের তিনটি পা। বামনের তৃতীয় পদক্ষেপে যেরূপ হইয়াছিল তদ্রূপ অবশেষে আমাদিগকে গরীব হইয়া যাইতে হইবে এবং জীবনকে সাদাসিধা

করিয়া তুলিতে হইবে।

"সন্তানকে উঠাইবার সময় মাতাকে ঝুঁকিয়া পড়িতে হয়। সেইরূপ গরীবকে উঠাইতে গিয়া আমাদের জীবনযাত্রার মানকে কিছু নীচু করিতে হইবে। এক-ষষ্ঠাংশ দানের দ্বারা ইহার আরম্ভ হইয়াছে।"

সম্পত্তিদানযজ্ঞ সম্পর্কেও অনুরূপ আপত্তি উঠিয়া থাকে। বিনোবাজী উহা খণ্ডন করিয়াছেন।*

ভূমি-বিতরণ

ভূদানযজ্ঞের কর্মীদের শক্তি, সামর্থ্য ও সময় যাহাতে একনিষ্ঠভাবে ভূমিদান সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকে সেই উদ্দেশ্যে এতদিন সর্বত্র ভূমি-বিতরণ কার্য আরম্ভ করা হয় নাই। অথবা যেখানে ভূমি-বিতরণ আরম্ভ করা হইয়াছিল সেখানেও উহা ত্বরান্বিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। বুদ্ধগয়া-সম্মেলনের পর হইতে ভূমি-বিতরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। ভূমি-বিতরণের ফলে ভূদানযজ্ঞের প্রকৃত ও পরিপূর্ণ স্বরূপ জনগণের নিকট প্রতিভাত হইবে। ভূমি-সংগ্রহ অপেক্ষা ভূমি-বিতরণের কাজ অধিকতর শ্রমসাধ্য ও দায়িত্বপূর্ণ। ভূমি-বিতরণের ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের ন্যায়-পরায়ণ, নিরপেক্ষ মনোভাবসম্পন্ন ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হইতে হইবে। উপরন্তু বিনোবাজী বিতরণ সম্পর্কে যেসব নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা যথাযথ পালন করিতে হইবে। নচেৎ বিতরণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা আছে। বিতরণ সম্পর্কীয় নিয়মাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—(১) বিতরণকার্য গ্রামের সার্বজনিক সভায় করিতে হইবে। (২) বিতরণের নির্দিষ্ট তারিখের সাতদিন পূর্বে একবার এবং একদিন পূর্বে আরেকবার বিতরণের বিজ্ঞপ্তি ঢোলসহরৎ দ্বারা প্রচার করিতে হইবে। (৩) গ্রামের অধিবাসীদের সর্বসম্মতিক্রমে অন্যথায় ভূমি-হীনদের সর্বসম্মতিক্রমে বিতরণ করিতে হইবে। তাহাতে মতভেদ ঘটিলে লটারি করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। সবকার্যই একই সভায় শেষ করিতে হইবে। (৪) ভূমি-বিতরণের ভারপ্রাপ্ত কর্মী সভায় মাত্র

* 'সম্পত্তিদানযজ্ঞ'—পৃঃ ১৬৭ দ্রষ্টব্য।

সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত থাকিবেন, সেবকস্বরূপ থাকিবেন, নির্ণায়কস্বরূপ নহেন। এই ব্যাপারে যেন কিছুমাত্র পক্ষনিষ্ঠদৃষ্টি না থাকে। (৫) যত-দূর সম্ভব দানপ্রাপ্তভূমির এক-তৃতীয়াংশ হরিজনদের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। (৬) সাধারণত যে-গ্রামে ভূমিদান পাওয়া গিয়াছে সেইগ্রামেরই ভূমিহীন দরিদ্রেরা ভূমি পাইবে। ভূমিহীনদের মধ্যে যে-ব্যক্তির কখনও জমি ছিল না তাহার দাবী সর্বাগ্রগণ্য হইবে। সেইগ্রামে বিতরণের পর ভূমি উদ্বৃত্ত থাকিলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের ভূমিহীনগণ ভূমি পাইতে পারে।

ভূমি-বিতরণ ব্যাপারে একটি বিষয় সম্পর্কে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। ভূমি-প্রাপকের মনে যেন এরূপ ধারণা না জন্মে যে, গরীব বলিয়া দয়া করিয়া তাহাকে ভূমি দেওয়া হইতেছে। গরীবকে যে-অধিকার হইতে এতদিন বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল সেই অধিকারই তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হইতেছে। কর্মীদের সমস্ত কাজের মধ্য দিয়া এরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে লোকে মনে করিবে যে, আজ পর্যন্ত ভূমিহীনকে ভূমি দিতে না পারায় সমাজের পক্ষে এক মস্তবড় অন্যায় করা হইতেছিল। ভূদানযজ্ঞের দ্বারা সেইভুলেরই সংশোধন করা হইতেছে।

জমি যিনি নিজে চাষ করেন না এবং বিনা পরিশ্রমে জমির উৎপন্ন ফসল ভোগ করিতে চান, তিনি জমির মালিক হইতে পারেন না। যিনি শ্রম করিতে পারেন তিনি আজ তাঁহার অধিকার ফিরিয়া পাইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার যেন স্মরণ থাকে যে, অধিকারের অপরদিক হইতেছে কর্তব্য। কর্তব্য যথাযথ পালন করিলে তবেই অধিকারলাভ সার্থক হয়। ইহা ভূমি-প্রাপকের হৃদয়ে ভালভাবে অঙ্কিত করিতে হইবে। তাই জমি লইয়া যাহা খুশী তাহা করিবার অধিকার তাঁহার নাই। জমি নষ্ট করিলে, জমিতে কম ফসল উৎপন্ন করিলে অথবা জমি পতিত রাখিলে তিনি ঈশ্বরের নিকট এবং সমাজের নিকট অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন।

সর্বোপরি ভূমি-বিতরণের সময় হইতে ভূমি-প্রাপককে সর্বোদয়ের দীক্ষা দান করিতে হইবে, তাহাকে সর্বোদয়ের ভাবধারায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার পরিবারকে ‘সর্বোদয়-পরিবার’ স্বরূপে সংগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। তাই মাদকতা হইতে তাহাকে বিরত থাকিতে হইবে।

জীবিকার পরিপূরক উপায়স্বরূপ তাহাকে বস্ত্রে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। তজ্জন্য অবিলম্বে সূতাকাটা শিক্ষা করিয়া বস্ত্র-স্বাবলম্বনের জন্য নিয়মিত-ভাবে সূতা কাটিতে হইবে এবং প্রতিবৎসর সূতাঞ্জলি অর্পণ করিতে হইবে। তাহাকে ঢেঁকিতে চাউল তৈয়ারী করিয়া লইতে ও চাকিতে গম পিষিয়া লইতে হইবে। গুড় বা হাতে প্রস্তুত চিনি এবং ঘানির তৈল তৈয়ারী করিয়া লইতে অথবা ব্যবহার করিতে হইবে। এরূপে ক্রমে-ক্রমে সর্বোদয়ের পথে তাহাকে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই ভূমি-বিতরণের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

ভূমির বিখণ্ডীকরণ

এরূপ আক্ষেপ করা হয় যে, ভূদানযজ্ঞের দ্বারা ভূমি আরও টুক্‌রা হইয়া যাইতেছে, কারণ দুই-চারি কাঠা পরিমাণ দানও উহাতে গ্রহণ করা হয়। ঐ আক্ষেপ দূর করিবার জন্য বিনোবাজী বলিয়াছেন—"কিন্তু ভ্রাতৃগণ, আজ হৃদয় টুক্‌রা-টুক্‌রা হইয়া আছে, ইহা কি আপনাদের ভাল লাগিতেছে? আজ সকলেরই হৃদয় টুকরা-টুকরা হইয়া রহিয়াছে। যদি হৃদয়ের টুকরা জুড়িয়া দেওয়া যায় তবে জমির টুকরাও সহজেই জুড়িয়া দেওয়া যাইবে। গরীব-দিগকে জমি দেওয়া হইয়া যাইলে তাহাদিগকে সমবায়ের মন্ত্র শিক্ষা দেওয়া কষ্টসাধ্য হইবে না। প্রথম হইতেই যদি সমবায়ের সর্ত লাগানো যায়, তবে উহা বাহিরের প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইবে এবং উহাতে একজন ম্যানেজারের আবশ্যক হইবে। এইজন্য জমির মালিক পরমেশ্বর—ইহা বুঝাইয়া দিয়া আজ আমি গরীবকে জমির পুরা অধিকার দিতে চাহিতেছি। যদি হৃদয় জুড়িয়া যায় তাহা হইলে জমি জুড়িয়া দেওয়া কি আর কঠিন ব্যাপার হইবে? কোনটা প্রথম জুড়িতে হইবে তখন তাহা তো বুদ্ধির বিষয়। যেখানে হৃদয়ই ভগ্ন হইয়া আছে সেখানে কি জমি জোড়া দেওয়া সম্ভব হইবে? এক ভাই আমাকে বলিয়াছেন যে, 'কো-অপারেশন' করিবার জন্য যখন লোক তৈয়ারী হইবে তখনই আমি জমি দিব। তাহাতে আমি তাঁহাকে বলি যে, 'আপনি লোককে এই জন্য বুঝান।' ইহাতে তাঁহার কিছু অভিজ্ঞতা হইল। কারণ লোকে বলিতে লাগিল—'আমরা সমবায়ের মধ্যে যাইব না। অন্যকাজে আমরা

নিজেরাই সমবায় করি না, আর এইদিকে আমরা ঐ সব গরীব লোকের উপর সমবায়ের সর্ত আরোপ করিতে চাহিতেছি ও বলিতেছি—'সমবায় কর'। তাহাতে উহাদের উপর প্রতিবন্ধক চাপানোর ব্যবস্থা করা হইবে। আর উহারা তো আজ ভীত হইয়া আছে।' তখন সেই ভাই আমার কথা বুঝিতে পারিলেন যে, প্রথমে হৃদয় জুড়িয়া দেওয়া আবশ্যক।"

বিখণ্ডীকৃত ভূমির উৎপাদন

এরূপ আপত্তি করা হয় যে, ভূদানযজ্ঞের ফলে জোত খণ্ডিত হইবে এবং তাহাতে উৎপাদন কম হইবে। এই আপত্তির কোন ভিত্তি নাই। চীন ও জাপানে গড়ে জোত হইল মাত্র দুই একরের মত, কিন্তু উৎপাদন আমাদের দেশের তিনগুণ। উৎপাদনের হার জমি বড় কি ছোট তাহার উপর খুব বেশী নির্ভর করে না। বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া জমি আবাদ করা হয় কিনা তাহাই আসল কথা। যেখানে চাষ-আবাদে বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রয়োগ করা হয় সেখানে বেশী ফসল ফলে। শ্রীমন্নারায়ণ আগরওয়াল তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"পৃথিবীব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে ইহা যথেষ্টভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, জমির ক্ষেত্রফল বর্ধিত হইলে এবং যন্ত্র ব্যবহার করিলে ঐ জমির কৃষিকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিপ্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু একর প্রতিও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুত ভারতবর্ষের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জোতে আত্যন্তিক কৃষিই (intensive cultivation) অর্থনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান। অবশ্য ইহা ঠিক যে, ছোট-ছোট কৃষকদিগকে ভাল বীজ, সার, জল-সেচ এবং সমবায়-পদ্ধতিতে বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় সুবিধা দিতে হইবে।" জমিতে কম-বেশী ফসল উৎপাদনের ব্যাপারে আরও একটি প্রধান কারণ আছে। যেখানে জমিতে চাষীর পুরা অধিকার থাকে সেখানে উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়া থাকে। মজুর বা ভাগচাষীদ্বারা চাষ করিলে উৎপাদন কম হয়। ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতা। চাষীকে জমিতে পুরা অধিকার না দেওয়া পর্যন্ত জমিতে উপযুক্ত সার বা অন্যকোন বৈজ্ঞানিক পন্থা প্রয়োগ করিবার বা জমিতে অধিক পরিশ্রম করিবার দিকে চাষীর প্রেরণা জাগানো সম্ভব নহে। এ

সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"ছোট টুকরায় উৎপাদনের হার অধিক অথবা বড় টুকরায় উৎপাদনের হার অধিক—এই আলোচনা আর কি করিবেন? ইহা তো অর্থশাস্ত্রের এক মামুলী ব্যাপার যে, যে-প্রকার টুকরায় উৎপাদন বেশী হইবে সেরূপ টুকরা তৈয়ারী করা হইবে। আসল কথা, হৃদয় জুড়িয়া গেলে অধিক ফসল হয়—ভূমির কেবল ছোট বা বড় টুকরার দ্বারা তাহা হয় না। পরিশ্রমের দ্বারা অধিক ফসল হয়—ইহা আমাদের অভিজ্ঞতা। ছোট টুকরায় অধিক ফসল উৎপন্ন হয় ইহা জগতের কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে। মজুরকে যদি আমরা জমির মালিক করি, তবে সে প্রেমপূর্বক জমি চাষ করিবে ও তাহাতে জমির উৎপাদন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। যেখানে অধিক ফসল উৎপন্ন হইয়াছে সেখানে অনুসন্ধান লইলে জানা যায় যে, ঐ জমির মালিক গরীব। আর যেখানে ফসল খারাপ হইয়াছে সেখানে অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ঐ জমির মালিক ধনী। Absentee Landlord (অনুপস্থিত মালিক)-এর কথা সকলেই জানেন। অতএব অর্থশাস্ত্রের এইসব ছোটখাট প্রশ্ন উঠাইবেন না। আমাদের কাজ বুনিয়াদী ক্রান্তির কাজ—যাহাতে সমাজের আমূল পরিবর্তন হইবে।"

Ceiling-এর প্রশ্ন

ভূমি-সমস্যা সমাধানকল্পে ভূমি-বণ্টনের কথা আজ দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে কিছুদিন যাবৎ এক বিপজ্জনক কথা উত্থাপন করা হইতেছে। তাহা হইতেছে জমির মালিকদের সবচাইতে কতবেশী জমি রাখিতে দেওয়া হইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া সেই ব্যবস্থা করা। সিলিং (Ceiling) নামে এইকথা আজকাল দেশে দেশে চালু হইয়াছে। অনেকে ভবেন, সিলিং ধার্য করিয়া দিলে ভূমি-সমস্যার সমাধান সহজ হইয়া পড়িবে। এই ধারণা ভ্রান্ত। যাঁহারা সিলিং-এর কথা উত্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। বড়-বড় জমির মালিকের মালিকানা কত-দূর রক্ষা করা যায় তাহাতেই তাঁহাদের আগ্রহ। ভূমিহীন দরিদ্রেরা জমি পাইবে কি পাইবে না, তাহাতে তাঁহাদের আগ্রহ নাই। অথচ ভূমিহীন দরিদ্রের জন্য ভূমির ব্যবস্থা করার সমস্যা আজ দেশের সবচাইতে জরুরী ও

বুনিয়াদী সমস্যা। ভূমিহীন দরিদ্রের জন্য প্রথমে ভূমির ব্যবস্থা করা, পরে অন্যসব কথা। এই বুনিয়াদী সমস্যাকে অগ্রাধিকার দান করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। যদি আমরা তাহা করি, তবে সিলিং-এর প্রশ্ন উঠে না। অথবা যদিবা উঠে তবে তাহা নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়ে। অন্যদিকে যদি সিলিং-এর কথা অগ্রগণ্য করিয়া অগ্রসর হই, তবে বড়-বড় ভূমির মালিকেরা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে জমি হস্তান্তর করিয়া দিয়া নিজেদের হাতে সিলিং-এর অনতিরিক্ত জমি রাখিয়া দিবার চেষ্টা করিবে। সিলিং ধার্য হইবে এই আশঙ্কায় জমির বড়-বড় মালিকেরা ইতিমধ্যেই ঐভাবে বহু জমি হস্তান্তর করিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। অতএব কম করিয়া সিলিং ধার্য করিলেও ভূমিহীনের জন্য বেশীকিছু অবশিষ্ট থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। প্রথমে প্রত্যেক পরিবারকে ৫ একর করিয়া জমি দেওয়া হউক, অতঃপর উদ্বৃত্ত জমি লইয়া যাঁহারা সিলিং ধার্য করিতে চাহেন তাঁহারা তাহা পরে করিতে পারিবেন। তাই বিনোবাজী সিলিং ধার্য করিবার নিতান্ত বিরোধী। তিনি এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, "সিলিং-এর কথা বিপজ্জনক। এই কথা আমাদের উঠানো ঠিক হইবে না। আজ ঐ কথা সকলে বলিতেছে। আমি বলিয়াছি, আমি সিলিং চাই না—আমি চাই 'ফ্লোরিং'। সকলে এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লউক যে, প্রত্যেক পরিবারকে ৫ একর করিয়া জমি দিতে হইবে এবং উহার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা লইয়া যাহা হউক করা যাইতে পারে। কোন-কোন লোক বলেন—আপনার কথামত 'রুফিং' করিলে এত নীচু হইবে যে, ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। আমি বলিয়াছি—তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। আমার দিল্লীর 'সিলিং'-এর প্রয়োজন হইবে না—গ্রামের 'সিলিং' চাই। আমি রাঁচীতে দেখিয়াছি যে, ৩০ একরের 'সিলিং' হইলেও ভূমিহীনেরা কোন জমি পাইবে না। জমিওয়ালা লোকেরা নিজেদের পরিবারের লোক ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ঐ জমি বণ্টন করিয়া লইবে। তেলেঙ্গানাতেও সিলিং-এর কথা চলিয়াছিল। সেখানে জমির মালিকেরা ঐরূপই করিয়াছিল। সেখানে দুইশত একরের সিলিং করিবার কথা হইয়াছিল। যদি ৩০ একরের মত ছোট সিলিং ধার্য করা হয়, তবে অনেক ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। বিনা ক্ষতিপূরণে আজ কোন জমি কাড়িয়া

লওয়া চলে না। আর বড় সিলিং রাখিলে তাহাতে কোন জমিই পাওয়া যাইবে না। এইজন্য আমরা চাহিতেছি যে, গ্রামের জমি গ্রামের সব লোকেরই হউক। সবচাইতে বেশী তিনগুণ পর্যন্ত জমি রাখিতে পারা যাইবে এরূপ কথাও হইয়াছে। কিন্তু যদি সকলেই পুরা খাইতে না পায়, তবে কাহাকেও তিনগুণ করিয়া খাইবার অধিকার কেন দেওয়া হইবে? কোনব্যক্তি অন্য-কোন লোকের চাইতে তিনগুণ জমি চাষ করিতে পারে না। তবে তিনগুণ জমি রাখিবার অধিকার কেমন করিয়া তাহার হইবে? অতএব এই সমস্ত আলোচনায় কোন সার পদার্থ নাই। আমাদিগকে বুনিয়াদী বিষয় সম্পর্কে ভাবিতে হইবে। আমরা চাই যে, গ্রামের জমি গ্রামেরই হইবে। সরকার আইনের বলে ইহা করিতে পারিবেন কি? সিলিং ধার্য করিলে কী কাজ হইবে? আজ বড়-বড় লুণ্ঠনকারী রহিয়াছে। উহার স্থলে ছোট-ছোট লুণ্ঠনকারীর সৃষ্টি হইবে। তাহাতে লুণ্ঠনকারীদের দল বৃদ্ধি হইবে মাত্র।" ঐ সম্পর্কে অন্য একস্থানে তিনি ঐ কথাই বলিয়াছেন। —"ভূমি-সমস্যা সমাধানের জন্য সিলিং-এর কথা উঠিতেছে। কিন্তু সিলিং-এর দ্বারা কাজ হইবে না, ফ্লোরিং-এর প্রয়োজন। যদি আইন করিতে হয়, তবে এমন আইন করা দরকার যাহাতে প্রত্যেক কৃষক কমপক্ষে ৫ একর করিয়া ভূমি পায়।"

কৃষি সর্বোত্তম শরীরশ্রম ও শ্রেষ্ঠ জীবিকা

বিনোবাজী সবরমতী-আশ্রমে থাকাকালীন রান্না করার কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া মেথরের কাজ পর্যন্ত আশ্রমের সর্বপ্রকার শরীর-শ্রমের কাজেই অংশগ্রহণ করিতেন। ওয়ার্ধা সত্যাগ্রহ-আশ্রমের পরিচালকরূপে তিনি আশ্রমবাসীদিগের পক্ষে যে-একাদশ ব্রত পালন অত্যাবশ্যক বলিয়া স্থির করেন তাহার মধ্যে শরীর-শ্রম অন্যতম। সূতাকাটার সর্বপ্রকার প্রক্রিয়ায় তিনি বিশেষজ্ঞ। বয়নের কাজ, ছুতারের কাজ প্রভৃতি সর্বপ্রকার উৎপাদক শ্রমের কাজ তিনি নিজহাতে বহুদিন যাবৎ করিয়াছেন। পওনার 'পরম-ধাম'-আশ্রমে 'কাঞ্চনমুক্তি'-সাধনায় তিনি কৃষির কাজ গভীরভাবে করিয়াছেন এবং উহার সূক্ষ্মদর্শন লাভ করিয়াছেন। এরূপে এই শ্রমযোগী উৎপাদক-শ্রমমূলক কাজের সহিত কৃষিকার্যের তুলনামূলক বিচার করিয়া এই অনুভব-

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যতপ্রকার শরীর-শ্রমের কাজ আছে তন্মধ্যে ক্ষেতের কাজ সবচাইতে উত্তম। কেন-যে কৃষির কাজ সর্বোত্তম শরীর-শ্রম তাহা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যে ঃ—

(১) কৃষির কাজে স্বচ্ছ ও মুক্ত হাওয়ায় ব্যায়াম হয়।

(২) কৃষি কাজ করিতে করিতে আকাশ সেবন করা হইয়া থাকে।

(৩) কৃষিকার্যের দ্বারা মৌলিক উৎপাদন হয়। অর্থাৎ অন্য যাহা-কিছু উৎপন্ন করা হয় তাহা কৃষিজাত দ্রব্য হইতে বা কৃষিজাত দ্রব্যের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়।

(৪) কৃষির কাজ সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক কাজ।

(৫) কৃষিক্ষেত্রের বিরাট মূর্তি ঈশ্বরের সর্বোত্তম মূর্তি। তাই কৃষির কাজ হইতেছে পরমেশ্বরের উপাসনা।

(৬) ক্ষেতে কাজ করিলে মানুষ দীর্ঘজীবী হইবে ও দেশে রোগ কম হইবে।

(৭) কৃষির কাজ করিলে ব্রহ্মচর্য-পালন সহজসাধ্য হইয়া থাকে। কৃষির কাজ ব্রহ্মচর্য পালনে অধিকতর সহায়তা করিয়া থাকে।

এইজন্য প্রাচীনকাল হইতে ঋষিগণ জীবিকা উপার্জনের কাজের মধ্যে কৃষিকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া আসিয়াছেন। এইপ্রসঙ্গে মনু কি বলিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ হইতে পারে। তাই মনুসংহিতা হইতে এতদ্-সম্পর্কীয় বচন উদ্ধৃত করা হইল।

"ঋতামৃতাভ্যাং জীবেৎ তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাখ্যয়া বাপি ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥"

"ঋতবৃত্তি ও অমৃতবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, অথবা মৃত-বৃত্তি বা প্রমৃতবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, কিংবা সত্যানৃত-বৃত্তির দ্বারাও জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, কিন্তু জীবিকার জন্য কদাপি শ্ববৃত্তি (কুক্কুরবৃত্তি) অবলম্বন করিবে না।"

ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত ইত্যাদি বৃত্তি কাহাকে বলে? উহাদের অর্থ কি? উহাদের অর্থ এই ঃ—

"ঋতমুঞ্ছশিলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতম্।
মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্॥"—

"ভূপতিত ধান্যাদির কণাসমূহ কুড়াইয়া লইয়া তাহার দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করার নাম উঞ্ছবৃত্তি। ধান্যাদির শিষ কুড়াইয়া লইয়া জীবিকা-নির্বাহের নাম শিলবৃত্তি। এই দুইটি বৃত্তিকে ঋতবৃত্তি বলে। অযাচিত-ভাবে যাহা উপস্থিত করা হয় তাহাতে জীবনধারণ করার নাম অমৃতবৃত্তি। যাচিতভাবে পাইয়া (ভৈক্ষ) তাহার দ্বারা জীবনধারণ করার নাম মৃতবৃত্তি। কৃষিকে প্রমৃতবৃত্তি বলে।"

ইহার পরে বলিতেছেন—

"সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে।
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জয়েৎ।"—

"বাণিজ্যের নাম সত্যানৃত বৃত্তি। তাহার দ্বারাও জীবনযাপন করিতে পারে। কিন্তু সেবা বা চাকুরী যাহা শ্ববৃত্তি বা কুক্কুরবৃত্তি বলিয়া খ্যাত—তাহা সর্বতোভাবে পরিবর্জন করিবে।"

এরূপে মনুসংহিতায় জীবিকা উপার্জনের উপায় কৃষি, বাণিজ্য ও চাকুরী—এই তিনটির মধ্যে কৃষিকেই শ্রেষ্ঠস্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আজ সমাজের দৃষ্টিকোণ উহার ঠিক বিপরীত। আজ চাকুরীকে সব-চাইতে সম্মানজনক জীবিকা বলিয়া গণ্য করা হইতেছে এবং কৃষি এই তিনের মধ্যে কার্যত নিকৃষ্টবৃত্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ইহাই বর্তমান সমাজের বহু দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ।

পরশুরাম হিংসার আশ্রয় লইয়া ধরাকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করিবার পর যখন তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি চিরতরে অস্ত্রত্যাগ করিয়া কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ইহাদ্বারা দ্রোহরহিত বৃত্তিস্বরূপে কৃষির মহত্ত্ব সূচিত হইতেছে।

সকলেই ভূমি পাইবার অধিকারী

যেব্যক্তির জীবিকার জন্য অন্যকোন উপায় নাই, সেইব্যক্তি যদি জমি চাষ করিতে জানেন ও নিজহাতে জমি চাষ করিতে চাহেন, তবে তাঁহার জমি

পাইবার অধিকার আছে—একথা বুঝা কঠিন নহে। কিন্তু বিনোবাজী দেশে তথা জগতের সম্মুখে এই মহান দাবী উত্থাপন করিয়াছেন যে, জীবিকার জন্য অন্য কাজ থাকুক বা না-ই থাকুক যেকোন ব্যক্তি নিজহাতে জমি চাষ করিতে চাহিবেন তাঁহার কিছু-না-কিছু জমি পাওয়ার নৈতিক অধিকার আছে। আপাতদৃষ্টিতে এই দাবী অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই অধিকারের ভিত্তি সম্পর্কে বিনোবাজী যাহা বলিয়াছেন তাহা একটু গভীরভাবে অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাঁহার এই দাবী দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কেন এই নৈতিক অধিকার থাকা চাই—এ সম্পর্কে বিনোবাজী যাহা বলেন তাহা হইতেছে ঃ—

(১) কৃষির কাজ সর্বোত্তম শরীর-শ্রম ও শ্রেষ্ঠ উদ্যোগ। উহা স্বাভাবিক ও জীবনপ্রদ ব্যায়াম। কৃষিকার্য কেন-যে সর্বোত্তম শ্রম ও শ্রেষ্ঠ উদ্যোগ তাহা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। যে-যে কারণে কৃষি-কার্য সর্বোত্তম শরীর-শ্রম বলিয়া পরিগণিত হয় সেই-সেই কারণেই যেব্যক্তি নিজহাতে জমি চাষ করিতে চাহিবেন তাঁহার জন্য, যতই অল্প হউক না কেন, একটু জমির ব্যবস্থা না করা অনুচিত হইবে। মানুষ হিসাবে তাহার এই নৈতিক অধিকার থাকা উচিত।

(২) ভূমি অন্ন-উৎপাদনের একমাত্র সাধন এবং উহা মৌলিক উৎপাদনেরও প্রধানতম ক্ষেত্র। সুতরাং জমি তথা কৃষির উন্নতির জন্য সকলের দৃষ্টি থাকা ও প্রযত্ন করা আবশ্যক। যদি সকলের হাত ভূমিতে লাগে, তবে সকলের বুদ্ধির প্রয়োগও ভূমিতে পড়িবে।

(৩) জীবনবিকাশের পক্ষে কৃষি অপরিহার্য। এজন্য জীবিকা অর্জনের জন্য যিনি যে-কাজ করেন করুন, কিন্তু তাঁহার কিছু সময়ের জন্য প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ক্ষেতে কাজ করা উচিত। বিনোবাজী বলেন, তিনি দৈনিক অবিরত ৮ ঘণ্টা করিয়া বয়নকার্য করিতেন। তখন তিনি তীব্রভাবে অনুভব করিতেন যে, ৮ ঘণ্টাকাল ঝুঁকিয়া বসিয়া থাকিতে-থাকিতে তাঁহার ঘাড়, মেরুদণ্ড ও কোমর বাঁকিয়া গিয়াছে এবং উহা স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে তাঁহাকে বেশ কষ্ট পাইতে হইত। এজন্য তিনি বলেন যে, তন্তুবায়, কর্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতি গৃহশিল্পীগণ সকলেই নিজ-নিজ

জীবিকার কাজ করিবেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যেন প্রত্যহ ২।৪ ঘণ্টা করিয়া ক্ষেতেও কাজ করিবার সুযোগ পান। নচেৎ তাঁহাদের কাজ আনন্দদায়ক, জীবনপ্রদ ও অধিকতর উৎপাদনশীল হইতে পারিবে না। অন্যান্য জীবিকা যাঁহারা অনুসরণ করেন তাঁহাদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। চাষীর যেমন প্রত্যহ দুই-চার ঘণ্টা ক্ষেতে কাজ করা উচিত, তেমন জজ সাহেবেরও দৈনিক কিছুসময় নিয়মিতভাবে ক্ষেতে কাজ করা উচিত।

তাই বিনোবাজী বলেন, লেখাপড়া না জানিলে জীবনের বিকাশ হয় না—এইরূপ বলা হয়। কিন্তু উহার পরিবর্তে কোন্ দেশের কতলোক কৃষিকাজ করে তাহা দেখা আবশ্যক।

জনসংখ্যা-বৃদ্ধি ও খাদ্য-উৎপাদন

ভারতে জনসংখ্যা খুবই দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহার ফলে খাদ্য-সমস্যার স্থায়ী সমাধান সুদূর পরাহত হইতে পারে—এই আশঙ্কায় জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন ও অনেক সুধীব্যক্তি family planning অর্থাৎ জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিয়া থাকেন। এই বিষয়টি গভীরভাবে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। বর্তমান লোক-গণনার বিবরণে প্রকাশ যে, ভারতে প্রতি হাজার-ব্যক্তির (পুরুষ ও স্ত্রীলোক) বৎসরে ৪০টি করিয়া সন্তান জন্মে। এই জন্মের হার জগতের মধ্যে সবচাইতে বেশী। এইদেশে মৃত্যু-সংখ্যার হারও সবচাইতে বেশী অর্থাৎ প্রতি হাজার-ব্যক্তির মধ্যে বৎসরে ২৭ জনের মৃত্যু হয়। এই অত্যধিক জন্ম ও মৃত্যু-হারের প্রকৃত কারণ কি? জৈব-বিজ্ঞানের নিয়মে সাধারণত যে-অঞ্চল ও যে দেশ বা যে-শ্রেণী যত দরিদ্র তাহার জন্ম-সংখ্যার হারও তত বেশী। দারিদ্র্যজনিত পুষ্টির অভাবই অধিক জন্ম-হারের কারণ বলিয়া কথিত হয়। ইহা-যে সাধারণভাবে সত্য সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। দারিদ্র্য-যে অধিক মৃত্যু-হারেরও কারণ এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের গুরুতর নৈতিক অপকারিতার কথা না ধরিয়াও যদি বিচার করা যায় তথাপি বুঝা যাইবে যে, বর্তমান অবস্থায় জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপদেশে বিশেষ কিছু ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। যেসব দরিদ্রশ্রেণীর জন্য জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বেশী প্রয়োজন মনে

করা হয় তাঁহাদের কানে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বাণী পেঁাছিবে না এবং পেঁাছিলেও তাহা তাঁহাদের বর্তমান শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কারের অবস্থায় কখনও পালিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। অন্যদিকে যাঁহাদের মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নাই তাঁহারা এইরূপ আন্দোলনের ফলে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া নৈতিক অবনতির গভীর গহ্বরে নামিয়া যাইতেছেন। সংযম পালন করিয়া যাঁহারা সুফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন এমন বিবাহিত নেতৃস্থানীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে যাইয়া যদি সংযম অভ্যাস করার জন্য উপদেশ দেন, তবেই তাহার সুফল হইতে পারে। একমাত্র সংযত জীবন দেখিয়া অন্যে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। জন্ম-হার হ্রাস করিবার সবচাইতে কার্যকরী ব্যবস্থা হইতেছে অবিলম্বে দারিদ্র্য দূর করিবার ব্যবস্থা করা। ভূমির সম্যক বণ্টন ও পল্লী-শিল্পের প্রতিষ্ঠাদ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে। বর্তমান অবস্থায় মাত্র এই দুই উপায় একসঙ্গে অবলম্বন করিলে ভারতের দারিদ্র্য ঘুচিবে। তাই এই আন্দোলনের সাফল্যের জন্য আরও নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

সত্যই কি জনসংখ্যাবৃদ্ধির কারণে কখনও পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাব হইবার আশংকা আছে? এরূপ আশংকা আছে বলিয়া মনে হয় না। কথায় বলে—যাঁর সৃষ্টি তিনিই খাওয়াইবার ভার নেন। ইহাকে অন্ধসংস্কার-জনিত ধারণা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। বাস্তবক্ষেত্রে ইহা সত্য বলিয়া দেখা গিয়াছে। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঐ দিকে পশ্চিমে বিজ্ঞানের বিকাশ হওয়ার পর তথায় কৃত্রিম নীল উৎপাদিত হইতে থাকায় ভারতের বিশালক্ষেত্রের নীলচাষ বন্ধ হইয়া গিয়া অধিক খাদ্যশস্যাদি উৎপাদনের সুবিধা হইল। কে জানে, জনসংখ্যার চাপ যখন আবার বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে তখন পাট-উৎপাদনের আর কোন প্রয়োজনই থাকিবে কি না। তখন ভারতের কোটী-কোটী একর ভূমি খাদ্য-উৎপাদনের জন্য মুক্ত হইবে। বর্তমানে কোন-কোন দেশে কাগজ ও কাপড়ের থলিয়া প্রস্তুত করা হইতেছে। উপরন্তু কৃত্রিম (Synthetic) থলিয়াও তৈয়ারী করা হইতেছে এবং সেইসব স্থানের থলিয়ার প্রয়োজনও তাহার দ্বারা মিটানো হইতেছে। ইহা কি উপরোক্ত সম্ভাবনারই সূচনা দান করিতেছে না? দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

বিশ্বলক্ষেত্রে রবার-চাষের সম্বন্ধেও ঐরূপ ভাবা যাইতে পারে। এক সময় আসিতে পারে যখন রবার-চাষের কোন প্রয়োজন হইবে না। অতএব খাদ্যের অভাবের আশঙ্কায় জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার বিশেষ কোন কারণ নাই।

বিনোবাজী জনসংখ্যার চাপের প্রতিকারের জন্য জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবে বিচলিত হইয়া এই সারগর্ভ কথাগুলি উচ্চারণ করেন—"আপনারা family planning বা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করিয়াছেন অর্থাৎ 'সন্তান জন্ম দেওয়া কম কর'—এই কথা বলিতেছেন। কিন্তু একথা আমাকে বলিবার আপনাদের কী অধিকার আছে? আপনারা কি আমার ভৃত্য না প্রভু? জাপান বা ইংলণ্ডে জমির উপর যে-চাপ রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক কম চাপ ভারতের জমির উপর। কেন জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা কি আপনারা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? সিংহের খুব কম বাচ্চা হয়, আর ছাগের বেশী বাচ্চা হয়।

"ইহার প্রকৃত প্রতিকার জন্ম-নিয়ন্ত্রণে নহে। জীবনকে ঠিক পথে পরিচালনা করাই ইহার প্রতিকারের উৎকৃষ্ট পন্থা।"

এ অবস্থা অসহনীয়

বিহারের ভূমি-সমস্যার সমাধান হইলেও অন্যান্য প্রদেশের কাজ তো বাকী থাকিবে। তখন উহার জন্য কি করা হইবে?—এই প্রশ্নের উত্তরে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"বিহারের সমস্যার সমাধান হইবার পরও অন্যান্য প্রদেশের লোক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে—এরূপ চিন্তা করা ভুল। হয় সেখানকার সরকার আইন প্রণয়ন করিবে, না হয় কর্মিগণ কাজে লাগিয়া যাইবেন এবং না হয় সেখানকার লোক বলপ্রয়োগ করিবে—সেখানে রক্ত-রঞ্জিত রাষ্ট্র-বিপ্লব সংঘটিত হইবে। যদি এরূপ বিপ্লবও হয়, তবে তাহাতে আমি বরং খুশীই হইব। কিন্তু বর্তমান অবস্থা অসহনীয়। এইজন্য যদি সেখানে বিপ্লব আসে, তবে তাহাকে ঠেকাইবার আমি কে? আজিকার যে-পরিস্থিতি তাহা আমি কোন অবস্থায়ই সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি।" কিন্তু বিনোবাজী বিশ্বাস করেন যে, বিহারের সমস্যার সমাধান হইলে তখন অন্যান্য

প্রদেশে ঐরূপ কোন হিংস্র-বিপ্লব সংঘটিত হইবার অবকাশ আসিবে না। তাই তিনি ঐ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"আজ পৃথিবীর অবস্থা এমন যে, পৃথিবীর কোন এক কোণে কিছু ঘটিলে সর্বত্র ঐ কথা ছড়াইয়া পড়ে। যখনই কাশ্মীরের রাজা রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন, তখনই অন্যসব রাজার গদি টলিতে লাগিল। যখনই অন্ধ্ররাজ্য গঠিত হইবে, তখনই অন্য রাজ্যগুলির উপর প্রভাব পড়িবে। প্রাচীনকালে এরূপ অবস্থা হইত না। এখন তো একস্থানের প্রভাব অন্যস্থানে না হইয়া যায় না। তাই যদি আমাদের এখানকার সৈন্যদল সফলতাপ্রাপ্ত হয়, তবে ঐ সেনাই বাহিরে যাইবে। আমাদের ঐ সেনা এমনভাবে তৈয়ারী হইবে যে, উহারা কৃতকার্য হইবেই হইবে।" এইজন্য তিনি অন্যান্য প্রদেশের কর্মিগণকে উপদেশ দেন যে, তাঁহারা যেন নিজ-নিজ প্রদেশের সর্বত্র অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন। উপরন্তু প্রদেশের মধ্যে যেন এমন এক বিশিষ্ট ছোট স্থান বাছিয়া লন, যেখানে কাজ অগ্রসর হইলে সারা প্রদেশে উহার প্রভাব পড়িবে। এরূপ স্থানকে তিনি 'স্ট্রাটেজিক পয়েন্ট' (strategic point) বলিয়া থাকেন। এরূপ একস্থানে সকলে মিলিত হইয়া আত্যন্তিক ও কেন্দ্রীভূতভাবে কাজ করিয়া সফলতালাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার প্রতিক্রিয়ায় সারা প্রদেশ ক্রমশঃ সাড়া দিতে থাকিবে। এই দৃষ্টি হইতে বিহারের গয়া জেলাকে বাছিয়া লইয়া সেখানে কেন্দ্রীভূত ও আত্যন্তিকভাবে কাজ করা হয় এবং তাহার ফল সারা প্রদেশে আশাতীতভাবে পাওয়া যায়।

সনাতন-ধর্ম

ভূমি-সমস্যার সমাধান হইলেই আমাদের কাজ শেষ হইবে না। অর্থাৎ আমরা যে-ক্রান্তি চাহিতেছি তাহা মাত্র ভূমি-ক্রান্তি নহে। উহা বিচার-ক্রান্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। বিনোবাজী এক ধর্ম-বিচার প্রবর্তন করিতে চাহিতেছেন। সে ধর্ম-বিচার সনাতন; কিন্তু তাহা আজিকার হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি ধর্মের অর্থে 'ধর্ম' নহে। এই ধর্ম-বিচার প্রবর্তনকে তিনি 'ধর্ম-চক্র-প্রবর্তন' আখ্যা দিয়াছেন। ইহা কি, তাহা আমরা পূর্বে বুঝিয়াছি। তবে এই ধর্ম-বিচারকে কী অর্থে 'সনাতন' বলা হইয়াছে তাহা

একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বুঝা প্রয়োজন। কারণ তাহাতে এই ধর্ম-বিচার বর্তমান সমাজে কোন্ স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা সুস্পষ্ট হইবে। এই সনাতন-ধর্মের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন—"'সনাতন' শব্দের ব্যবহার বহু হইয়া থাকে। কিন্তু উহার অর্থের বোধ সকলের নাই। ধর্ম দুই প্রকারের হয়। এক তো যাহার পরিবর্তন হয় না। যেমন সত্য-পালন। প্রাচীনকালে উহা ধর্মস্বরূপ ছিল এবং আজও আছে। ভারতভূমিতে উহা ধর্মস্বরূপ এবং অন্যদেশেও তাহাই। এজন্য উহাতে দেশ-কালের ভেদ লাগে নাই। অতএব উহা নিত্য ও সনাতন ধর্ম। এইরূপ প্রেম, বাৎসল্য—এইসব সনাতন-ধর্ম। উহার আচরণে ঐ সনাতন-ধর্ম পালনের জন্য পুরাকালে যে-আচারনিষ্ঠা ছিল, তাহা দেশ-কাল ও পাত্র অনুসারে বরাবর বদলাইয়া আসিতেছে। সকলের জন্য ভক্তি সনাতন-ধর্ম এবং সকলের জন্য উহা সমান—যদিও উপাসনার পদ্ধতি পৃথক পৃথক হইয়া থাকে। অতএব যে সনাতন-ধর্ম ধর্মের সার ও আত্মস্বরূপ সেই সনাতন-ধর্মকে ধরিয়া থাকা ও নিয়ত উহার ধ্যান করা আমাদের কর্তব্য। ধর্মের পরিবর্তনশীল অঙ্গের দিকে আমি ধ্যান দিতেছি না। কিন্তু ধর্মের যাহা সার তাহা আমি লোককে দিতেছি। উহা সনাতন। উহা পরিবর্তনশীল নহে এবং উহা তিনকাল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সর্বত্র সমতা ও একতা স্থাপন করা চাই, ইহা সত্ত্বেও মানুষের বাহ্য-জীবনে বৈষম্য ও বিভিন্নতা থাকিবে। কিন্তু সমতাস্থাপন করা আমাদের ধ্যেয় থাকিবে। সন্তানগণ যখন ছোট থাকে, তখন তাহাদিগকে অনুশাসনে রাখা মাতাপিতার কর্তব্য। কিন্তু যখন উহারা যুবক হইয়া উঠে, তখন উহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া ও উপদেশ দেওয়া মাতাপিতার কর্তব্য। যখন মাতাপিতা বৃদ্ধ হন, তখন সন্তানদেরই অনুশাসনে থাকা তাঁহাদের কর্তব্য হইয়া পড়ে। এইভাবে ধর্ম বদলাইতে থাকে। কিন্তু সন্তানদের স্নেহ করা ও উহাদের সেবা করা মাতাপিতার তিনকালের সমান ধর্ম। অতএব সন্তানকে স্নেহ করা এক সনাতন-ধর্ম। ঐরূপে সমাজের অবস্থার পরিবর্তন হইলে উহার ধর্মেরও পরিবর্তন হইয়া থাকে। যখন সমাজ বাল্যাবস্থায় ছিল তখন রাজার আবশ্যকতা ছিল। ঐ সময়ে প্রজাগণকে অনুশাসনে রাখা রাজাদের

ধর্ম ছিল এবং রাজার আজ্ঞা পালন করা প্রজার ধর্ম ছিল। কিন্তু এখন সমাজ আর বাল্যাবস্থায় নাই। এইজন্য এখন রাজাদের কাজ শেষ হইয়াছে এবং লোক-প্রতিনিধিদের হস্তে রাজ্য-পরিচালনার ক্ষমতা আসিয়াছে। এখন 'রাজা কালস্য কারণম্' নহে, এখন তো 'প্রজা কালস্য কারণম্' হইয়াছে। পুরাকালে সম্রাট এবং বিদ্বানেরও যে-জ্ঞান ছিল না সেইজ্ঞান এখন বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সাধারণ লোকের হইয়াছে। আকবর বাদশাহ জানিতেনই না যে, আমেরিকা কি জিনিস বা মস্কো কোথায়? কিন্তু আজ তো স্কুলের ছেলেরাও ইহা জানে। কিন্তু সমগ্র সমাজকে একরূপ (একরস) করিয়া তোলা ও সমাজে অধিক সমানতা আনয়ন করা—ইহা যে-মূলতত্ত্ব তাহা দুইকালেই সমান রহিয়াছে। সমানতার জন্য প্রাচীনকালে ভূমি-বণ্টনের প্রয়োজন ছিল না; কারণ ঐ সময়ে বহুজমি পতিত থাকিত এবং জনসংখ্যাও কম ছিল। কিন্তু এখন ভূমি-বণ্টনের প্রয়োজন হইয়াছে।[1]

যুগধর্ম

ভূদানযজ্ঞ 'যুগধর্ম'। যুগধর্মের অর্থ এবং কেন-যে ভূদানযজ্ঞকে যুগধর্ম বলিয়া মান্য করা উচিত তাহা ভালভাবে বুঝা আবশ্যক। ইহা বুঝিতে পারিলে লোকে ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রেরণা লাভ করিবে। দেশে কোন এক সময়ে সমাজের তৎকালীন অবস্থা অনুযায়ী এমন এক কার্যের জরুরী প্রয়োজন হয় যাহা সাধিত হইলে দেশের অন্য বহুতর সমস্যা আপনা-আপনি মিটিয়া যায়। দেশের সর্ববিধ কল্যাণ ও প্রগতির পথ সুগম হয়। আর বিফল হইলে দেশের সর্বপ্রকার কল্যাণ-প্রচেষ্টাই বৃথা ও পণ্ড হইয়া যায় এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধান অসম্ভব হইয়া পড়ে। "এক সাধে সব সাধ।"—এরূপ মহান কর্তব্য-কর্মকে যুগধর্ম বলা হয়। ইতিপূর্বে যেসব আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, অবিলম্বে শান্তির পথে ভারতের ভূমি-সমস্যার সমাধান না হইলে দেশে 'জ্বালামুখী' প্রজ্জ্বলিত হইবে ও দেশের অন্যকোন বৃহৎ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব হইবে না। দেশে সরকারী বা বেসরকারী-ভাবে যেসব কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহা সবই বিগড়াইয়া যাইবে।

অর্থনৈতিক সাম্যপ্রতিষ্ঠা মহাত্মা গান্ধীর ব্যবস্থিত গঠনকর্মের অন্যতম। কিন্তু সমাজের বিভিন্নদিকের অবস্থার পরিণতি এমন চরমে উঠিয়াছে যে, উহাকে এখন আর শুধু অন্যতম গঠনকর্ম হিসাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। পরন্তু উহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করিয়া সমস্ত শক্তি উহাতে বিনিয়োগ করিতে হইবে এবং সর্বপ্রথমে ও অবিলম্বে উহাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। নচেৎ অন্য যাহাকিছু গঠনকর্মের প্রচেষ্টা করা হইতেছে তাহা সবই নষ্ট হইয়া যাইবে, সবই বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িবে এবং অন্যকোন বৃহৎ সমস্যার সমাধান করাও সম্ভব হইবে না। যদি শান্তির পথে ভূমি-সমস্যার সমাধান হয় ও সামাজিক সাম্যপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠে, তবে সমস্ত রচনাত্মক প্রচেষ্টার পথই সাফল্যের সঙ্গে উন্মুক্ত হইবে। এইজন্যই ভূদানযজ্ঞ এই যুগের 'যুগধর্ম'। তাই বিনোবাজী বলিয়াছেন—"আপনাদের সকলকে আমি এই কথা বলিতে চাই যে, ভূদানযজ্ঞের কাজ একটি ভাল কাজ —কেবল ইহা মনে করিয়াই আপনারা যেন এই কাজ না করেন। পরন্তু ইহা যুগধর্ম, ইহা এমন এক কাজ যাহা সফল হইলে অন্যসব কাজও সফল হইবে এবং বিফল হইলে অন্যসবই বিগড়াইয়া যাইবে—এরূপ অনন্য ও অব্যভিচারীভাব আপনাদের মনে যদি উদয় হয়, তবেই প্রত্যেকের সর্বোত্তম শক্তি ইহাতে নিয়োগ করিবার প্রশ্ন আসে।"

স্বধর্ম এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম

ভূদানযজ্ঞের সংকল্প সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে গভীর, জরুরী ও একাগ্রভাবে এইকাজে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক। ভূদানযজ্ঞের কর্মিগণ এইকাজকে 'স্বধর্ম' গণ্য করিয়া ইহাতে অনন্যভাবে আত্মনিয়োগ করুন—বিনোবাজী ইহা চাহেন। যাঁহারা ভূদানযজ্ঞে ভূমিদান দিবেন তাঁহাদের সকলকে ভূদানযজ্ঞের সেবক, কর্মীস্বরূপ গণ্য করা হইবে। দরিদ্র কৃষক-দাতাগণকে তো ভূদানযজ্ঞের সৈনিক বলিয়াই মানা হয়। তাই 'স্বধর্ম' কী —তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক, যাহাতে প্রত্যেকে নিজের অন্তর্দৃষ্টিতে উহা তাঁহার স্বধর্ম কি-না তাহা বুঝিয়া লইতে পারেন।* এই প্রসঙ্গে

* বিনোবাজীর 'গীতা-প্রবচন'-এর ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

'নিত্যধর্ম' ও 'নৈমিত্তিক ধর্মে'র পার্থক্যও হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। 'স্বধর্ম' 'নিত্যধর্ম' ও 'নৈমিত্তিক ধর্মে'র ব্যাখ্যা করিয়া কর্মীদের উদ্দেশ্যে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"কখন-কখন আমাদিগকে ঘর-সংসারের চিন্তায় থাকিতে হয় এবং সেইজন্য আমরা বেশী সময় বাঁচাইতে পারি না। তাহাই আমাদের নিজেদের সামর্থের সীমা মনে করিয়া সমাধান জানিয়া লইতে হইবে। ঘরের কাজ ছাড়া কোন সর্বজনিক কাজও আমাদের করিতে হয়। তাহার জন্য যদি আমরা অন্য নূতন কাজ করিতে না পারি, তবে পুরাতন কাজের সহিত নূতন কাজের ওজন করিয়া দেখা কর্তব্য। কিন্তু নূতন কাজের ওজন যদি অপেক্ষাকৃত বেশী হয়, তবে পুরাতন কাজ-যে পরিত্যাগ করিতে হইবে এমন কথা নহে। ধর্মের ব্যাপারে যে-ধর্ম শ্রেষ্ঠ তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে এবং যাহা লঘিষ্ঠ তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে—এমন কথাও নহে। পরন্তু ইহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, যে-কাজ আমাদের হাতে রহিয়াছে তাহা বড় হউক আর ছোটই হউক, তাহা আমাদের কাছে 'স্বধর্ম' কি-না। যদি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমরা যে-কাজ করিতেছি তাহা আমাদের স্বধর্ম, তবে আমাদের সেইকাজ করিয়া যাওয়া উচিত। যাঁহার স্বধর্ম পৃথক আমাদের কাজে তাঁহার যোগ দেওয়া কর্তব্য নহে। তাহাতে তাঁহার দুঃখিত হওয়াও উচিত নহে। তিনি-যে আমাদের কাজের প্রতি সহানুভূতি রাখিতেছেন ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট—এইরূপ মানিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু যদি আত্মনিরীক্ষণের দ্বারা ইহা স্থির হয় যে, আমাদের বুদ্ধি এই নূতন কাজকেই বুনিয়াদী কাজ বলিয়া গণ্য করিতেছে, তাহা হইলে অন্যকোন কাজের বোঝা আমাদের মাথার উপর থাকিলে উহা বিবেচনাপূর্বক সরাইয়া ফেলিতে হইবে এবং এই নূতন কাজে লাফাইয়া পড়িতে হইবে। সেক্ষেত্রে ইহা চিন্তা করা ঠিক হইবে না যে, আমাদের হাতে যে-কাজ ছিল তাহার কি হইবে? যে-অবস্থায় মনে ইহা নিশ্চয় হইয়া যায় যে, এইকাজই বুনিয়াদী কাজ—সেইসময়ের সেইকাজই 'যুগধর্ম' হইয়া পড়ে। 'যুগধর্ম' হইতেছে 'নৈমিত্তিক'। উহা চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া চলে না। কিন্তু যে-সময়ের জন্য উহা হয় সেইসময়ে 'নিত্যধর্ম' উহার কাছে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। ঐ কাজের ওজন সবচাইতে বেশী হয়। আমরা প্রতিদিন প্রার্থনা করি। উহা নিত্যকর্ম।

কিন্তু সেইসময় যদি কোথাও আগুন লাগিয়া যায় তাহা হইলে প্রার্থনা অসমাপ্ত রাখিয়াই আমাদিগকে আগুন নিভাইবার জন্য যাইতে হয়। কেননা নৈমিত্তিক ধর্ম বলবান। যে-নৈমিত্তিক ধর্মসম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় হইয়া গিয়াছি উহার জন্য যদি আমাদিগকে নিত্যধর্ম ত্যাগ করিতেও হয়, তবে তাহাই করিতে হইবে।" তিনি পরে অন্য একস্থানে এইসম্পর্কে বলিয়াছেন— "রুশ ও চীনে যে-কার্য হিংসার দ্বারা সাধিত হইয়াছে আমি এখানে তাহা অহিংসার পথে করিতেছি। শুধু তাহাই নহে, এইকার্যের দ্বারা গান্ধী-বিচার প্রসারলাভ করিতেছে। ইহা অহিংসার দ্বারা সমাজের গঠন বদলাইবার মহান কার্য। ইহার ন্যায় আজ আর অন্যকোন কার্য নাই। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবাকার্য প্রভৃতি অন্য যেসব কার্য আছে তাহা নিত্যকার কার্য, কিন্তু এইকার্য যুগধর্মের মহান্ নৈমিত্তিক কার্য। মনে করুন আমি সন্ধ্যা উপাসনা করিতেছি, এমন সময় গ্রামের মধ্যে কোথায়ও আগুন লাগিয়াছে, আমি প্রার্থনা বন্ধ করিয়া সেখানে তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া যাইব। ভজনের মহত্ব কম নহে। কিন্তু উহা প্রতিদিনের কার্য এবং অগ্নি নির্বাপণের ঐ কার্য নৈমিত্তিক কার্য। কারণ উহার বিশেষ পরিস্থিতি হইতে উদ্ভব হইয়াছে। এরূপ অন্য বড়-বড় কাজ বহু আছে। কিন্তু তুলনা করিলে এইকাজের মহত্ব সবচাইতে বেশী। যদি ইহা বুঝিয়া সকলে এই-কার্যে লাগিয়া যায়, তবে সারা পৃথিবীতে আমরা ক্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারিব। আমি গণিতজ্ঞ। প্রত্যেক শব্দ ওজন করিয়া উচ্চারণ করিতেছি।"

পরমধর্ম

ভূদানযজ্ঞের কাজে জীবনদানের জন্য আহ্বান করা হইতেছে। কর্মী-দের সমস্ত সময় ও শক্তি এইকাজে নিয়োগ করিবার জন্য বলা হইতেছে। এমন কিছু কর্মী আছেন যাঁহারা কয়েক বৎসর যাবৎ গঠনমূলক কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা যেসব কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া-ছেন তাহা পুণ্যকার্য। যেকাজ তাঁহারা অনেক বৎসর যাবৎ করিয়া আসিতেছেন উহা করিয়া যাওয়া তাঁহাদের ধর্ম। এরূপ বলা হয় যে, ভূদানের কার্য শ্রেষ্ঠকার্য। কিন্তু তাঁহারা যে-সেবাকার্য করিয়া আসিতেছেন তাহা

গীতার শিক্ষা অনুসারে তাঁহাদের পক্ষে 'স্বধর্ম'। স্বধর্ম গৌণকার্য হইলেও উহা পরিত্যাজ্য নহে। উপরন্তু পরধর্ম শ্রেষ্ঠ হইলেও উহা গ্রহণ করা উচিত নহে। এইজন্য শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠের বিচার এখানে উঠিতে পারে না। যেকার্য তাঁহারা করিয়া আসিতেছেন এবং যাহা তাঁহাদের কর্তব্য উহা তাঁহাদের করিয়া যাওয়া উচিত।—যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য বিনোবাজী বলেন—"ধর্ম-বিচারেরও একটি সীমা আছে। শ্রীকৃষ্ণ সারাজীবন অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু একসময় আসিল যখন তিনি ঘোষণা করিলেন যে, তিনি আর অস্ত্রধারণ করিবেন না—নিঃশস্ত্র থাকিবেন। এইরূপে যিনি সতত অস্ত্র ব্যবহার করিতেন তিনি আর কখনও অস্ত্রধারণ করিবেন না—এই ঘোষণা করিলেও তাঁহার পক্ষে ধর্মযোগ ত্যাগ করা হয় নাই বরং তিনি ঐ কার্যের দ্বারা ধর্মকে একস্তর উপরে উঠাইয়াছিলেন। যাহাকে আমরা পুণ্যকার্য বা ধর্মকার্য বলিয়া থাকি তাহা কতকদূর পর্যন্ত আত্মবিকাশের সহায়ক, কিন্তু তাহার পরে উহা বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছে—"ধর্মোপিহি মুমুক্ষুণাং পাপমুচ্যতে"।—মুমুক্ষুর পক্ষে ধর্মও পাপে পরিণত হয়।"

কর্তব্যের ভাবনাও অনেক সময় বিঘ্নকারক হইয়া উঠে। তাই বিনোবাজী বলেন—"তুলসীদাস রামায়ণে লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মণের সম্মুখে এরূপ এক সমস্যা আসিয়াছিল। রাম বনগমন করিবার সময় লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন যে, পিতা-মাতার সেবা করা তাহার কর্তব্য। লক্ষ্মণ যদি রামচন্দ্রের এই কথা মানিয়া লইতেন এবং বাল্মিকী এইরূপ লিখিতেন যে, লক্ষ্মণ পিতা-মাতার সেবা করিবার জন্য ঘরে থাকিয়া গিয়াছিলেন, তবে এমন কে আছে যে উহাতে দোষ দেখিত? আমরা তো এইরূপ বলিতাম যে, 'লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সহিত বনে গমন করার লোভ সংবরণ করিয়াছিলেন এবং মাতা-পিতার সেবায় মগ্ন হইয়াছিলেন। এখানে স্বধর্মের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। তাই স্বধর্মের প্রশ্ন লক্ষ্মণের সম্মুখে ছিল, কিন্তু তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন—'আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক। কিন্তু এত বড়-বড় কথা আমি বুঝি না। আমি তো বালক এবং আপনার স্নেহে লালিত-পালিত। এইজন্য আপনি যেরূপ বলিতেছেন আমার দ্বারা সেরূপ স্বধর্মাচরণ হইতে পারে না।'

এই বলিয়া তিনি রামচন্দ্রের সহিত বনে গমন করিলেন। ছোট-ছোট ধর্ম থাকে বটে, কিন্তু পরমধর্ম একই হইয়া থাকে। যেখানে উভয়ই সাধারণ ও ক্ষ‌ুদ্র ধর্ম সেখানে সেই উভয়ের মধ্যে তুলনা হইতে পারে। কিন্তু যেখানে একটি ক্ষ‌ুদ্রধর্ম এবং আর একটি পরমধর্ম সেখানে তুলনা হইতেই পারে না। যেখানে উভয়ই সাধারণ ধর্ম সেখানে স্বধর্মের প্রশ্ন আসে এবং সেইক্ষেত্রে স্বধর্ম গৌণ এবং পরধর্ম শ্রেষ্ঠ হইলেও স্বধর্মকেই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যেখানে পরমধর্ম ও স্বধর্ম দ‌ুই-ই উপস্থিত হয় সেখানে ঐর‌ূপ নির্ণয় করা যায় না। ঐ সময়ে পরমধর্মকে মানিয়া লইতে হয়।"

পরমধর্মের বিষয় আরও পরিষ্কার করিবার জন্য বিনোবাজী বলেন --"পরমধর্ম আচরণের জন্য নিজের স্বধর্মকে পরমধর্মের ছাঁচে ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। যদি উহাকে ঢালিয়া সাজানো সম্ভবপর না হয়, তবে স্বধর্মকে ত্যাগ করিতে হইবে। উচ্চধর্ম অর্থাৎ পরমধর্মের সম্ম‌ুখীন হইলে স্বধর্মকে ত্যাগ করিতেই হয়। সেইসময়ে স্বধর্মে ল‌াগিয়া থাকা ঠিক নহে। অতএব আচরণের নিমিত্ত স্বধর্মকে পরমধর্মের ছাঁচে ঢালিয়া লও অথবা স্বধর্ম পরিত্যাগ কর—ইহাই ধর্ম-রহস্য।"

ভারতে আজ যিনি যেকোন সাম‌্প্রদায়িকক্ষেত্রে যেকোন সেবা কার্যে ব্যাপ‌ৃত থাকুন না কেন যদি তিনি তটস্থ হইয়া বিচার করেন, তবে ইহা তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইবে যে, ভূদানযজ্ঞ পরমধর্ম। তাই তাঁহার কাজকে ভূদানযজ্ঞের ছাঁচে ঢালিলে অথবা তাহা ত্যাগ করিয়া ভূদানযজ্ঞের কাজ প‌ূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করিলে তবেই তাঁহার পবমধর্ম পালন করা হইবে।

প‌ূর্বজন্মের সহিত দারিদ্র্যের সম্পর্ক

কেহ-কেহ বলেন, মান‌ুষ তাহার প‌ূর্বজন্মকৃত কর্মের ফলে ধনী বা দরিদ্র হইয়া থাকে। অতএব দরিদ্রের দারিদ্র্য দ‌ূর করিবার চেষ্টা করা তথা ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়াইবার চেষ্টা করা ব‌ৃথা; কারণ প‌ূর্বজন্মের পাপ-প‌ুণ্যের ফল এড়ানো সম্ভব নহে। তাহাকে তাহার ভাগ্যের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।—বিকৃত ধর্মবোধ হইতেই এর‌ূপ বলা হইয়া থাকে। ধনী তাঁহার ধন-সংরক্ষণের জন্য যেসব মিথ্যা য‌ুক্তি-তর্ক ও অপকৌশল অবলম্বন

করিয়া থাকেন তাহার মধ্যে ইহা অন্যতম। সমাজের অর্থনৈতিক অপব্যবস্থা হইতেই-যে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। অতএব পূর্বজন্মকৃত কোন কুকার্যের ফলে মানুষ দরিদ্র হইয়াছে—ইহা কল্পনা করা অন্যায় ও বিবেকবুদ্ধিবিরোধী। শাস্ত্র বলে, যে পাপকর্ম করে তাহার আসুর-যোনিতে জন্ম হয়। আসুর যোনির অর্থ মনুষ্যেতর জীব-যোনি অর্থাৎ ব্যাঘ্র-সর্পাদি-যোনি। "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥" অর্থাৎ নীচ, দ্বেষপরায়ণ, ক্রূর, অমঙ্গলকারী নরাধমদিগকে এই সংসারে অত্যন্ত আসুরী যোনিতে বার-বার নিক্ষেপ করিয়া থাকি। শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও ধনী ও দরিদ্র উভয়ের মধ্যেই সৎ লোকও আছে, অসৎ লোকও আছে। বিনোবাজী বলেন, "পূর্বজন্মের পাপ-পুণ্যের ফলে এইজন্মে গরীব বা ধনী হয়—এই ধারণা ভুল। পূর্বজন্মের পুণ্যের ফলে সুবুদ্ধি ও নিরহঙ্কারিতা লাভ হয় এবং পূর্বজন্মের পাপের ফলে দুষ্টবুদ্ধি ও অসৎ কাজ করিবার প্রবৃত্তি লাভ হইয়া থাকে। যদি আমাদের সুবুদ্ধি থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে, পূর্বজন্মে আমরা পুণ্যকার্য করিয়াছিলাম। আর যদি অসৎ কাজ করিবার ইচ্ছা হয় তবে বুঝিতে হইবে যে, আমরা পূর্বজন্মে পাপকার্য করিয়াছিলাম।" তিনি আরও বলেন, "খারাপ কাজের ফল দারিদ্র্য ও ভাল কাজের ফল ধনিকত্ব এরূপ কোন কথাই নাই। শঙ্করাচার্যের গরীবকুলে জন্ম হইয়াছিল। তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে, তিনি গত-জন্মে পাপ করিয়াছিলেন? পাপ ও পুণ্যের পরিণাম দারিদ্র্য ও আমীরী নহে। পূর্বজন্মের পাপের ফল কুবুদ্ধি এবং পুণ্যের ফল সুবুদ্ধি। শাস্ত্র বলে যে, যিনি ভাল কাজ করেন তিনি পরজন্মে পবিত্রকুলে জন্মলাভ করেন এবং যিনি বহু পুণ্যবান তাঁহার তো যোগীদের কুলে জন্ম হয়। আর যোগীরা তো গরীবই হইয়া থাকেন।* অতএব আমরা পূর্বজন্মে পাপ করিয়াছি না পুণ্য করিয়াছি, তাহা আমাদের কুবুদ্ধি বা সুবুদ্ধি হইতে

* 'প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥'—গীতা ৬।৪১
—'যোগভ্রষ্টব্যক্তি পুণ্যাত্মাদিগের লোকে গমন করিয়া তথায় বহুবৎসর বাস

চিনিতে পারা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞানের বহু ভ্রান্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে। একজন সন্ন্যাসী তো আমাকে এতদূর পর্যন্ত বলিয়াছিলেন যে, রোগীর সেবা করা ভুল—কারণ রোগগ্রস্তব্যক্তি তো নিজের প্রারব্ধ ভোগ করিতেছে এবং সেবা করিয়া আমরা তাহার প্রারব্ধের ক্ষতিসাধন করিতেছি। ইহা শুনিয়া আমি তো আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলাম। উত্তরে আমি বলিলাম যে, সকলকেই তো নিজ-নিজ প্রারব্ধ ভোগ করিতে হয়। আমার সেবার দ্বারা তাহার প্রারব্ধের উপর কোন প্রভাব পড়িবে না। প্রারব্ধ এত শক্তিশালী যে, উহা নিজবলে চলিতে থাকে। কিন্তু আমার ধর্ম তো সেবা করা। এইজন্য আমি তো সেবা করিতেই থাকিব। ভগবান যদি আমাকে গরীব বা ধনবান করিয়া থাকেন, তবে তাহা আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই। জীবন এক

করিবার পর পবিত্র ও ধনবান ব্যক্তিদিগের গৃহে জন্মলাভ করেন।'

যাঁহারা বিপরীত তর্ক করেন তাঁহারা এই শ্লোকটিকে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া থাকেন। ভাল কথা। কিন্তু পরবর্তী শ্লোক দেখুন।

'অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥'—৪২

এই শ্লোকের শঙ্করভাষ্য হইতেছে ঃ—"অথেতি। অথবা শ্রীমতাং কুলাদন্যস্মিন্ যোগিনামেব দরিদ্রাণাং কুলে ভবতি জায়তে ধীমতাং বুদ্ধিমতাম্। এতদ্ধি জন্ম যদ্ দরিদ্রাণাং যোগিনাং কুলে দুর্লভতরং দুঃখলভ্যতরং পূর্বমপেক্ষ্য লোকে জন্ম যদীদৃশং যথোক্তবিশেষণে কুলে।"

ইহার অনুবাদ—ধনীদিগের কুল ছাড়া দরিদ্র অথচ বুদ্ধিমান যোগীদিগের কুলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এই-যে দরিদ্র যোগীদিগের কুলে জন্ম, ইহা ধনবানদিগের কুলে জন্ম অপেক্ষা দুর্লভতর; যথোক্ত বিশেষণযুক্ত দরিদ্র যোগিগণের কুলে (জন্মই অধিকতর স্পৃহনীয়—ইহাই তাৎপর্য)।

এই দুই শ্লোকের সরল তাৎপর্য এই যে, যিনি পূর্বজন্মে পুন্যকার্য করিয়াছেন তিনি যোগীর কুলে জন্ম পাইয়া থাকেন। আর যোগীকুল তো সাধারণত দরিদ্র কুলই হইয়া থাকে। পুণ্যবান ব্যক্তি ধনীর ঘরেও জন্ম পাইতে পারেন। কিন্তু দরিদ্র যোগীর কুলে জন্মই দুর্লভ ও স্পৃহনীয়। মোট কথা ধনীর ঘরে জন্ম হউক অথবা গরীবের ঘরে জন্ম হউক জাতকের সুবুদ্ধি ও সুমতি প্রাপ্ত হওয়াই আসল কথা। নচেৎ বুঝিতে হইবে যে, তিনি পূর্বজন্মে পুণ্যকার্য করেন নাই।

পরীক্ষা। এইজন্য পূর্বজন্মের কথা তুলিয়া গরীবের সেবা না করা নিতান্ত ভুল।"

কলিযুগে কি ইহা সম্ভব?

লোকে বলে—এখন কলিযুগ। এসব কি এখন হওয়া সম্ভব? ইহার উত্তরে বিনোবাজী বলিয়াছেন, "কিন্তু যে-শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ ভগবানের নিবাসের জন্য জমির প্রয়োজন হওয়ায় মোহর বিছাইয়া জমি লইতে হইয়াছিল, সেই শ্রাবস্তীপুরে আমার মত অপদার্থ, ভগবান বুদ্ধের তুলনায় যাহার কোন অস্তিত্বই নাই—সে এই কলিযুগেই একশত একর ভূমি পাইয়াছে। তাহা হইলে বুঝুন, ইহা কলিযুগ অথবা সত্যযুগ?" এইপ্রসঙ্গে অন্য একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—ত্রেতাযুগে রাবণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দ্বাপরযুগে দুঃশাসনের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু এই কলিযুগেই শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি বলেন—"যুগ আমাদের স্বরূপ দান করে না। আমরাই যুগের স্বরূপদানকারী 'কাল-পুরুষ'। আমরা চেতন। এইজন্য এই সমগ্র জড়-সৃষ্টি আমাদের হাতে। আমরা মাটির যে-আকারই দেই না কেন, উহা তাহাতে কোন আপত্তি করে না। আজ এমন সমুন্নত সময় আসিয়াছে যে, আমরা ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ঘটনা এইসময়ে নিজেদের চোখে দেখিতে পাইলাম। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কখনও স্বাধীনতা-যুদ্ধ অহিংস-পন্থায় পরিচালিত হইয়াছে কি? অতএব ভ্রাতৃগণ, ভুল পথে চিন্তা করিবেন না। আজ আমাদের চোখের সামনে সত্যযুগ আসিতেছে। এবং অত্যন্ত তীব্রবেগেই উহা আসিতেছে। লোকে বলে, মহাযুদ্ধ আসিতেছে। আমি বলি—আসুক। যতবার মহাযুদ্ধ আসিবে ততবার পৃথিবী শিক্ষালাভ করিবে যে, মহাযুদ্ধের দ্বারা পৃথিবীর কোন সমস্যার সমাধানই হয় না।" আমি সকল মহাযুদ্ধকে অভ্যর্থনা করি। কেননা, উহার পরিণামস্বরূপ সারা দুনিয়াকে সিধা আমার নিকট আসিতে হইবে এবং আমার কাছে বলিতে হইবে যে "আমরা হারিয়া গিয়াছি, আমাদিগকে অহিংসার রাস্তা দেখাইয়া দিন।" তিনি এইপ্রসঙ্গে অন্য একস্থানে বলিয়াছেন—"দান দিতে স্বীকৃত হয় নাই

এমন কোন লোকের সহিত আমার এ পর্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি ইহার অর্থ এই বুঝিয়াছি যে, সত্যযুগ আসিতেছে। পুরাণসমূহে চারিযুগের কথা আলোচনা করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক যুগের স্থিতিকালের সীমা নির্ধারিত আছে, ইহাও বলা হইয়াছে। পরন্তু উক্ত চারিযুগের অন্তর্বর্তী কালেও অন্যান্য যুগ আসিয়া থাকে। যেমন দিনে আলো ও রাত্রিতে অন্ধকার হইয়া থাকে, যেমন দেহে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রতিনিয়ত বহিয়া থাকে, যেমন চন্দ্রের ক্ষয় হয় এবং বৃদ্ধিও হয়, তেমনি এক-এক যুগের মধ্যে অন্যান্য যুগও যাওয়া-আসা করিয়া থাকে। এখন কলিযুগ চলে চলুক, কিন্তু এই কলি-যুগের মধ্যেই সত্যযুগ আসিতে পারে। আর যদি এখন সত্যযুগ চলিতে থাকে, তবে ইহার মধ্যে কলিযুগও আসিতে পারে। পুরাণে আমরা দেখিয়াছি—শ্রীরামের যুগে রাবণের ন্যায় রাক্ষস ছিল। আর এই কলিযুগেও অসংখ্য সৎ-পুরুষের জন্ম হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, যুগ তো মাত্র নামের জন্য। জ্যোতিষানুসারে উহা চলিয়া থাকে। কিন্তু ভাবানুসারে একই যুগের মধ্যে চারিযুগই আসিয়া যায় এবং মোটের উপর সত্যযুগই সবচাইতে দীর্ঘ হইয়া থাকে। কলির অর্থ—এক। উহার দ্বিগুণ—দ্বাপর যুগ; উহার তিনগুণ ত্রেতাযুগ এবং উহার চারগুণ সত্যযুগ হইয়া থাকে। সংস্কৃতে কলির অর্থ—'এক', দ্বাপরের অর্থ—'দুই', ত্রেতার অর্থ—'তিন' এবং সত্য-এর অর্থ—'চার'। ইহার মানে এই যে, কলিযুগ অপেক্ষা সত্যযুগের শক্তি চারগুণ অধিক। মধ্যে-মধ্যে কলির জোর চলিয়া থাকে। কিন্তু সত্য অধিক বলবান।"

মধ্যবিত্তশ্রেণীর সমস্যার সমাধান

বিনোবাজী যখন বিহারের মানভূম জেলায় ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন একব্যক্তি তাঁহাকে বলেন যে, তিনি গরীবদের সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোকদের অবস্থাও খারাপ। সুতরাং বিনোবা যেন তাহাদের জন্যও কিছু করেন। ঐ ব্যক্তি আরও বলেন যে, গরীব-দের অবস্থা তো বরং কিছু ঠিক আছে; কারণ তাহারা হাতের কাজ ও শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করিয়া থাকে এবং দরিদ্রের মত জীবনযাত্রা নির্বাহ

করিতে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মধ্যমশ্রেণীর লোকের অবস্থা খুব খারাপ। কারণ উহারা-যে কিছু উৎপাদন করিবে এমন কোন উপায় তাহাদের হাতে নাই। অন্যদিকে ধনীর হাতে যেরূপ অর্থ আছে সেরূপ অর্থও তাহাদের নাই। এইজন্য তাহারা নিতান্ত দুর্দশাগ্রস্ত। ইহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন—"আমরা ভূমিহীনকে তো ভূমি দিব। যদি মধ্যম-শ্রেণীদের মধ্য হইতে কেহ জমি চাহেন, তবে আমরা তাঁহাকেও জমি দিব। কিন্তু তাহাতে এই মুশকিল হইবে যে, তিনি নিজে ঐ জমি চাষ করিবেন না। আর তিনি যদি নিজে পরিশ্রম না করেন, তবে তাঁহাকে জমি দিয়া কোন লাভ নাই। আপনাদের মধ্যম-শ্রেণীর লোকের-যে এরূপ দুর্দশা তাহার কারণ, তাঁহারা উৎপাদনের কোন কাজ জানেন না। ইহার প্রতিকারের উপায় আজ যে-শিক্ষা প্রচলিত আছে তাহার পরিবর্তন করা। মধ্যম-শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত। কিন্তু যে-বিদ্যালয়ে তাঁহারা পড়েন তাহাতে কোন হাতের কাজ বা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয় না। অবস্থা এতদূর গড়াইয়াছে যে, কৃষকের ছেলেও যদি স্কুলে পড়িয়া শিক্ষিত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে, তবে আর সে ক্ষেতের কাজ করিবে না। সে চাকুরী করিতে চাহিবে। কিন্তু চাকুরী তো বেশী নাই। আমি শুনিয়াছি যে, পশ্চিমবাংলায় এ বৎসর এক হাজারেরও অধিক সংখ্যক মেয়ে বি. এ. পরীক্ষা দিতেছে। যখন মেয়েদের সংখ্যাই এত তখন পুরুষদের সংখ্যা তো আরও অনেক বেশী হইবে। এতসব বি· এ· লোককে আমরা কোথায় বপন করিব এবং তাহা হইতে কি-বা ফসল পাওয়া যাইবে? উহার ফল এই দাঁড়ায় যে, উহারা সকলেই বেকার হইয়া থাকে। উহাদের অভিমান বেশী। তাই তাহারা অসন্তুষ্ট হয়। তাহাদের খরচ করিবার অভ্যাস হয়, কিন্তু উপার্জন কিছুই হয় না। আর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিদ্বান হয়, তবে দুই বিদ্বানের ঘরকন্না হয় এবং তাহাতে ঘর-সংসার নষ্ট হইয়া যায়। যদি দুইজনের একজন মূর্খ হয়, তবে ঘরকন্না ভাল চলিতে থাকে। কিন্তু আজকাল তো দুইজনেই বি· এ· পাশ করিতে চাহে। ইহাই আপনাদের অবস্থা। মধ্যম-শ্রেণীর দুরবস্থা দূর করিবার উপায় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই অন্বেষণ করিতে হইবে। এইজন্য গান্ধীজী এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন

যে, যে-শিক্ষাই দেওয়া হউক না কেন উহাতে কোনও-না-কোন শিল্পের কাজ শিক্ষা দেওয়া চাই; উপরন্তু শিল্পের মাধ্যমেও শিক্ষা দেওয়া চাই। এরূপ তো হওয়া চাই যে, অমুকে বি· এ· পাশ করিয়াছে বটে, কিন্তু বয়ন কাজ করিতেছে। অমুকে এম· এ·, কিন্তু সে ক্ষেতের কাজ করিতেছে। অমুকে বি. এস-সি., কিন্তু সে নাপিতের কাজ করিতেছে। নিজের-নিজের বিদ্যায় প্রয়োগ তাহারা সেই-সেই কাজে করিতেছে। এইভাবে বিদ্যা ও কাজ যদি যুক্ত করা হয়, তবে শিক্ষিতদের বেকারত্ব থাকিবে না এবং ভারতেরও উন্নতি সাধিত হইবে। তখন যদি তাঁহারা আমাদের নিকট হইতে জমি চাহেন, তবে আমরা তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই জমি দিব। তাঁহারা ঐ জমিতে আবাদ করিবেন এবং সুখী হইবেন। আপনার যেরূপ অব্যবস্থা সেরূপ অব্যবস্থায়ও যদি মধ্যম-শ্রেণীর কেহ জমি চাহেন এবং নিজে জমি চাষ করেন, তবে আমরা তাঁহাকেও জমি দিব।

"কাশীতে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা আমার নিকট জমি চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা নিজেরা চাষ করিবেন না অন্যের দ্বারা চাষ করাইবেন? তাঁহারা বলিলেন—'আমরা নিজেরাই জমি চাষ করিব। চাষ করা বৈদিক ঋষিদের ধর্ম ছিল।' ইহা শুনিয়া আমার আনন্দ হইল। আমি বলিলাম—"আপনাদিগকে ৫ একর করিয়া জমি দিব। এবং আমি ঐ জমি দেওয়াইবার ব্যবস্থাও করিয়াছি। কিন্তু শিক্ষিত-শ্রেণীর মধ্য হইতে এখনও বেশী লোক ক্ষেতের কাজ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন না। যাঁহারা অন্যজীবিকা করেন তাঁহাদিগকে জমি দেওয়া হইবে না। কিন্তু যাঁহার অন্যজীবিকা নাই এবং যিনি ক্ষেতের কাজ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাকেই জমি দেওয়া হইবে—তিনি মধ্যম-শ্রেণীর লোকই হউন বা অন্য শ্রেণীর।"

সর্বোদয়-সমাজের একক

গ্রামকে ভিত্তি করিয়া এবং উহাকে সর্বোদয়-সমাজের unit (একক) ধরিয়া সর্বোদয়ের প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা করা হইয়াছে। গ্রামকে কেন ভিত্তি ধরা হইল অর্থাৎ বিনোবাজীর ভাষায় গ্রাম-রাজ প্রতিষ্ঠা করার কল্পনা কেন করা হইল তাহা ভালভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। তাহা. হইলে

সর্বোদয়ের স্বরূপ এবং উহার সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও সুস্পষ্ট হইবে। কারণগুলি এই ঃ—

(১) সর্বোদয় সমাজব্যবস্থা সর্বাত্মক ব্যবস্থা। জীবন অবিভাজ্য। জীবনের কোনদিক বাদ দিয়া সর্বোদয়ের কল্পনা করা সম্ভব নহে। নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই সাম্য-প্রতিষ্ঠা সর্বোদয়ের কাম্য। এই সাম্যের উৎস হইতেছে আত্মার একত্ব—ইহা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। পরিবারের মধ্যে সাম্যের এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিবারে মা ও সন্তানের, পিতা ও পুত্রের, স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে একাত্মবোধ বিদ্যমান। সেখানে যাহার যেরূপ যোগ্যতা থাকুক না কেন সকলের জীবন-যাত্রার মান একরূপ। মানুষ পরিবারের মধ্যে একত্ব ও সাম্যের যে-শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহাকেই সারা সমাজে প্রসারিত করা সর্বোদয়ের উদ্দেশ্য। পরিবারকে বাদ দিলে সমাজের মধ্যে গ্রামই মানুষের সবচাইতে নিকটে থাকে। তাই একাত্মবোধকে পরিবার হইতে প্রতিবেশীতে অর্থাৎ গ্রামে সম্প্রসারণ করা মানুষের পক্ষে সবচাইতে সহজসাধ্য হইবে।

(২) শাসনমুক্ত সমাজব্যবস্থার অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য শাসন-ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের সমস্তরকম প্রশ্নই গ্রামে উদ্ভব হইতে পারে এবং উদ্ভব হইয়াও থাকে। উপরন্তু সামূহিক জীবনের ক্ষেত্রে গ্রামই সকলের নিম্নস্তরে অবস্থিত। তাই বিকেন্দ্রীকরণের অন্তিম সীমাস্বরূপ গ্রামকে গ্রহণ করা হইয়াছে।

(৩) আর্থিকব্যবস্থার যতদূর সম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। যে-সমস্ত শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ করা যাইতে পারে তৎসমস্তকেই স্বয়ংসম্পূর্ণতার দৃষ্টিতে গৃহশিল্পস্বরূপ চালানো সম্ভব নহে। বহুশিল্পকে পল্লী-শিল্পস্বরূপ চালাইতে হইবে। যেমন বস্ত্র-স্বাবলম্বনের দৃষ্টিতে সূতাকাটা ও বস্ত্র-বয়নকে গৃহশিল্প করিতে হইবে। কিন্তু কাগজ প্রভৃতি প্রতি-গৃহে উৎপাদন করা সুবিধাজনক হইবে না। ঐ সমস্ত শিল্প পল্লীশিল্পস্বরূপ চলিবে। তাই আর্থিকক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য গ্রামকে অবলম্বন করা হইয়াছে।

(৪) কেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থায় কোন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলে তাহার দ্বারা

সমগ্র সমাজ বা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদি পরিকল্পনার ক্ষেত্র যতদূর সম্ভব সংকুচিত করা হয়, তবে উহার ব্যর্থতায় সমাজ বা দেশের অন্য অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে না। সেইদৃষ্টিতে প্রতি-গ্রাম নিজের পরিকল্পনা করিয়া লইলে যে-গ্রামের যোজনা অভিজ্ঞতায় ব্যর্থ বা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইবে কেবলমাত্র সেইগ্রামই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহাতে অন্যগ্রামের কোন অনিষ্ট সাধিত হইবে না, বরং উহা হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে।

(৫) প্রাচীনকালে গ্রামই আর্থিক ও শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল। গ্রাম-পঞ্চায়েতের দ্বারা শাসন ও আর্থিকব্যবস্থা পরিচালিত হইত। জনমানসে তাহার স্মৃতি রহিয়াছে। সুতরাং ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে গ্রামকে গ্রহণ করা সমীচীন ও জনমনের অনুকূল হইয়াছে।

(৬) স্বাধীনতালাভের পূর্বে নূতন সমাজরচনার জন্য যে-কর্মপ্রচেষ্টা (গঠনমূলক কর্ম) চলিতেছিল তাহা স্বাধীনতা-আন্দোলনের মাধ্যমে করা হইত। তখন স্বাধীনতা অর্জনই যুগের দাবী ছিল। স্বাধীনতা-আন্দোলন তখন যুগধর্ম ছিল। তাই নূতন সমাজরচনার প্রচেষ্টা তাহার মাধ্যমে করা ব্যতীত অন্যকিছুর অবলম্বনে কোন ফলোদয় হইত না। যুগের পরিবর্তন হইয়াছে। বর্তমান যুগের দাবী ভূমির সমবণ্টন তথা সাম্য-প্রতিষ্ঠা। তাই ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলনের মাধ্যমে সর্বোদয়-প্রতিষ্ঠার সকল কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রসর করিয়া দিবার সুযোগ আসিয়াছে। আমাদের লক্ষ্যের মুখে অগ্রসর হইবার জন্য আমরা এই নূতন মাধ্যম পাইয়াছি।

সর্বোদয়-সূত্র

বুদ্ধগয়া সর্বোদয়-সম্মেলনে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ জীবনদানের জন্য আহ্বান করায় বিনোবাজী তাহার উত্তরে নিজের জীবন সমর্পণের ঘোষণা করিয়া এক পত্র লেখেন। কিসের জন্য তিনি জীবন সমর্পণ করিতেছেন তাহা চারিটি শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করেন। তাহা হইতেছে—'ভূদানযজ্ঞমূলক, গ্রামোদ্যোগপ্রধান অহিংস ক্রান্তি'। ইহা হইতেছে—চারিটি শব্দের দ্বারা রচিত একটি মহান সূত্র। সূত্রাকারে ইহাতে সর্বোদয়ের অর্থাৎ নূতন সমাজরচনার ভিত্তি, স্বরূপ, সাধন ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে। বিনোবাজী

এই সূত্রের স্পষ্টীকরণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথম শব্দ 'ভূদানযজ্ঞ' ইহার আধার, শেষ শব্দ 'ক্রান্তি' ইহার উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় শব্দ 'গ্রামোদ্যোগ-প্রধান' ইহার স্বরূপ ও তৃতীয় শব্দ 'অহিংসা' ইহার সাধনোপায়। 'ক্রান্তি' শব্দের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। অন্য তিনটি শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি তাহা অনুধাবন করা প্রয়োজন। তাহাতে সর্বোদয়ের ভিত্তি, স্বরূপ ও সাধনোপায় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হইবে।

(ক) 'ভূদানযজ্ঞমূলক' ঃ—(১) বর্তমান সমাজ-বিকৃতির মূল কারণ হইতেছে শোষণ। কেন্দ্রীকৃত উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারাই সমাজে শোষণ চলিতেছে। ভূমিতেও ঐ ব্যবস্থাই চলিতেছে। ভূমিতে যে-উৎপাদন হয় তাহা হইতেছে মৌলিক উৎপাদন। অর্থাৎ অন্য যাহাকিছু উৎপন্ন হয় তাহার প্রায় সবই ভূমিজাত দ্রব্যাদি হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। শোষণ বন্ধ করিতে হইলে মূল উৎপাদনের ক্ষেত্রেই প্রথমে বিকেন্দ্রীকরণ করিতে হয়। তাই ভূদানযজ্ঞের দ্বারা প্রথমে নব-সমাজরচনার ভিত্তিস্বরূপে ঘরে-ঘরে ভূমি-বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। (২) বর্তমান পরিস্থিতির প্রয়োজনে ভূমি-সমস্যা সবচাইতে জরুরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভূমির পুনর্বণ্টন হইতেছে এই যুগের দাবী। ইহা যুগধর্ম। কিন্তু ভূমিদান-প্রাপ্তি ও ভূমি-বিতরণে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে না। ভূমির সঙ্গে-সঙ্গে পল্লীশিল্পের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভূমির পুনর্বণ্টন হইলে পল্লীশিল্পের ব্যবস্থা করার কাজ সহজ হইবে এবং উহার জন্য অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে।

(খ) 'গ্রামোদ্যোগ প্রধান' ঃ—ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যা শুধু ভূমির দ্বারা মীমাংসিত হওয়া সম্ভব নহে; পূরক বৃত্তি অথবা বহুক্ষেত্রে প্রধান বৃত্তি-স্বরূপ কুটীর-শিল্প চাই। কর্তৃত্ব-বিভাজন না হইলে আর্থিক সাম্য-প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ব্যতীত আর্থিকক্ষেত্রে কর্তৃত্ব বিভাজন করা যাইবে না। উপরন্তু সর্বোদয়-আদর্শে যেপ্রকারের কাজই করা হউক না কেন উহার আর্থিক মূল্য সমান হওয়া চাই এবং সকলের কাজও পাওয়া চাই। বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদন বা শিল্প ব্যবস্থায় (১) প্রত্যেকের কাজ পাওয়া সম্ভব হইতে পারে। (২) উহাতে কাজের প্রকার ও প্রকৃতি-নির্বিশেষে আর্থিক মূল্যও নিজ হইতেই সমান হইয়া যাইতে থাকে।

আর্থিকক্ষেত্রে সাম্য-প্রতিষ্ঠিত না হইলে সমাজে সাম্য-প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। তাই সর্বোদয় সমাজরচনার পক্ষে কুটীর-শিল্পকে প্রধানস্থান দেওয়া আবশ্যক। এই সম্পর্কে বিনোবাজী অননুকরণীয় ভঙ্গীতে বলিয়াছেন—"রামনাম লইবার সময় আমি কেবলমাত্র 'রাম' উচ্চারণ করি না, 'সীতারাম'ও বলিয়া থাকি। তাহার অর্থ এই যে, ভূমি পুনর্বণ্টনের সঙ্গে-সঙ্গে আমি গ্রাম-শিল্পও চাই। লোকে অনেক সময় বলে, কুটীরশিল্পজাত জিনিসের দাম বেশী। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মানুষের জীবিকা হরণ করিয়া তাহাকে বেকার করিয়া, অভুক্ত রাখিয়া কল যে-পণ্য উৎপাদন করে তাহা সস্তা নহে, বরং অত্যন্ত দুর্মূল্য। যদি কল সেই বেকারকে খাওয়াইতে বাধ্য হয়, তবে মিলজাত দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত মহার্ঘ হইবে। কলের উৎপাদন সৌকার্যার্থে যে-ব্যয় করা হয় তাহার হিসাব করিয়া বলুন যে, কলজাত দ্রব্য সস্তা না দুর্মূল্য। কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা যে-দ্রব্য উৎপাদন করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা যে-জিনিস চুরি করিয়া আনিয়া বিক্রয় করা হইতেছে উহা তো সস্তা হইবেই। বিষ সস্তা এবং অমৃতের মূল্য বেশী। এইজন্য কি এই বিষ খরিদ করিবেন?"

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, সমাজের বর্তমান অবস্থায় বৃহৎ যন্ত্রকে অর্থাৎ কেন্দ্রীকৃত শিল্পকে একেবারে বর্জন করা কি সম্ভব? না, তাহা সম্ভব নহে। তবে কোন্-কোন্ কেন্দ্রীকৃত শিল্প গ্রহণীয় হইবে এবং কোন্ নীতিতে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে? এ সম্পর্কে বিনোবাজী তাঁহার এক প্রার্থনান্তিক ভাষণে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাকে সর্বোদয়ের অর্থনৈতিক যোজনা বা পরিকল্পনা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন—"যন্ত্র তিন প্রকার—সময়সাধক, সংহারক এবং উৎপাদক। (১) আমি সময়-সাধক যন্ত্রের বিরোধিতা করি না। ট্রেণ ও এরোপ্লেনের ন্যায় যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি হয় না বটে, কিন্তু সময় বাঁচিয়া যায়। দশ হাজার ঘোড়াও একযোগে একটি এরোপ্লেনের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। সেজন্য আমরা এরূপ সময়সাধক যন্ত্র চাহি। (২) কামান, বন্দুক, বোমা প্রভৃতির ন্যায় সংহারক-যন্ত্রের অহিংস-ব্যবস্থায় স্থান নাই। এইজন্য ঐরূপ যন্ত্র আমরা চাহি না। (৩) উৎপাদক-যন্ত্র দুই প্রকার—পূরক ও মারক।

যেখানে লোকসংখ্যা অধিক এবং কোন যন্ত্র লোককে বেকার করে তাহাকে তৎস্থানের মারক-যন্ত্র বলা হয়। কিন্তু যেখানে মনুষ্যশক্তি কম এবং কাজ অধিক, সেখানে সেইযন্ত্র মারক নহে, বরং পূরক বলিয়া বিবেচিত হইবে। একদেশে এক যন্ত্র পূরক হয়, আবার অন্যদেশে সেইযন্ত্রই মারক হয়। ভারতবর্ষে ট্রাক্টরের মত যন্ত্র আসিলে উহার ফলে প্রচণ্ডভাবে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু আমেরিকা-রাশিয়ার মত দেশসমূহে ট্রাক্টরের মত যন্ত্র মারক নহে, সেখানে উহা উৎপাদক বলিয়া গণ্য হইবে। ঐরূপে এককালে এক যন্ত্র পূরক থাকে এবং অন্যকালে মারক হইয়া যায়। দেশ, কাল ও পরিস্থিতি অনুসারে কোন যন্ত্র পূরক বা মারক বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং যন্ত্র বলিয়াই যন্ত্রের প্রতি আসক্তি রাখা বা যন্ত্রের বিরোধিতা করা উচিত নহে। যন্ত্রের উপযোগিতা বিবেচনা করিয়াই আমরা উহা গ্রহণ করিব। কিন্তু আমরা যদি যন্ত্রের প্রতি আসক্তি রাখি এবং বলিতে থাকি যে, মিলের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার মত উপযোগী যন্ত্র গ্রাম্যশিল্পে নাই, অতএব আমরা উহার ব্যবহার করিব না, তবে এরূপ যিনি বলিয়া থাকেন তিনি দেশের জন্য যেরূপ চিন্তা করা উচিত সেরূপ চিন্তা করেন না। পাশ্চাত্যদেশে এক ব্যাপার চলিতেছে বলিয়াই আমরা উহার চক্রে ও ধোঁকায় পড়িয়া সেই একই কথা বলিতেছি। ইহাসত্ত্বেও গান্ধীজী আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, আমরা ভুল করিতেছি। আমি দেখিয়াছি যে, যেখানে আমরা সাম্যের কথা বলিয়া থাকি সেখানে সম্মুখস্থ কেহ উহার বিরোধিতা করিয়া বৈষম্যের কথা বলিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা "এফিসিয়েন্সি" বা দক্ষতার কথা উঠাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, আপনি সমতাবাদী কিন্তু আমরা দক্ষতাবাদী। এইরূপে তাঁহারা এক গুণের বিরুদ্ধে অন্যগুণ খাড়া করিয়া দেন। ইহার ফলে বিরোধ চলিতে থাকে। আজকাল পুঁজিবাদীরা দক্ষতার ধ্বনি উঠাইয়াছেন। আমিও দক্ষতা চাহি। কিন্তু আমি ইহা চাহি না যে, পরিবারের কয়েকজনের আহার মিলিবে আর অন্য কয়েকজন উপবাসী থাকিবে। আমি চাহি যে, সকলেই যেন খাইতে পায়। যদি বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রাম্যশিল্পের যন্ত্র সকলের আহারের সংস্থান করিতে সক্ষম হয়, তবে তাহা গ্রহণ করা কর্তব্য। কিছুলোকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অবশিষ্ট লোককে

বেকার করিয়া রাখিয়া আমরা কখনও 'সক্ষম' হইয়া উঠিবার দাবী করিতে পারিব না।

"ভারতে আজ উৎপাদন অত্যন্ত কম এবং বেকারত্ব অত্যন্ত বেশী। অসন্তোষের সৃষ্টি এই কারণেই হইয়াছে এবং উহা কোন-না-কোন সুযোগে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য কিছু করিতেই হইবে। অসন্তোষ মিটাইবার জন্য চেষ্টা করা চাই। গান্ধীজীর এই কার্যসূচী ছিল যে, যাহার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক তাহাকে তিনি সহায়তা করিতেন। কবি দুখায়েল শুনাইয়াছেন যে, সাহায্য দান করিবার ক্রম এইরূপ—প্রথমে ক্ষুধার্ত, পরে দুঃখী এবং শেষে সুখী। কিন্তু আজ তো ইহার বিপরীত ক্রম চলিতেছে। এইজন্য গান্ধীজী সদাসর্বদা এইকথা চিন্তা করিতেন যে, যাহার প্রয়োজন সবচাইতে অধিক তাহাকে সাহায্য দান করিবার উপায় করা চাই। এই অন্বেষণের ফলেই চরকার আবিষ্কার হইয়াছিল। ইহা তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা। ইহা তাঁহার কাব্যশক্তি। কেবলমাত্র কয়েক ছত্র লিখিলেই কবি হওয়া যায় না। ব্যাসকাচার্য বলিয়াছেন, "কবিঃ ক্রান্তিদর্শী"। বৈপ্লবিক দৃষ্টি যাঁহার আছে, যাঁহার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী, যিনি সূক্ষ্মদর্শী, তিনিই কবি। এই অর্থে গান্ধীজীও কবি ছিলেন। তিনি কতিপয় বর্ষ পূর্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের জন্য গ্রাম্যশিল্পের জরুরী প্রয়োজন। তিনি নয়ী-তালিম, রাষ্ট্রভাষা, জমির পুনর্বণ্টন প্রভৃতির কথা কয়েকবৎসর পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন। কিরূপ মহোপকার তিনি করিয়াছেন, কিরূপ মহান বুদ্ধিমত্তা তাঁহার ছিল, কতই না প্রতিভা এবং কতই না বাৎসল্য তাঁহার হৃদয়ে ছিল! তিনি আমাদের জন্য এতই করিয়াছেন! আমরা তাঁহার নিকট হইতে আলো পাইয়াছি। তথাপি আজ আমরা টলমল্ করিতেছি। আমরা এমন অভাগা।"

স্বাবলম্বনের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য খাদ্য ও বস্ত্র গৃহে সম্ভব না হইলে গ্রামেই উৎপাদন করিতে হইবে। উপরন্তু যেসব দ্রব্যের কাঁচামাল যেগ্রামে উৎপন্ন হয় ও যেখানে উহাকে পাকামাল করিয়া প্রস্তুত করা সম্ভব তাহা ঐখানেই উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং পাকামালই গ্রামের বাহিরে পাঠাইতে হইবে।

যেমন সৌরজগতে সূর্য কেন্দ্রস্বরূপ ও প্রধান, তেমনি পল্লীশিল্পস্বরূপ সৌরজগতে খাদি সূর্যস্বরূপ। উহাকে কেন্দ্র করিয়া অন্যসব পল্লীশিল্প গড়িয়া উঠিবে। তাই মহাত্মা গান্ধী সারাজীবন লোককে বুঝাইয়া গিয়াছেন —নিজের কাপড়ের জন্য নিজে সূতা কাটুন, আর যিনি সূতা কাটিতে পারিবেন না তিনি খদ্দর খরিদ করিয়া ব্যবহার করুন। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর অনেকে বলিতেছেন, 'স্বাধীনতালাভের জন্যই খাদির প্রয়োজন ছিল। এখন খাদির আর কি প্রয়োজন?' তাঁহাদের সম্বন্ধে বিনোবাজী মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহারা বুদ্ধিভ্রষ্ট। স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য ও তাহা সংরক্ষণের জন্য খাদি তথা পল্লীশিল্প অপরিহার্য। যদি খাদি গড়িয়া না উঠে, তবে অন্যকোন পল্লীশিল্পই গড়িয়া উঠা সম্ভব নহে। তাহা হইলে গ্রামের দারিদ্র্য দূর করাও সুদূর পরাহত হইবে। সেক্ষেত্রে গ্রাম ধনী ও মিলমালিকদের কবলস্থ হইয়া পড়িবে ও স্বাধীন জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে। এক কথায় গ্রামের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে এবং পরিণামস্বরূপ দেশের স্বাধীনতা হারাইবার পথও পরিষ্কার হইবে। তাই যাঁহারা খদ্দর পরিধান করেন না তাঁহাদিগকে বিনোবাজী অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন খদ্দর খরিদ করেন এবং মিলের বস্ত্র অপেক্ষা খদ্দরের মূল্যে যাহা বেশী হইবে তাহা দরিদ্রকে গুপ্তদান দিলেন বলিয়া ধরিয়া লন। তিনি বলিয়াছেন—"চারি টাকা মূল্যের খাদি পরিধান করুন। দুই টাকা তো কলের কাপড়েও খরচ হয় আর বাকী দুই টাকা দান-ধর্মে খরচ হইল বলিয়া ধরিয়া লউন। যদি হিসাবের খাতা রাখেন, তবে তাহাতে লিখিবেন কাপড় দুই টাকা ও দান-ধর্ম দুই টাকা। দেশের মা-বোনদের যদি বাঁচাইতে চান, তবে কিছু ধর্ম তো করিতেই হইবে। যদি এইরূপ দান-ধর্ম করেন, তবে গরীবেরা বেকার হইবে না। পিতামহ ভীষ্ম বলিয়াছেন,—"দরিদ্রান্ ভর, কৌন্তেয়, মা প্রযচ্ছেশ্বরং ধনম্"—অর্থাৎ দরিদ্রকে ধন দাও, ধনবানকে দিও না।"

সকলেই উৎপাদক-শ্রম করিবে। সকলকেই উৎপাদক-শ্রম করিবার সুযোগ দিতে হইবে। ইহা পল্লী-শিল্পের মূল কথা। কিন্তু কেবল 'উৎপাদক-শ্রম' বলিলে সঠিক বলা হয় না। কারণ যেসব বৃহৎ যন্ত্রশিল্প কোটী-কোটী মানুষকে বেকার করিয়া দেয় তাহাতে যেমন শ্রমিক কাজ করে

তাহারাও তো উৎপাদক-শ্রমই করে। কাপড়ের কল এবং চাউল কলের শ্রমিকেরা যে-শ্রম করে তাহাও তো উৎপাদক-শ্রমই। তাই বিনোবাজী কুটীরশিল্পে প্রযুক্ত উৎপাদক-শ্রমকে "দ্রোহরহিত" বিশেষণ দিয়াছেন। বেকারত্ব সৃষ্টিকারী যন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সহিত পল্লীশিল্পে উৎপাদন-কারী শ্রমিকের এই পার্থক্য। একজনের শ্রম দ্রোহরহিত অর্থাৎ অন্যের অনিষ্ট সাধন করে না এবং অন্যজনের শ্রম 'দ্রোহকারী'।

আমাদের সমাজরচনা পল্লীশিল্প-প্রধান হইবে। বিনোবাজী ইহার স্পষ্টীকরণ করিয়া বলিয়াছেন—"'প্রধান' বলিবার কারণ এই যে, গৌণরূপে আরও বিষয় ইহাতে থাকিবে।" তাহা হইতেছে—নয়ী-তালিম, রাষ্ট্রভাষা, সামাজিকক্ষেত্রে সাম্যপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। মহাত্মা গান্ধীনির্দেশিত আঠার দফা গঠনমূলক কার্যের মধ্যে এইসব গৌণ বিষয় রহিয়াছে। তাহাছাড়া অবস্থার প্রয়োজনে নূতন বিষয়ও যুক্ত হইতে পারে।

(গ) 'অহিংস'—বিনোবাজী 'অহিংস' শব্দের স্পষ্টীকরণ করিয়া বলিয়াছেন—"আমাদের ক্রান্তির সাধন 'অহিংসা' হইবে। ইহাকে আমরা সত্যাগ্রহও বলিয়া থাকি। ইহার চারিটি অঙ্গ ঃ—(১) দুঃখকষ্ট বরণ করা অর্থাৎ তপস্যা, (২) বিচার প্রচার, (৩) নয়ী-তালিম এবং (৪) পাপ অর্থাৎ অন্যায়ের সহিত অসহযোগ।"

নূতন সমাজরচনায় অহিংসা তিনটি প্রক্রিয়ায় কাজ করিবে—(১) স্বতন্ত্র জনশক্তি, (২) কর্তৃত্ব বিভাজন ও (৩) বিচার-শাসন। এই সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য না লইয়া বা উহা প্রয়োগ না করিয়া বা উহার অপেক্ষায় না থাকিয়া জনগণ নিজ প্রেরণায় নিজেদের বিধায়ক-শক্তি জাগ্রত করিয়া কার্যসিদ্ধি করিবে। উহা হিংসার বিরোধী। —যেমন আইন প্রণয়নের অপেক্ষায় না থাকিয়া ভূমি প্রাপ্তি ও বিতরণের কার্য। পল্লীশিল্পের ক্ষেত্রেও জনশক্তি সৃষ্টি করিয়া অগ্রসর হওয়া। আইনের সাহায্যে বা সরকারের ক্ষমতাপ্রয়োগের দ্বারা পল্লীশিল্পের উন্নতি করবার জন্য অপেক্ষা না করা। কর্তৃত্ব-বিভাজন হইতেছে—রাষ্ট্রক্ষমতা ও আর্থিক-ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ ক্ষমতা কেন্দ্র হইতে হস্তান্তর করিয়া গ্রামের হাতে অর্পণ করা; উহা কেবলমাত্র মফঃস্বলে administrative authority

সৃষ্টি করা নহে। বিচার-শাসন হইতেছে—বাহ্যিক শক্তির চাপে অথবা আইনের ভয়ে না করিয়া অন্তরে বিচার করিয়া বুঝিয়া অন্তরের প্রেরণায় সার্বজনিক সর্বক্ষেত্রে নিজেকে পরিচালনা করা।

শাসনমুক্ত-সমাজ

সর্বোদয় সমাজ-প্রতিষ্ঠার কল্পনায় সমাজের চরম পরিণতি হইতেছে—শাসনমুক্ত অবস্থা। ইহা মাত্র Stateless society অর্থাৎ রাষ্ট্র-শাসনবিহীন সমাজ নহে। ইহাতে সামাজিক শাসনও থাকিবে না। প্রত্যেক মানুষ নিজ-নিজ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইবে। প্রত্যেকের বিবেক-বুদ্ধি এরূপ বিকশিত হইবে যে, কাহারও সহিত কাহারও স্বার্থ-সংঘর্ষ আসিবে না; সুতরাং কোন সংঘর্ষ বা বিবাদের উদ্ভবই হইবে না। বাস্তব-ক্ষেত্রে কখনও হয়তো এই অবস্থায় পরিপূর্ণরূপে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। সম্পূর্ণভাবে শাসনমুক্ত-সমাজ একটি আদর্শ। আদর্শে পৌঁছিবার জন্য চিরদিন প্রচেষ্টা চলিবে, চিরদিন তদভিমুখে উত্তরোত্তর অধিক অগ্রসর হওয়া যাইবে, কিন্তু হয়তো আদর্শে কখনও পৌঁছানো যাইবে না। কিন্তু আদর্শে একদিন-না-একদিন পৌঁছাইতে হইবে ও পৌঁছানো যাইবে—ইহা মনে করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। তাই এই আদর্শকে অবহেলা করা চলিবে না। কারণ তাহা হইলে অন্যসব ব্যবস্থার মূল শিথিল হইয়া যাইবে। আদর্শ জ্যামিতির বিন্দুর মত। উহার কল্পনা করা যায়, কিন্তু চোখে দেখা যায় না। তথাপি উহাকে বাদ দিয়া কোনও বৈজ্ঞানিকই বাস্তবক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারেন না। কারণ তাহাতে জ্যামিতির পরবর্তী সব সিদ্ধান্তই অচল হইয়া পড়িবে। কল্পনাকে বাদ দিলে কোন ইঞ্জিনিয়ার কোন দালানের নক্সা তৈয়ারী করিতে পারিবেন না। সেরূপ শাসনমুক্ত-সমাজের আদর্শ সম্মুখে না থাকিলে সর্বোদয়-পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও সামাজিকক্ষেত্রের কোন-প্রকার গঠনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হইবে না। অতএব পূর্ণ শাসন-মুক্ত অবস্থা আদর্শস্বরূপ থাকিবে। কিন্তু ব্যবহারিকক্ষেত্রে উহার প্রত্যক্ষ রূপ হইবে শাসননিরপেক্ষ-সমাজ। শাসনের আধার দণ্ডশক্তি। তাই উহাকে দণ্ডনিরপেক্ষ সমাজও বলা যায়।

সর্বোদয়ের চরম লক্ষ্য 'শাসনমুক্ত-সমাজ' কেন? সর্বোদয়ের অর্থ হইতেছে অহিংস-সমাজরচনা। অর্থাৎ হিংসা-মুক্তি। সামাজিকক্ষেত্রে শাসন ও শোষণ এই দুই-এর মাধ্যমে হিংসা আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। আর্থিকক্ষেত্রে হিংসা শোষণের রূপ পরিগ্রহ করে। শোষণের ফলে এবং উহার প্রতিক্রিয়ায় সমাজে নানাবিধ বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। শাসনের প্রয়োজন এইজন্যই। তাই শাসনব্যবস্থার আবিষ্কার হইয়াছে। সমাজে শোষণের আধার হইতেছে কেন্দ্রীভূত উৎপাদনব্যবস্থা অর্থাৎ পুঁজিবাদ। আজকাল উৎপাদনের কলকাঠি কেবলমাত্র পুঁজিপতিদের হাতে নহে, উপরন্তু উত্তরোত্তর উহা রাষ্ট্রের হাতে পুঞ্জীভূত হইতেছে। ব্যক্তিগত বা বেসরকারী পুঁজিবাদের দিন চলিয়া যাইতেছে এবং সেইস্থলে রাষ্ট্র-পুঁজিবাদ কায়েম হইতেছে। আজকাল জগতের প্রায় সর্বপ্রকার রাষ্ট্রব্যবস্থাই প্রকৃতপক্ষে সর্বাধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হইতেছে। Welfare state বা কল্যাণ-রাষ্ট্রের অন্তরালে থাকিয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা আজ সর্বাধিকারী (totalitarian) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিরাটতম রাষ্ট্রযন্ত্রকে খাওয়াইতে জনগণের অধিকাংশ উৎপাদনই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করিবার জন্য সমাজের এক বিরাট অংশ অনুৎপাদক-গোষ্ঠীতে পরিণত হইয়াছে। অনুৎপাদক হইলেও তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবার দাবী সর্বাগ্রগণ্য-রূপে বিবেচিত হইতেছে। এইভাবে শাসনব্যবস্থা আজ সমাজের এক বিরাটতম শোষক ও হিংসা-সংস্থায় পরিণত হইয়াছে। তাই সমাজকে হিংসামুক্ত করিতে হইলে তাহাকে শাসনমুক্তও করিতে হইবে। কিন্তু কোন্ পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া অনুসরণ করিলে ইহা সহজেই সম্ভব হইতে পারে? শাসনসংস্থার উপর প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করিলে উহার বিলোপসাধন করা সম্ভব নহে। ইহা সত্য যে, যতদিন শাসনের প্রয়োজন থাকিবে ততদিন শাসন-ব্যবস্থার একেবারে বিলোপন সম্ভব হইবে না। শোষণ বন্ধ করিতে হইলে যাহাতে শোষণের অবকাশ না থাকে প্রথমে তাহাই করিতে হইবে। কাজেই শ্রমমূলক স্বাবলম্বন এবং সহযোগী ও সহকারীবৃত্তির বিকাশ হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ কেন্দ্রীকৃত উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকৃত ও

শ্রমমূলক উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে। উহা হইতে জনশক্তির বিকাশ হইবে। জীবনের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মধ্যে যাহা ঘরেই উৎপাদন করিয়া লওয়া সম্ভব তাহা গৃহশিল্পরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা পরিবারের মধ্যে করিতে পারা যাইবে না অথচ গ্রামে পারা যাইবে তাহা গ্রামশিল্পের মাধ্যমে করিতে হইবে। সেইরূপ যাহা গ্রামে উৎপাদন করা সম্ভব নহে তাহা যথাক্রমে জেলা, রাজ্যে ও রাষ্ট্রে উৎপন্ন করিতে হইবে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী আর্থিকব্যবস্থার স্থলে স্বাবলম্বী ও সহকারী আর্থিকপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই নূতন ব্যবস্থায় যন্ত্রের স্থান কতদূর থাকিবে তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। কেবলমাত্র শিল্প নহে কৃষি-ব্যবস্থারও সম্পূর্ণভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করিতে হইবে এবং উহাকে স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এজন্য ভূমি গৃহে-গৃহে বণ্টিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে সকলেই ভূমি নিজহাতে চাষ করিবার সুযোগ পায় এবং কেহ ভূমিকে পুঁজিস্বরূপ ব্যবহার করিতে না পারে। সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ইহারই এবং সবপ্রথমেই ইহা হওয়া আবশ্যক। কারণ ভূমিতে যাহা উৎপাদন করা হয় তাহাই হইতেছে মৌলিক উৎপাদন। অর্থাৎ অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যই কৃষিজাত দ্রব্য হইতে বা কৃষিজাত দ্রব্যের সাহায্যে উৎপাদিত হইয়া থাকে। তাই কৃষিই হইতেছে শিল্পের ভিত্তি। এই দৃষ্টিতে ভূদানযজ্ঞ অহিংস সমাজরচনার ভিত্তি।

ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কমিউনিষ্টগণ মনে করেন—অন্তিমে রাষ্ট্র থাকিবে না। তাঁহারা বলেন যে, ঐ অবস্থা আনিতে হইলে প্রথমে রাষ্ট্রকে খুব পাকা ও মজবুত হওয়া প্রয়োজন। আগে সর্বহারাদের একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পরে রাষ্ট্র ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু রাষ্ট্রকে অন্তিমে লুপ্ত করিতে হইলে প্রথম হইতেই তাহাকে ক্ষীণ করার কাজ আরম্ভ করা উচিত। পশ্চিমে যাইবার জন্য পূর্বদিকে মুখ করিয়া চলিলে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো যাইবে না। তাই ভূমি-বণ্টন ও গৃহশিল্প প্রতিষ্ঠিত করার প্রযত্নের সঙ্গে-সঙ্গে রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতাও ক্রমে-ক্রমে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। উহাতে ক্ষমতার সত্যিকারের বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া চাই যাহাতে উহার দ্বারা মাত্র স্থানীয় administrative authority

সৃষ্টি করা না হয়। গ্রাম-পঞ্চায়েতে উহা রূপ পরিগ্রহ করিবে। গ্রামের ব্যাপারে উহার সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে। যেমন, যদি কোন গ্রাম মনে করে-যে গ্রামে কলের তৈল আমদানী করা হইবে না, তবে দেশের অন্যত্র অন্যরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলেও তাহার নিজের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করিবার ক্ষমতা সেই গ্রাম-বিশেষের থাকিবে। গ্রাম-পঞ্চায়েৎ যে কিরূপ তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে। সরকার যে-গ্রাম-পঞ্চায়েৎ করিতে চান তাহা মাত্র স্থানীয় administrative agency। সত্যিকারের গ্রাম-পঞ্চায়েৎ গ্রামবাসী-দিগের সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইবে। গ্রাম-পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত ভোটাভুটির দ্বারা করা হইবে না। ইহাতে সর্বসম্মতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। গ্রাম-পঞ্চায়েতের নীতি সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"গ্রাম-পঞ্চায়েতের নীতি এই যে, ভগবান পঞ্চজনের মাধ্যমে কথা বলেন অর্থাৎ পঞ্চায়েতের সর্বসম্মত অভিমতই ভগবানের বিচার বলিয়া মান্য করা উচিত। যেক্ষেত্রে পাঁচজনের মধ্যে তিনজন বা চারজন একরকম বলেন এবং বাকী অন্য রূপ বলেন সেক্ষেত্রে তাহা ভগবানের বিচার হইল না।" এইরূপে ক্রমশঃ গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

গ্রামই স্থির করিবে যে, ব্যবস্থা ও উৎপাদনের কতটা দায়িত্ব গ্রাম সম্পন্ন করিতে পারিবে। যতটা দায়িত্ব গ্রাম লইতে পারে ততটা দায়িত্ব গ্রাম নিজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট দায়িত্বের বিশেষ-বিশেষ অংশ আবশ্যকতা অনুসারে ক্রমশঃ জেলা, রাজ্য ও কেন্দ্রের উপর সঁপিয়া দিবে। উহার জন্য তৎ-তৎ স্থানে অর্থাৎ গ্রাম হইতে জেলা, জেলা হইতে রাজ্য এবং রাজ্য হইতে কেন্দ্রে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার পদ্ধতিও গ্রামই স্থির করিয়া দিবে। এরূপে শাসনক্ষমতা ও শাসনব্যবস্থার মূল গ্রামে থাকিবে এবং উহা যত ঊর্ধ্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই ক্ষমতা ক্ষীণ হইতে-হইতে কেন্দ্রে গিয়া ক্ষীণতম হইয়া যাইবে। ইহা বর্তমান ব্যবস্থার ঠিক বিপরীত। এখন কেন্দ্রেই ক্ষমতার মূল এবং গ্রামে ক্ষমতা ক্ষীণতম। গ্রাম হইতে রাষ্ট্র পর্যন্ত প্রত্যেক সংস্থার প্রতিনিধি-নির্বাচন ও সমস্ত কার্য-ব্যবস্থা পক্ষরহিতভাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে করা হইবে। পক্ষগত পদ্ধতি পরিত্যাগ করিলে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নির্বাচনে সর্বসম্মতি পাওয়া কঠিন হইবে না। রাষ্ট্রব্যবস্থা

বিলোপ করার প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা কিরূপে হওয়া উচিত তাহার আভাসমাত্র এখন এইরূপে দেওয়া যাইতে পারে। সমাজ যতই এদিকে অগ্রসর হইবে ততই পরবর্তী স্তরের রূপরেখা স্বভাবতই সুস্পষ্ট হইতে থাকিবে।

নিরপেক্ষভাবে ভূদানযজ্ঞের দ্বারা ভূমি-সমস্যার সমাধান হইতে থাকিলে এবং কুটীরশিল্প ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার দ্বারা শিল্পব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ হইতে থাকিলে জনগণের মধ্যে আত্মশক্তি নির্মিত হইবে। এই আত্মশক্তিকে সাম্প্রদায়িকক্ষেত্রে স্বতন্ত্র জনশক্তি বলা হয়। সরকারের সহায়তার অপেক্ষা না রাখিয়া এবং আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া জনশক্তিবলে অগ্রসর হইতে হইবে। জাহাজের সংগে তুলনা করিলে নূতন সমাজরচনায় পূর্ণশাসনমুক্ত-সমাজ হইতেছে দিশানির্ণয়-যন্ত্র এবং স্বতন্ত্র জনশক্তি হইতেছে motor force ।

সমাজ-ব্যবস্থার এই আমূল পরিবর্তন সহজসাধ্য করিবার জন্য শিক্ষাব্যবস্থারও তদনুরূপ আমূল পরিবর্তন হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং মানুষের প্রতিটি কর্মপ্রচেষ্টার সহিত শিক্ষার অনুবন্ধ থাকা চাই। তাই মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। সমাজে বুনিয়াদী মূল্য পরিবর্তনের কাজ যতই অগ্রসর হইবে ততই বুনিয়াদী শিক্ষার কাজও প্রসারলাভ করিবে। নচেৎ নহে।

যদি চরম লক্ষ্য হয় শাসনমুক্ত-সমাজ প্রতিষ্ঠা, তবে কার্য-প্রচেষ্টায় সরকারের সাহায্য লওয়া হয় কেন? তাহাতে কি ঐ প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে না? এরূপ আশঙ্কা অপনোদন করিতে গিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন যে, (১) মোক্ষ বা দেহমুক্তি সাধন করিতে হইলে দেহের সহায়তায় এবং দেহের মাধ্যমেই করিতে হয়; (২) কুড়ুল (কুঠার) দিয়া কাঠ কাটা হয়, কিন্তু উহার দাণ্ডি কাঠেরই হইয়া থাকে। ভাল সরকার ইহাই চাহিবে যে, উত্তম পদ্ধতিতে ক্রমশঃ শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত হউক এবং জনতা স্বতন্ত্র জনশক্তি-বলে আপন পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখুক। পিতামাতা চাহেন যে, সন্তান তাঁহাদের সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখুক। তাই সরকার যদি সর্বোদয়ের কাজে সাহায্য করে, তবে তাহা গ্রহণ করিলে ক্ষতি নাই। হাতে তো পুরা কুড়ুলই রহিয়াছে। যদি হাতে কেবল কুড়ুলের

কাঠের দাণ্ডিটাই থাকিত, তবে আশঙ্কার কারণ হইতে পারিত।

ইহা অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের কথা যে, মহাভারতে নৈরাজ্যের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত একটি দেশের বর্ণনা আছে—

"ন তত্র রাজাসীৎ ন দণ্ডো ন চ দাণ্ডিকঃ।
স্বধর্মেন ধর্মজ্ঞাঃ তে রক্ষন্তি পরস্পরাম্।"

—"সেইদেশে কোন রাজা ছিল না। শাস্তি দিবার দণ্ড ছিল না। দণ্ডধারীও ছিল না। সেইদেশের জনগণ ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন ছিল। তাহারা ধর্মবুদ্ধিবলে পরস্পরকে রক্ষা করিত।"

শরীর-শ্রমের গুরুত্ব

নূতন সমাজরচনা বা সর্বোদয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকেরই উৎপাদক শারীরিক-শ্রম করার প্রয়োজনীয়তার উপর কেন-যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাহা ভালভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। সাধনপদ্ধতির পশ্চাতে যে-গভীর বিচারধারা রহিয়াছে তাহা বুঝিলে সর্বোদয়ের পথে অগ্রসর হইবার জন্য সকলে প্রেরণা লাভ করিবে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীবনের আর্থিক ক্ষেত্র সবচাইতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র। আর্থিকক্ষেত্রেই সর্বোদয়ের রূপ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রকাশ পায়। তাই সর্বোদয়ের প্রতিষ্ঠায় আর্থিক-সাম্যের প্রয়োজনীয়তা সবচাইতে বেশী। আর্থিকক্ষেত্রে সাম্য-প্রতিষ্ঠার অর্থ এই যে—(১) সমাজের উপকারে আসে এমন যেকোন কাজই হউক না কেন তাহার আর্থিক মূল্য সমান হওয়া চাই। একদিকে যেমন কৃষি-শ্রমিকের একঘণ্টার কাজ ও কর্মকার বা নাপিতের একঘণ্টার কাজের পারিশ্রমিক সমান হইবে, অন্যদিকে সেরূপ কৃষি-শ্রমিকের একঘণ্টা কাজের জন্য তাহাকে যে-মজুরী দেওয়া হইবে, উকিলের একঘণ্টা কাজের পারিশ্রমিকও তদপেক্ষা বেশী হইবে না। অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর শারীরিক-শ্রমের কাজের মূল্য যেমন সমান হওয়া চাই, তেমনি শারীরিক ও বৌদ্ধিক কাজের মূল্যের মধ্যেও কোন পার্থক্য না থাকা চাই। (২) নৈতিক সাম্য ও সামাজিক সাম্য না আসিলে আর্থিক সমানতা প্রতিষ্ঠা করা দুঃসাধ্য। সমাজের পক্ষে চাষের কাজের যেমন প্রয়োজন অধ্যাপকের অধ্যাপনার কাজও তেমনি প্রয়োজন। নৈতিক দৃষ্টিতে

এই দুইটিকেই সমান মূল্য দেওয়া উচিত। উপরন্তু শ্রমিক ও অধ্যাপকের সামাজিক মর্যাদাও সমান হওয়া উচিত। অধ্যাপককে কৃষি-শ্রমিক অপেক্ষা উচ্চ ভাবা উচিত নহে। কৃষিকাজ ও অধ্যাপনার কাজের নৈতিক মূল্য সমান, সামাজিক মর্যাদাও সমান এবং সামাজিক মর্যাদার দৃষ্টিতে কৃষি-শ্রমিক ও অধ্যাপক উভয়েই সমান। সমাজের চক্ষে এই দুইকাজের প্রয়োজনীয়তা যদি সমান হয় এবং উহাদের মর্যাদাও যদি সমান হয়, তবে আর্থিকক্ষেত্রের বিচারধারাও তাহাদিগকে সমানতার দিকেই লইয়া যাইবে। তাহা হইতেছে কৃষি-শ্রমিকের পুষ্টির জন্য যতটা প্রয়োজন, অধ্যাপকের পুষ্টির জন্যও ততটা প্রয়োজন। সুতরাং তাঁহাদের পারিশ্রমিকের মধ্যে প্রভেদ থাকার কোন কারণ নাই।

আজ সমাজে বৌদ্ধিক কাজের ও শারীরিক-শ্রমের পারিশ্রমিকের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। সামাজিকক্ষেত্রেও শ্রমজীবীকে বুদ্ধিজীবীর তুলনায় নিতান্ত কম মর্যাদা দেওয়া হয়। ইহা কেন্দ্রীকৃত উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিণাম। কারণ কেন্দ্রীকৃত উৎপাদন-ব্যবস্থায় অর্থাৎ বৃহৎ যন্ত্র-শিল্পে ম্যানেজারাদি ক্রমনিম্ন সকল স্তরের পরিচালক ও ব্যবস্থাপকদের এবং বৃহৎ যন্ত্র-নির্মাতা ও যন্ত্র-পরিচালক ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতির উচ্চস্তরের বৌদ্ধিক কার্য অপরিহার্য। অন্যদিকে সেখানে শ্রমিকের কাজে বুদ্ধিচালনার একেবারে কোন প্রয়োজনই থাকে না। তাই নৈতিক ও আর্থিক সমানতা প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই অবস্থা আদৌ অনুকূল নহে। সাম্য-প্রতিষ্ঠাকল্পে উৎপাদন-ব্যবস্থা এমন হওয়া চাই যেখানে শারীরিক-শ্রমের কাজের প্রয়োজন বেশী, উপরন্তু যেখানে শ্রম ও বুদ্ধির সমন্বয় সাধিত হয়। উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। পল্লীশিল্পে বা কুটীরশিল্পে শ্রমিক ও ইঞ্জিনীয়ার একই ব্যক্তি অর্থাৎ তাহাতে যে-বুদ্ধির কাজের প্রয়োজন হয় তাহা শ্রমিকই করিয়া লয় ও সহজেই করিতে পারে। ইহাতে জটিল বুদ্ধির আবশ্যকতা নাই। ইহাতে বুদ্ধির monopoly (একচেটিয়া) ও একনায়কত্ব থাকে না। উপরন্তু বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থায় পৃথক পরিচালক বা ব্যবস্থাপকের আবশ্যকতা নাই। যৎসামান্য পুঁজি যাহা লাগে তাহা শ্রমিকই দিতে পারে। তাই কুটীরশিল্পে শিল্পের মালিক নিজেই একযোগে পুঁজিপতি, শ্রমিক,

পরিচালক ও ইঞ্জিনীয়ার। তাই উহাতে সাম্য-প্রতিষ্ঠা আপনা-আপনিই হইয়া থাকে।

কেন্দ্রীকৃত উৎপাদনব্যবস্থার তুলনায় পল্লীশিল্পে বহুগুণ অধিক লোকের শারীরিক-শ্রম করিবার প্রয়োজন হয়। উহাতে শারীরিক-শ্রমও অধিক করিতে হয়। উপরন্তু আজ শারীরিক-শ্রমের প্রতি তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার ভাব বিদ্যমান। সাম্য-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উহাই সর্বাপেক্ষা মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধক। তাই যদি আর্থিক-সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে তাহার ভিত্তিস্বরূপ সমাজে শারীরিক-শ্রম সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন আনিতে হইবে। যাঁহাদের আজ জীবিকা উপার্জনের জন্য শারীরিক-শ্রম করিবার কোনই প্রয়োজন হয় না, যাঁহারা উচ্চস্তরের ও জটিল বুদ্ধির কাজে কুশল ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা যদি দৈনিক নিয়মিতভাবে কিছুসময় উৎপাদক-শ্রম করিয়া নিজেদের খাদ্য ও বস্ত্রের প্রয়োজন মিটাইয়া লইবার জন্য অগ্রসর হন, তবে জনমানসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিবে। উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ইঁহারা যদি এইভাবে নিয়মিত উৎপাদক-শ্রমের কাজ করিতে থাকেন, তবে তাহার বৈপ্লবিক ফল সহজে কল্পনা করা যায়। যদিও এখনই ইহা দুরাশা বলিয়া মনে করা হয়, তথাপি অন্যসকলে তাহাদের জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্য ও বস্ত্রের আবশ্যকতা মিটাইবার জন্য অগ্রসর হইবেন না কেন? দ্রোহরহিত উৎপাদক-শ্রমকে জীবন-নিষ্ঠাস্বরূপ সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ 'পৃথিবীতে বর্তমান সময়ের বহুতর বৈষম্য, বহুতর দুঃখকষ্ট ও বহুতর পাপের হেতু হইতেছে শ্রম না করিবার অভিলাষ। শরীর-শ্রম হইতে বিরত থাকা যাহার সংকল্প সেব্যক্তির গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে চুরি করিতে হয়।' তাই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন যে, প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু পরিশ্রম করা উচিত, উৎপাদন করা উচিত। পরিশ্রমরূপী যজ্ঞের দ্বারা সমস্ত দেবতাই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যে এরূপে পরিশ্রমরূপী উৎপাদক-যজ্ঞ না করিবে সে চোর, সে পাপী হইবে। বিনোবাজী বলেন, "ভগবান এই-যে শাপ দিয়াছেন ইহা আর্য-সংস্কৃতির কথা।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

বিনোবাজী আরও বলেন, "কিছুলোক অধিক মানসিক পরিশ্রম করিবে এবং কিছুলোক অধিক শারীরিক পরিশ্রম করিবে—একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সকলকে শ্রমনিষ্ঠ হইতে হইবে। কিছুলোক কেবলমাত্র মানসিক কাজ করিবে আর কিছুলোক কেবলমাত্র শারীরিক কাজ করিবে—এরূপ বিভাগ আমরা কখনও চাহি না। সকলকেই উভয়প্রকারের কাজ করিতে হইবে। ভগবান প্রত্যেককে হাত-পা দিয়াছেন এবং বুদ্ধিও দিয়াছেন। এইজন্য প্রত্যেককে উভয়বিধ কাজ করিতে হইবে। কিন্তু আজ পশ্চিম হইতে এক ভাবধারা আমদানী করা হইয়াছে তাহাতে কিছুলোক কেবল শ্রমজীবী (Hands) হইয়াই থাকে আর কিছু শুধু বুদ্ধি-জীবীই (Heads) থাকিয়া যায়। এইরূপ বিভাগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমরা চাই—এরূপ সমাজরচনা যেন এক মুহূর্তের জন্যও স্থায়ী না হয়।"

অপরিগ্রহী-সমাজের অর্থ

সর্বোদয়-সমাজের পরিকল্পনায় ব্যক্তিগতভাবে কাহারও হাতে সঞ্চয় বা সংগ্রহ থাকিবার কথা নাই। কাজেই সর্বোদয়-সমাজ হইবে অসংগ্রহী বা অপরিগ্রহী-সমাজ। ইহাতে কাহারও-কাহারও মনে এরূপ ধারণা হইয়া থাকে যে, ঐ সমাজে কেহ দরিদ্র থাকিবে না বটে, কিন্তু সমাজের অবস্থা খুব স্বচ্ছলও হইবে না। এরূপ ধারণা ভুল। বিনোবাজী তাঁহার এক প্রার্থনান্তিক ভাষণে অপরিগ্রহী-সমাজের অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "এখন এদেশে যে-পরিমাণ দুধ হয় তাহা জনসংখ্যার মাথাপিছু আড়াই ছটাক করিয়া পড়ে। কিন্তু আমরা যে-অসংগ্রহী সমাজ গঠন করিতে চাই তাহাতে মাথাপিছু একসের করিয়া দুধ থাকিবে। আজিকার সংগ্রহী-সমাজের অবস্থা এই যে, দেশে সম্বৎসরের মত পর্যাপ্ত খাদ্যশস্যও থাকে কি-না সন্দেহ। কিন্তু অসংগ্রহী-সমাজে কমপক্ষে দুই বৎসরের মত খাদ্যশস্য মজুত থাকিবে। তখন প্রতিটি ঘরে খাদ্যশস্য থাকিবে। বর্তমানে যেমন কাহারও পিপাসা পাইলে সে যেকোন বাড়ীতে গিয়া জল চাহিতে পারে, অসংগ্রহী সমাজেও সেইরূপ কেহ ক্ষুধার্ত

হইলে যেকোন বাড়ীতে গিয়া তাহার আহার্য চাহিবার অধিকার থাকিবে। পানীয় জলের জন্য যেমন কেহ পয়সা চাহে না, সেইরূপ অসংগ্রহী-সমাজে ক্ষুধার্তকে খাদ্যদ্রব্য দিবার জন্যও কেহ পয়সা চাহিবে না। অসংগ্রহী-সমাজ চাহে যে, ক্ষুধার্তকে খাওয়াইবার মত পর্যাপ্ত শস্য যেন প্রতিঘরেই মজুত থাকে। ইহা কোন নূতন কথা আমি বলিতেছি না। উপনিষদ এই মন্ত্র দিয়াছেন যে, অন্ন খুব বৃদ্ধি করিতে হইবে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যা সবলকে এই শিক্ষা দিতেছেন যে, জগত মিথ্যা। অতএব আসক্তি রাখিও না। ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা এই—"অন্নং বহু কুর্বীত তদ্ ব্রহ্ম"—অন্ন খুব বৃদ্ধি কর। আমরা অন্ন খুব বৃদ্ধি করিব। তাহাতে গৃহে এত অন্ন থাকিবে যে, কেহ তাহার জন্য মূল্য ধরিবে না, কেহ উহা বিক্রয় করিবে না। বরং ঐরূপ করাকে মিথ্যাচার বলিয়াই গণ্য করিবে। অসংগ্রহী-সমাজে খাঁটি ঘি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। কিন্তু 'দালদা' পাওয়া যাইবে না। তরকারীও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। যেকোন বাড়ীতে যাইলে আপনি খাইতে পাইবেন। গৃহস্বামী আপনাকে বলিবেন, 'চলুন ভাই, ২-ঘণ্টা ক্ষেতে কাজ করা যাক। এখন তো ৯-টা বাজিয়াছে। ১১টার সময় খাওয়া যাইবে।' সেইসমাজে লোক মাছ-মাংস খাওয়া ত্যাগ করিবে। উহার পরিবর্তে গরুর দুধ প্রচুর পরিমাণে খাইবে। অপরিগ্রহী-সমাজে মধুর মহানদী প্রবাহিত হইবে। যেমন মহানদী জঙ্গল হইতে বাহির হয়, সেইরূপ মধুও জঙ্গল হইতে আসিবে। এরূপে অপরিগ্রহী-সমাজে আমরা এত পরিগ্রহ বাড়াইতে চাই যে, লোকে তাহা কল্পনাই করিতে পারে না। কিন্তু আমরা চাই যে, সেই পরিগ্রহ, সেই সংগ্রহ প্রতিগৃহে বণ্টন করা হইবে। 'অপরিগ্রহী'-র অর্থ হইতেছে—খুব বড় সংগ্রহ, কিন্তু তাহা ঘরে-ঘরে বণ্টিত হইয়া থাকিবে।

"তৃতীয় কথা হইল যে, সংগ্রেহের মধ্যে কোন অকেজো জিনিস থাকিবে না। আমরা সিগারেটের মত অকেজো জিনিসের বোঝা বাড়াইতে চাহি না। উহা আমরা অসংগ্রহের দৃষ্টিতে হোলীর দিন জ্বালাইয়া দিতে চাই। অতএব অসংগ্রহের তৃতীয় অর্থ এই যে, সমাজে বাজে জিনিসের সংগ্রহ থাকিবে না। উহার প্রথম অর্থ এই যে, সমাজে লক্ষ্মী খুবই বৃদ্ধি

হওয়া চাই, কিন্তু বাজে জিনিসের সংগ্রহ না থাকা চাই। মদের বোতল ও সিগারেটের বাণ্ডিল লক্ষ্মী নহে।

"চতুর্থ কথা এই যে, অসংগ্রহ বা অপরিগ্রহে ভাল জিনিস হইলেও তাহার ক্রম নির্ণিত হইবে। আজ তো ক্রম সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণাই করা যায় না। বাজে জিনিস বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু অসংগ্রহী-সমাজে ১নং ক্রমে উত্তম খাদ্য চাই। ২নং ক্রমে বস্ত্র পাওয়া চাই। ৩নং ক্রমে ভাল বাসগৃহ পাওয়া চাই। ৪নং ক্রমে উত্তম যন্ত্রপাতি পাওয়া চাই। ৫নং ক্রমে জ্ঞানলাভের জন্য উত্তম গ্রন্থাদি পাওয়া চাই। ৬নং ক্রমে মনোরঞ্জনের জন্য সংগীত প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা চাই। এইভাবে প্রয়োজনের গুরুত্বের তারতম্য অনুসারে প্রত্যেক জিনিসের ক্রমিক নং থাকিবে এবং তদনুসারে সেই-সেই জিনিসের উৎপাদনও বৃদ্ধি করিতে হইবে। একভাই বলিতে-ছিলেন যে, লোকে ভাল-ভাল কাপড় পরিয়া সভায় আসে। অতএব দারিদ্র্য নাই। আমি বলিব, দারিদ্র্য নিশ্চয় আছে, কিন্তু লোকের বুদ্ধি কম হইয়াছে। শহরে ভাল খাইতে পায় না তথাপি ভাল-ভাল পোষাক পরে। খাঁটি ঘি পাওয়া যায় না, 'দালদা' খাইয়া থাকে। কোন-কোন ঘরে ভাল খাদ্যের জোগাড় নাই, অথবা উহা প্রস্তুতই করা হয় না, কিন্তু বস্ত্র খুব আছে। টুথব্রাশ, পেণ্ট, লিপষ্টিক ইত্যাদি আছে। হারমোনিয়ামও আছে। আরে ভাই, বাদ্য-যন্ত্র তো বাজাইবেই। কিন্তু প্রথমে তো খাও, তারপরে বাজাইবে। এইভাবে কোন্ জিনিস আগে চাই এবং কোন্ জিনিস পরে তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। ধরুন, আমাদের ঘরে পর্যাপ্ত দুধ নাই, পর্যাপ্ত ঘি নাই। তাহা আমরা প্রথমে আনিব। সুতরাং অসংগ্রহের চতুর্থ অর্থ হইল—ক্রমানুসারে সংগ্রহ।

"পঞ্চম অর্থ হইল—অপরিগ্রহী-সমাজে পয়সা যতদূর সম্ভব কম থাকিবে। পয়সা লক্ষ্মী নহে, উহা রাক্ষসী। কলা, আম, তরকারী, শস্য—ইহারা লক্ষ্মী। কিন্তু এই-যে পয়সা ইহা নাসিকের কারখানায় তৈয়ারী হয়। সেখানে কাগজ হইতে উহা তৈয়ারী করা হয়। যেমন কাহারও নিকট হইতে কলা কাড়িয়া লইতে হইলে রিভলভার দেখাইয়া তাহাকে বলা হয় যে, কলা দিবে কি-না বল? কলা খরিদ করাও ঠিক সেইরূপ। উহাতে

রিভলভারের মত নোট দেখাইয়া বলা হয়, 'কলা দিবে কি-না বল'। রিভলভার দেখাইয়া কলা কাড়িয়া লওয়া যেমন চুরি, যেমন ডাকাতি, টাকার নোট দেখাইয়া ঘি লইয়া যাওয়াও সেইরূপই ডাকাতি। পয়সা তো রাক্ষসের যন্ত্র। কিন্তু লক্ষ্মী হইলেন দেবতা। লক্ষ্মী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে থাকেন। 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ'—উদ্যোগীপুরুষই লক্ষ্মীলাভ করেন। 'করাগ্রে বসতে লক্ষ্মীঃ'—লক্ষ্মীর বাস আমাদের হাতে, আমাদের আঙ্গুলে। এই যে পাঁচ আর পাঁচ দশ আঙ্গুল ভগবান আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহার দ্বারা পরিশ্রম করিলে লক্ষ্মীলাভ হয়। তাই অপরিগ্রহী-সমাজে যেজিনিস সর্বাপেক্ষা কম থাকিবে তাহা হইল পয়সা। পয়সা লোককে এরূপ ভ্রমে ফেলিয়া দেয় যে, বস্তুতপক্ষে যেব্যক্তি দরিদ্র তাহাকেই লক্ষ্মীবান বলিয়া মনে করা হয়, আর যেব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীবান তাহাকে দরিদ্র বলিয়া মনে করা হয়। যাহার দধি, দুধ, তরকারী ও শস্যাদি আছে তাহাকেই দরিদ্র বলা হয়, আর যাহার নিকট এগুলির কিছুই নাই, কিন্তু কেবলমাত্র পয়সা আছে, তাহাকে বলা হয় ধনবান।"

গ্রামরাজ ও রামরাজ

সর্বোদয়ের আদর্শে সংগঠিত গ্রামকে বিনোবাজী 'গ্রামরাজ' আখ্যা দিয়াছেন। গান্ধীজী 'রামরাজ' প্রতিষ্ঠার কথা বলিতেন। এই দুইটি কি একই জিনিস? মনে করুন, ভূমিদানযজ্ঞ ও সম্পত্তিদানযজ্ঞ সফল হইয়া ভূমির মালিকানাবোধ দূর হইল। যিনি জমি চাষ করিতে চাহেন তিনিই জমি পাইতেছেন। প্রতিটি গ্রাম জনশক্তির বলে জীবনধারণের পক্ষে প্রাথমিক ভাবে আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যাদি গ্রামেই উৎপন্ন করিয়া লইতেছে। প্রতিটি গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে। কোন্ জিনিস গ্রামে উৎপন্ন হইবে তাহা নির্ণয় করিবার ও সেই সিদ্ধান্তটি কার্যকরী করিবার অধিকার গ্রামবাসী অর্জন করিয়াছে। রাষ্ট্রশক্তি গ্রামে-গ্রামে বিকেন্দ্রীকৃত করা হইয়াছে। সমাজে কোথাও উচ্চ-নীচ ভেদভাব নাই। সকল মানুষ জীবনযাত্রার সমান সুযোগ লাভ করিয়াছে। কাজের প্রকৃতি বা প্রকারভেদে আয়ের ইতর-বিশেষ আর নাই। সকল কাজেরই সমান মূল্য—ইহাই হইতেছে 'গ্রামরাজ'। 'গ্রাম-

রাজে' যাহা কিছু সিদ্ধান্ত বা নির্ণয় করা হইবে তাহা সর্বসম্মতিক্রমেই করা হইবে। 'গ্রামরাজে'র অবস্থায় মতভেদ বা বিবাদের উদ্ভব হইতে পারে, তবে তাহার মীমাংসাও সর্বসম্মতিক্রমেই হইবে। কিন্তু 'রামরাজে' বিবাদ-বিসংবাদ বা মতভেদেরই উদ্ভব হইবে না। তাহা হইবে সম্পূর্ণরূপে, শাসনমুক্ত অবস্থা। সেখানে প্রত্যেক মানুষ নিজের বিবেকবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইবে। সুতরাং বিনোবাজীর 'গ্রামরাজ' মহাত্মা গান্ধীর 'রামরাজে'র পূর্ব-সূচনা। এ সম্পর্কে বিনোবাজী একদা মন্তব্য করিয়াছিলেন, "যেক্ষেত্রে গ্রামের মতভেদ গ্রামেই সর্বসম্মতিক্রমে মীমাংসিত হয় তাহাই হইবে 'গ্রামরাজ'। যে-অবস্থায় মতভেদ বা বিবাদের উদ্ভবই হইবে না সে-অবস্থাই হইবে 'রামরাজ'।"

ভূদানযজ্ঞের সপ্তবিধ উদ্দেশ্য

এযাবৎ ভূদানযজ্ঞের বহুমুখী উদ্দেশ্যের কথা আলোচিত হইয়াছে। বিনোবাজী ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উহার সপ্তবিধ উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছেন। তাহা হইতেছে ঃ—

(১) দারিদ্র্যমোচন।

(২) জমির মালিকগণের হৃদয়ে প্রেমভাবের বিকাশসাধন এবং তাহার ফলে দেশের নৈতিক আবহাওয়ার উন্নতিসাধন।

(৩) একদিকে বৃহৎ ভূস্বামী এবং অন্যদিকে সর্বহারা ভূমিহীন দরিদ্র—এই উভয়ের মধ্যে শ্রেণী-বিদ্বেষ যাহা অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভূদানযজ্ঞের দ্বারা নিবারিত হইবে, পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও সদ্ভাবনার বন্ধন দৃঢ় হইবে এবং উহার পরিণামস্বরূপ সমাজও শক্তিশালী হইবে।

(৪) যজ্ঞ, দান ও তপঃ—এই তিনের অপূর্ব দর্শনের ভিত্তিতে যে-ভারতীয় সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার পুনরুত্থান ও উন্নতি সাধিত হইবে। মানুষের ধর্মবিশ্বাস দৃঢ় হইবে।

(৫) দেশের অভ্যন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(৬) দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে বিশেষ সহায়ক হইবে।

(৭) ভূদানযজ্ঞের দ্বারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়া একই মঞ্চে মিলিত হইবার ও মিলিতভাবে কাজ করিবার সুযোগ পাইবেন। ইহাতে দেশ সকল দিক হইতে শক্তিলাভ করিবে।

যুগপৎ উভয় পদ্ধতির অনুসরণ

এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য দুইটি সাধন-প্রক্রিয়া একই সঙ্গে অনুসরণ করা হইতেছে। এক হইতেছে—আধ্যাত্মিকতা বিকাশের জন্য প্রচেষ্টা এবং অন্যটি হইতেছে—জন-জাগৃতি। ভূমিতে সকলের সমান অধিকার। ধন-অর্থ শুধু ব্যক্তিগত ভোগের জন্য নহে। উহা সমাজের। ব্যক্তিগতভাবে মানুষ সমাজের পক্ষ হইতে উহার ন্যাসরক্ষক মাত্র। এই-বোধ জনগণের মধ্যে জাগ্রত হইলে উহার প্রতিক্রিয়ার চাপে যাঁহার অধিক আছে তিনি না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি কেবলমাত্র এইরূপ জাগৃতি হয় এবং আর কিছু না করা হয়, তবে তাহার পরিণামস্বরূপ হিংসার দিকে প্রবণতা সৃষ্টি করিবে। তাই সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের মধ্যে আধ্যা-ত্মিকতার বিকাশ হওয়া চাই। সর্বভূতে একই আত্মা বিরাজমান। তাই মানুষ নিজেকে যেমন ভাবে ও দেখে অন্যকেও সেইরূপ ভাবিবে ও দেখিবে। সকলের আত্মা সমানভাবে জাগ্রত ও বিকশিত হইতে পারে। উহাতে ধনীরও হৃদয়-পরিবর্তিত হইবে। উপরন্তু উহা জনগণকে সত্য ও অহিংসার পথ অনুসরণ করিবার দীক্ষা দান করিবে। তাই এই দুইপ্রকারের প্রচেষ্টা যুগপৎ অগ্রসর হওয়া চাই। নচেৎ বিপদের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। বিনোবাজী যুগপৎ এই দুইদিক দিয়া অগ্রসর হইতেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "প্রথম হইতেছে এই যে, অন্তর্স্থিত ভগবান আমাদের ভরসা। শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, সেই ভগবান জাগ্রত হইবেনই এবং মানুষকে সৎপথে চলিবার প্রেরণা দান করিবেন। দ্বিতীয়ত আমরা এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টা করিতেছি যাহাতে জন-জাগৃতি আসিবে এবং লোকে দান না দিয়া থাকিতে পারিবে না। এরূপে আমরা উভয়বিধ জাগৃতি আনিবার চেষ্টা করিতেছি—(১) নৈতিক জাগৃতি, তাহাতে হৃদয়-পরিবর্তন সাধিত হইবে এবং (২) জনমানসে চেতনার সঞ্চার। যদি কেবলমাত্র

জনগণের মধ্যে চেতনা আসে এবং নৈতিক জাগৃতি না আসে, তবে তাহা হিংসাশক্তিকে জাগ্রত করিতে পারে। অন্যদিকে যদি কেবল নৈতিক জাগৃতি হয়, তবে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বহুদিন লাগিবে। যেমন উড়িবার জন্য পক্ষীর উভয় পক্ষেরই প্রয়োজন হয়, তেমনি কোন সৎসংকল্পের সিদ্ধির জন্য অন্তর্জাগৃতি ও বাহ্য-পরিবর্তন উভয়েরই আবশ্যক।"

বুদ্ধি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা

বুদ্ধি দিক্ প্রদর্শন করে এবং হৃদয় কর্মে প্রেরণাদান করে। নৌকার হাল (কর্ণ) নৌকা কোন্‌দিকে যাইবে তাহা দেখাইয়া দেয়, আর দাঁড় (ক্ষেপণী) তাহার শক্তির দ্বারা নৌকাকে চালনা করে। বুদ্ধি হইতেছে হাল আর হৃদয় বা শ্রদ্ধা হইতেছে দাঁড়। শ্রদ্ধা motor force এবং বুদ্ধি steering। জীবনের কোন মৌলিক সিদ্ধান্ত যখন সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন মানুষ বুদ্ধির দ্বারা সেই বিচার বুঝিয়া লয়। তখন সেই সিদ্ধান্ত কোনদিকে লইয়া যাইবে তাহা সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। তাহা সত্ত্বেও সেইবিচার যদি তাহার হৃদয়কে স্পর্শ না করে, তবে সে কর্মে প্রেরণালাভ করিতে পারে না। অন্যদিকে এমনও হইতে পারে, একজনের বুদ্ধি তেমন প্রখর নহে, বুদ্ধির দ্বারা বিচার ভালভাবে বুঝিতে সে সক্ষম হইল না। অথচ সিদ্ধান্ত তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে অর্থাৎ ঐ সিদ্ধান্তের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ঐ সিদ্ধান্তের বিচারধারা ভালভাবে না বুঝিলেও শ্রদ্ধার বলে সে আন্তরিকভাবে কাজ করিয়া যাইবে। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এক জিনিস। শ্রদ্ধা থাকিলে বিশ্বাস আসিবেই। অহিংসার ব্যাপারে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসেরই সবচাইতে বেশী প্রয়োজন। ভূদানযজ্ঞের ক্ষেত্রেও তাই। যদি বিনোবাজী তেলঙ্গানার পাচমপল্লী গ্রাম হইতে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও জ্বলন্ত বিশ্বাস লইয়া অগ্রসর না হইতেন, তবে কি আর এই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছা সম্ভব হইত? অহিংসা-মূলক সিদ্ধান্তের বিচারধারা ধীরে-ধীরে পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে। তাই উহার সাধনের জন্য প্রথমে শ্রদ্ধা লইয়া অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু এই আন্দোলনের আজ আর সেই অবস্থা নাই। ভূদানযজ্ঞের বিচারধারা আজ

এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, গভীরভাবে উহা বুঝিয়া লইবার পক্ষে পূর্ণ অবকাশ রহিয়াছে। অতএব যেখানে শিথিলতা ও নিষ্ক্রিয়তা দেখিতে পাওয়া যাইবে সেখানে বুঝিতে হইবে যে, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাব রহিয়াছে। বিনোবাজী বলেন—"পৃথিবীতে কোন-কোন কাজ বুদ্ধির দ্বারা করিতে হয়, আবার কোন-কোন কাজ শ্রদ্ধার দ্বারা করিতে হয়। দুই-ই পরস্পরের পূরক। দুই-এরই আবশ্যকতা আছে। বুদ্ধি ও শ্রদ্ধা সম্পর্কে আমি এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকি—বুদ্ধি হইতেছে তাহা, যাহা প্রমাণ ব্যতীত কোন বিষয়কে স্বীকার করে না। আর শ্রদ্ধা হইতেছে তাহা, যাহা কোন বিশিষ্ট বিষয় মানিবার জন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।" যেমন শিশু মাতার স্তন্য পান করিবার পূর্বে তাহার ইহা প্রমাণ করাইয়া লইবার প্রয়োজন হয় না যে, স্তন্যে সার পদার্থ আছে এবং উহাতে তাহার পোষণ হইবে। শ্রদ্ধাবশত বিনা প্রমাণেই সে স্তন্য পান করে। তাই বিনোবাজী বলেন—"এইজন্য কোন-কোন বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধা থাকা চাই।"

শ্রদ্ধার সহিত কর্ম সম্পাদন করিতে থাকিলে যতই ফলোদয় হইতে থাকে, ততই নিষ্ঠাও জন্মিতে থাকে। কাজে যতই অভিজ্ঞতা হয়, ততই নিষ্ঠাও দৃঢ় হইতে থাকে। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধা এক দৃঢ় দেওয়ালের মত। হয় ইহা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, নচেৎ ইহা ভূ-শায়িত হইয়া থাকিবে। হয় ইহা পরিপূর্ণ নচেৎ ইহা একেবারেই নাই। যেমন কোন মানুষ, হয় সম্পূর্ণ জীবিত না হয় সম্পূর্ণ মৃত। যেমন কেহ শতকরা ৪০, ৫০ বা ৬০ ভাগ জীবিত আর ৬০, ৫০ বা ৪০ ভাগ মৃত হইতে পারে না, সেরূপ শ্রদ্ধা কখনও আংশিক হইতে পারে না। শ্রদ্ধা ব্যতীত কোন মহৎ কার্য কখনও সাধিত হয় না। কর্ম শ্রদ্ধাকে অনুসরণ করে এবং কর্মের পশ্চাতে নিষ্ঠা আসিয়া থাকে। নিষ্ঠা জন্মিবার পূর্বে মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে কাজ করিয়া যায়। অভিজ্ঞতায় সফলতাপ্রাপ্ত হইলে নিষ্ঠার উদয় হয়। মানুষ কোন কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে উহাতে তাহার শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন। আমরা নৈতিকশক্তির দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করিতে চাই। সুতরাং সাধনোপায়ে আমাদের দৃঢ়শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন।"

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞান শক্তি ও গতি দান করে, আর জ্ঞান পথ প্রদর্শন করে। যেখানে আত্মজ্ঞান সেখানে ভূমার দিকে পথ প্রদর্শিত হয়। যেখানে অহিংসা সেখানে পথ পরম কল্যাণের দিকে। যেমন আত্মজ্ঞান ও অহিংসা পথ দেখায়, তেমনি হিংসা ও অজ্ঞানও পথ দেখায়। তবে অজ্ঞান বা হিংসা যে-পথ দেখায় তাহা হইতেছে বিনষ্টের পথ, অকল্যাণের পথ। বিজ্ঞান motor force এবং আত্মজ্ঞান, অহিংসা, অজ্ঞান ও হিংসা steering। বিজ্ঞান নৌকার ক্ষেপনী (দাঁড়) এবং আত্মজ্ঞান বা অহিংসা অথবা অজ্ঞান বা হিংসা নৌকার কর্ণধার। তাই বিজ্ঞান হিংসার সাহায্য করিলে অশেষ অনিষ্টসাধন করে। পুরাকালে বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই। তাই যুদ্ধ বাধিলে হাতাহাতি যুদ্ধ হইত। যাহারা যুদ্ধে যোগদান করিত, ক্ষতি-বৃদ্ধি কেবলমাত্র তাহাদেরই হইত। আজকাল বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় যুদ্ধ বাধিলে সারা পৃথিবী তাহার কবলস্থ হইয়া পড়ে এবং অনিষ্টসাধনের অবধি থাকে না। হিংসার সহিত বিজ্ঞান যুক্ত হইয়া 'এটম-বোমা' সৃষ্টি করিয়াছে। সেরূপ অহিংসা বা আত্মজ্ঞানও বিজ্ঞানের সহায়তায় দেশ-বিদেশে প্রসারিত এবং প্রচারিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। বিজ্ঞানকে যদি কল্যাণদায়িনীশক্তিরূপে পাইতে হয়, তবে তাহার সঙ্গে আত্মজ্ঞান বা অহিংসার মিলনসাধন করিতে হইবে এবং অজ্ঞান বা হিংসার সঙ্গে বিজ্ঞানের চিরবিচ্ছেদ সংঘটন করাইতে হইবে। নচেৎ জগৎ দ্রুততর গতিতে ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকিবে।

গান্ধী-দর্শনে ত্রয়ী নীতি

গান্ধী-দর্শনের লক্ষ্য হইতেছে অহিংস সমাজরচনা বা সর্বোদয়-সমাজ প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী তিনটি নীতির কথা বলেন। গান্ধীজীর বিচারধারাকে নব সমাজরচনায় রূপাইত করিতে হইলে ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনে ঐ তিন নীতি প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। অহিংস সমাজরচনার জন্য যেকোন কার্যক্রম এযাবৎ দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে তাহা সব ঐ তিন নীতির মধ্যেই নিহিত। ভূদানযজ্ঞের কার্যক্রমও ঐ তিন

নীতিরই অন্তর্ভুক্ত। ঐ তিন নীতি হইতেছে—(১) বর্ণ-ব্যবস্থা, (২) ট্রাস্টী-শিপ ও (৩) বিকেন্দ্রীকরণ।

(১) বর্ণ-ব্যবস্থা—বর্ণ-ব্যবস্থার কথা শুনিয়া অনেকেই চমকাইয়া উঠিতে পারেন। উহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। কারণ বর্ণ-ব্যবস্থার মূলে পবিত্র কল্পনা থাকিলেও সমাজ উহাকে বিকৃত করিয়া জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, উচ্চনীচ-ভেদ ও ধনবৈষম্য ইত্যাদির দ্বারা নিজেকে অধঃপতিত করিয়াছে। এজন্য বর্ণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে লোকের মনে ঐসব গুরুতর সামাজিক গ্লানির কথা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু গান্ধীজী অহিংস সমাজরচনার ক্ষেত্রে যে-অর্থে উহা প্রয়োগ করিতে চান তাহার সহিত বিকৃত বর্ণ-ব্যবস্থার ঐসমস্ত গ্লানিগুলির কোনরূপ সংস্রব নাই। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমাজে যেসব মহান্ শব্দ পরম্পরাগত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে সে-সকল শব্দ পরিত্যাগ না করিয়া সমাজের নূতন প্রয়োজন অনুসারে নূতন অর্থ ভরিয়া দিয়া ঐ শব্দগুলির প্রচলন করাও এক অহিংস প্রক্রিয়া। এইভাবে বর্ণ-ব্যবস্থাকে অহিংস সমাজরচনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-স্বরূপ গণ্য হইবার উপযোগী করিয়া গান্ধীজী উহার প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব 'বর্ণ-ব্যবস্থা' শব্দের ব্যবহারে আপত্তির কারণ নাই। শব্দের বিশেষ কিছু মূল্য নাই। কোন্ অর্থে উহার প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাই আসল কথা।

অহিংস সমাজরচনার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বর্ণ-ব্যবস্থার মূলভূত সার হইতেছে :—(ক) সকলপ্রকার কাজের সমান পারিশ্রমিক ও সমান মর্যাদা (খ) প্রতিযোগিতার অভাব ও (গ) শিক্ষা-ব্যবস্থায় বংশ পরম্পরাগত সংস্কৃতিকে কাজে লাগানো। অহিংস সমাজরচনায় এই তিন জিনিসেরই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। যদি গান্ধীজী অন্যদেশে অন্য সংস্কৃতির মধ্যে জন্মিতেন, তবে এ সম্পর্কে বর্ণ-ব্যবস্থা শব্দ হয়তো তাঁহার মনে আসিত না। উপরোক্ত তিনটি ভাবের দ্যোতক এমন অন্যকোন উপযোগী শব্দ তিনি প্রয়োগ করিতেন।

শ্রীকিশোরলাল মশ্রুওয়ালাজী বর্ণ-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন—"সাধারণত লোকে পিতার জীবিকা অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহাতে

সমাজ-জীবনে স্থিরতা আসে, সন্তানকে ব্যবস্থিত শিক্ষাদান করিবার পক্ষে সুবিধা হয় এবং উহা সেইকাজের বৈজ্ঞানিক উন্নতির পক্ষেও বিশেষ সহায়ক হইয়া থাকে। যদি সকল কাজের পারিশ্রমিক এক বা প্রায় সমান হয় এবং মর্যাদাও সমান হয়, তবে বিশেষ অবস্থা ব্যতীত অন্যবৃত্তি গ্রহণ করিবার জন্য লোকের আকর্ষণ বা আগ্রহ হইবে না। সাধারণত এরূপ মনে করা হইয়া থাকে যে, পিতা-মাতার বৃত্তির প্রতি রুচি ও উহার কুশলতা সন্তানের রক্তেও সংক্রমিত হইয়া থাকে। এই বিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, জীবনব্যাপী ও পুরুষানুক্রমে একই বৃত্তি অনুসরণ করিলে শরীর-গঠনে স্থায়ী পরিবর্তন হইয়া থাকে এবং ঐ পরিবর্তন সন্তানের উপর বর্তিবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। উপরন্তু সন্তান শৈশব হইতেই পিতা-মাতার বৃত্তির আবহাওয়ায় লালিত-পালিত হইয়া থাকে। এই দুই কারণে সন্তানের পক্ষে অন্যপেশা অপেক্ষা পিতার পেশা শিক্ষা ও গ্রহণ করাই বিশেষভাবে সহজসাধ্য হইয়া থাকে। এইজন্য সমস্ত জীবনের সাধারণ নিয়ম এই হওয়া উচিত যে, প্রত্যেকে জীবিকা উপার্জনের জন্য তাহার পিতার পেশা অথবা ঐ পেশার কোন শাখা অথবা ঐপেশার বিকাশ-স্বরূপ সৃষ্ট কোন পেশাকে অবলম্বন করা ধর্ম বলিয়া মনে করিবে। সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন পেশা অবলম্বন করা অবাঞ্ছনীয়। যদি ইহা একবার নিশ্চিত-ভাবে স্থির হইয়া যায় যে, প্রত্যেকে জীবিকা অর্জনের জন্য তাহার পিতা-মাতার পেশা অবলম্বন করিবে, তবে আজ যেমন লোকে এম. এ. ডিগ্রী পর্যন্ত লাভ করিয়াও কোন্ পেশা গ্রহণ করিবে তাহা স্থির করিতে পারে না,তেমন বেদনাদায়ক দৃশ্য আর দেখিতে হইবে না। কারণ তাহা হইলে এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া গোড়া হইতেই প্রত্যেকের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইবে।”

নিম্নলিখিত বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে পেশা অবলম্বনের নিয়ম লঙ্ঘন করা যাইতে পারে ঃ—

(১) যদি পিতার বৃত্তি মূলনীতির বিরোধী হয়, তবে ঐ বৃত্তি পরিবর্তন করা যাইতে পারে এবং তাহা করাও বাঞ্ছনীয়।

(২) যদি কাহারও মধ্যে অন্যকোন পেশার উপযোগী গুণের বিশেষ

বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তিনি জীবিকার জন্য পৈতৃক পেশাই অবলম্বন করিবেন—কিন্তু সেবার জন্য পারিশ্রমিক না লইয়া সেই অন্যকাজ করিতে পারিবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি কোন কৃষকের পুত্রের মধ্যে সৈনিকের গুণের বিকাশ হয়, তবে জীবিকার জন্য তিনি কৃষি-কার্য করিবেন এবং দেশসেবার জন্য বিনা পারিশ্রমিকে সৈনিকের কাজ করিতে পারিবেন।

(৩) সমাজের পরম্পরাগত কোন ব্যবসায়ে আমূল বা হিতকারী কোন পরিবর্তন সাধন করিবার উদ্দেশ্যে যদি নূতন দৃষ্টিসম্পন্ন কর্মী সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হয়, তবে অন্য বৃত্তিধারী মানুষও সেবার্থে সেইকাজ গ্রহণ করিতে পারেন। যেমন আজ নূতন সমাজরচনার জন্য বুদ্ধিজীবী-শ্রেণীর মধ্য হইতে কৃষি, গো-পালন ইত্যাদির কাজে লাগিবার জন্য কর্মী আহ্বান করা হইতেছে।

এদেশে জমি কম। তাই সকল কৃষককে জীবিকা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত জমি দেওয়া সম্ভব নহে। এজন্য পরিপূরক বৃত্তিস্বরূপ কৃষককে অন্যান্য গৃহশিল্প চালাইতে হইবে। উপরন্তু নবসমাজরচনায় মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কৃষক যদি কেবল-মাত্র চাষই করে, তবে তাহার ব্যক্তিত্বের বিশেষ বিকাশ হইবে না। তাই এরূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছে যে, কৃষকের গৃহে অন্যান্য শিল্পও চলিবে। তাই বহু-শিল্পী পরিবার (multicraft family) সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। ইহা বর্ণ-ব্যবস্থার পরিপন্থী নহে কি? না, উহা বর্ণ-ব্যবস্থার পরিপন্থী নহে। যদি আজ সমাজে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থার জন্য বা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের জন্য পিতাকে একাধিক কাজ করিতে হয়, তবে পুত্রও জীবিকা অর্জনের জন্য ঠিক সেই-সেই কাজ করিবেন। মুখ্যত যিনি যেকাজই করুন না কেন বিনোবাজী সকলকেই কিছুসময়ের জন্য নিয়মিত কৃষিকার্য করিতে বলেন। কারণ কৃষি সর্বোত্তম শরীর-শ্রম ও শ্রেষ্ঠ শিল্প। এইভাবে কৃষির কাজ যিনি করিবেন, তিনি উহা তাঁহার জীবিকা উপার্জনের অঙ্গস্বরূপ করিবেন না সেবার্থ করিবেন তাহা তাঁহার মুখ্য-বৃত্তির আয়ের পরি-মাণের উপর নির্ভর করিবে। যদি মুখ্যবৃত্তির আয় তাঁহার পক্ষে পর্যাপ্ত

হয়, তবে তিনি সেবার্থে কৃষির কাজ করিবেন। যেমন, জজ সাহেব সেবার্থে কৃষির কাজ করিবেন। নতুবা তাঁহার মাহিনা এতটা কম হওয়া আবশ্যক যাহাতে কৃষির আয় সমেত উহা তাঁহার জীবিকার পক্ষে পর্যাপ্ত হয়। যদি তাঁতের কাজে তাঁতীর আয় অপ্রচুর হয়, তবে কৃষি-ই তাঁহার পরিপূরক বৃত্তি হইবে।

বর্ণ-ব্যবস্থা অনুসারে সকল কাজের আর্থিক মূল্য যদি সমান হয় এবং উহার মর্যাদাও সমান হয়, তবে বুদ্ধিজীবীরাও স্বাস্থ্যলাভ ও জীবন-বিকাশের জন্য ক্রমশঃ কৃষির কাজ বা শরীর-শ্রমসাধ্য অন্যকোন কাজ করিতে আকৃষ্ট হইবে।

(২) ট্রাষ্টীশিপ—বর্ণ-ব্যবস্থার ন্যায় ট্রাষ্টী বা ট্রাষ্টীশিপ কথাটিও অনেকের কাছেই ভাল লাগে নাই। ইহার কারণ এই যে, আইনানুসারে নিযুক্ত ট্রাষ্টিগণের মধ্যে বহুক্ষেত্রে সততার অভাব দেখা গিয়াছে এবং তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতা ও অধিকারের অপব্যবহার করিয়া জনসাধারণের বিরাগভাজন হইয়াছেন। তাই অনেকে সন্দেহ করিতেন যে, গান্ধীজী রাজা, জমিদার, পুঁজিপতি ও অন্যান্য কায়েমী-স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের রক্ষার জন্য ট্রাষ্টীশিপের প্রবর্তন করিয়া তাঁহাদিগকে আর একটি রক্ষাকবচ প্রদান করিয়াছেন। এই আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক। ব্যক্তিগতভাবে কাহারও কাছে একটুও সম্পত্তি থাকুক ইহা গান্ধীজী চাহেন নাই। যাহা হউক, আইনে 'ট্রাষ্টী'-শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য অতি পবিত্র। সত্যাগ্রহী গান্ধীজী সেই পবিত্র অর্থেই উহা গ্রহণ করেন। অপরিগ্রহ, সমভাব ইত্যাদি গীতোক্ত ভাবধারা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। ব্যবহারিক জীবনে কিরূপে উহা আচরণ করা যাইবে তাহার চিন্তা করিতে গিয়াই 'ট্রাষ্টী' শব্দটিকে তিনি উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করেন। আইনে ট্রাষ্টী-শব্দের যে-অর্থ তৎসমুদয় অর্থ তো গান্ধীজীর ট্রাষ্টীশিপের মধ্যে নিহিত রহিয়াছেই, উপরন্তু নৈতিক দৃষ্টিতে আর যে-যে অর্থ অনিবার্যভাবেই আসিতে পারে তাহাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিনোবাজী ট্রাষ্টীশিপের পরিবর্তে 'বিশ্বস্তবৃত্তি'-শব্দ ব্যবহার করেন। এক্ষণে গান্ধীজীর ট্রাষ্টীশিপ সিদ্ধান্তের ভাবধারা কি তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক।

জগতে যাহাকিছু আছে—স্থাবর-জঙ্গম, চেতন-অচেতন, স্থূল-সূক্ষ্ম, বাহ্য-অন্তর, দৃশ্য-অনুভবযোগ্য প্রভৃতি সমস্তকিছুরই মালিক ভগবান। মনুষ্য কোনকিছুরই মালিক নহে। শরীর, মন, বুদ্ধি, ক্ষমতা ও কুশলতার মালিকও মনুষ্য নহে। স্বামিত্ব ভগবানের। উদাহরণস্বরূপ—কল-কারখানার মালিক উহার ম্যানেজার, ডিরেক্টর, অংশীদার, শ্রমিকগণ নহেন; উহার মালিক ঈশ্বর। জমি যাঁহার হাতে আছে মালিক সেইব্যক্তি নহেন। জমির মালিক ভগবন। শুধু তাহাই নহে, শ্রমিকের শ্রমশক্তির মালিকও শ্রমিক নহেন, উকিলের বুদ্ধিশক্তির মালিক উকিল নহেন, রাজ্যকর্তার রাজশক্তির মালিক তিনি নহেন, পুলিশমুখ্যের ক্ষমতার মালিক তিনি নহেন। সবকিছুরই মালিক ঈশ্বর। আইনে ট্রাস্টীশিপের ব্যাপারে ট্রাস্ট-সম্পত্তির মালিক থাকা চাই ও ট্রাস্ট সম্পত্তির আয় উপভোগের জন্য হিতাধিকারী (beneficiary) থাকা চাই। গান্ধীজীর পরিকল্পিত ট্রাস্টীশিপে ট্রাস্ট-সম্পত্তির মালিক হইতেছেন ভগবান এবং উহার হিতাধিকারী হইতেছে সমগ্র সৃষ্টি। যেমন, কলকারখানার সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রমিক, ম্যানেজার, পুঁজিপতি প্রভৃতি যাঁহারা আছেন কেবলমাত্র তাঁহারাই কারখানার আয় ভোগ করিবার অধিকারী নহেন—সকলেই উহা ভোগ করিবার অধিকারী, এমন কি মনুষ্যেতর জীবও। তবে এ বিষয়ে মনুষ্যের অগ্রাধিকার থাকিবে মাত্র। যাঁহার কাছে যাহা আছে—তিনি উহার সম্পর্কে নিজেকে ট্রাস্টী বলিয়া গণ্য করিবেন। তিনি সযত্নে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং মিতব্যয়ীর মত উহার ফল ভোগ করিবেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে তিনি উহার যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিবেন এবং অবশিষ্ট সমস্তই সেবার্থে সমর্পণ করিবেন। নিজের শরীরকেও যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া নষ্ট করিবার অধিকার কাহারও নাই। উহা তো সমগ্রসৃষ্টির সেবার জন্য। তাই সযত্নে সতর্কতার সহিত শরীরকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে এবং সেবার্থে প্রয়োজন হইলে উহাকে বিসর্জন দিতে হইবে। মানুষের শক্তি, বুদ্ধি, কুশলতা, ক্ষমতা, অধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সবই সমগ্রসৃষ্টির সেবার জন্য।

গান্ধীজী এইভাবে ব্যক্তিগত-সম্পত্তি রাখিয়া দিতে চান কি? না, তাহা নহে। যতদিন সম্পত্তি-পরিগ্রহের প্রথা নিবারণ করা না যাইতেছে

ততদিন ব্যক্তিগত-সম্পত্তি যাঁহার কাছে রহিয়াছে বা থাকিবে তাঁহাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে এবং ততদিন ঐ ব্যক্তিগত-সম্পত্তি তাঁহার কাছে কি-ভাবে থাকিবে তাহাই হইতেছে ট্রাষ্টীশিপের প্রয়োজনীয়তার মূলকথা। তিনি উহা কেবল ট্রাষ্টীস্বরূপ দখল করিতেছেন এরূপ মনোবৃত্তি তাঁহার আসা চাই এবং তদনুরূপ আচরণও তাঁহার করা চাই।

আরও একটি কথা। ধরিয়া লওয়া যাউক, ব্যক্তিগত-সম্পত্তি চলিয়া গেল, অথবা উহা এতই কম হইল যে, উহার গুরুত্ব আর বিশেষকিছু থাকিল না। তখন কি ট্রাষ্টীশিপ-নীতির প্রয়োগের অবকাশ সমাজে আর থাকিবে না? না, তাহা নহে। শিক্ষা ইত্যাদির দ্বারা ক্রান্তির পথে অগ্রসরশীল সমাজে মানুষে-মানুষে দৈহিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক শক্তি ও যোগ্যতার বৈষম্য কম করা যাইতে পারে মাত্র, কিন্তু কিছু বৈষম্য চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। সুতরাং মানুষ চিরদিনই নিজেকে নিজের শরীর, মন ও বুদ্ধির দ্বারা ট্রাষ্টী বলিয়া গণ্য করিয়া তদ্রূপ আচরণ করিয়া চলিবে এবং তৎসমুদয় সেবায় বিনিয়োগ করিবে।

আইনে নাবালকের সম্পত্তি ট্রাষ্টীর হাতে গেলে যখন উক্ত নাবালক প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন ট্রাষ্টীর কর্তব্য থাকে তাহাকে তাহার সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা। যতদিন দেশে জনসংখ্যা কম ছিল এবং ভূমি বেশী ছিল ততদিন ভূমি-সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। অনন্তর উত্তরোত্তর দ্রুত বর্ধনশীল জন-সংখ্যার চাপে দেশে কোটী-কোটী ভূমিহীন দরিদ্রের সৃষ্টি হইল। কিন্তু এতদিন তাহারা অসাড় অবস্থায় ছিল, তাহারা নিদ্রিত ছিল। এখন তাহারা জাগরিত হইয়াছে। কোটী-কোটী ভূমিহীন নাবালক আজ যেন সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই এখন ভূমিবান ট্রাষ্টীগণের কর্তব্য হিতাধিকারী (beneficiary) ভূমিহীন দরিদ্রগণকে তাহাদের ভূমি প্রত্যর্পণ করা। ইহাই ভূদানযজ্ঞের আহবান।

কেহ-কেহ গান্ধীজীর ট্রাষ্টীশিপের ভুল অর্থ করিয়া থাকেন। এই কথা বলিতে গিয়া বিনোবাজী সম্প্রতি ট্রাষ্টীশিপ-সিদ্ধান্তের অর্থের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, “আমি ইহা বলিতে চাই যে, কেহ-কেহ গান্ধীজীর ট্রাষ্টীশিপ-সিদ্ধান্তের ভুল অর্থ

করিতেছেন।

"ট্রাস্টীশিপের প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, ট্রাস্টী নিজেকে পিতৃস্থানীয় বলিয়া গণ্য করিবেন। পিতা পুত্রকে নিজের অপেক্ষা অধিকতর ভালভাবে ভরণপোষণ ও সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। কোনও পিতা একথা বলেন না, আমি নিজেকে যতটা যত্ন করি পুত্রকেও ঠিক ততটাই যত্ন করিয়া থাকি। বরং পিতা এইকথা বলেন, আমি পুত্রকে নিজের অপেক্ষা আরও অধিক যত্ন করিয়া থাকি। এরূপে ট্রাস্টী নিজেকে পিতার মতই মনে করিবেন। কিন্তু শুধু ইহাতে ট্রাস্টীশিপের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। ট্রাস্টীশিপের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, পিতা চাহেন—পুত্র খুব তাড়াতাড়ি তাঁহার সমান হইয়া উঠুক, তাঁহার সমান যোগ্যতাপ্রাপ্ত হউক এবং নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখুক। এরূপে গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গভীর।" তাই সমাজে একটু-আধটু পরিবর্তন আসিলে, বা কিছু সংস্কার করা হইলেই ট্রাস্টীশিপের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া যায় না। শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি করা হইল, কিন্তু মালিক-শ্রমিকশ্রেণীকে স্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্যই মালিককে মালিক আর শ্রমিককে শ্রমিক রাখা হইল। ইহাতে ট্রাস্টীশিপও হইল না আর সর্বোদয়ও হইল না।

(৩) বিকেন্দ্রীকরণ—বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে কেবলমাত্র দু-একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

(ক) যন্ত্রযুগের আবির্ভাবের পূর্বে দেশের অর্থব্যবস্থা তথা শিল্পসমূহ বিকেন্দ্রীকৃত ছিল। এখন এই যে বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলা হইতেছে, ইহার মধ্যে নূতনত্ব কি আর থাকিতে পারে? এই আশঙ্কার নিরশন হওয়া প্রয়োজন। যন্ত্রযুগের পূর্বে সবই বিকেন্দ্রীকৃত ছিল বটে, কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা ছিল না। তখন গ্রামে-গ্রামে শিল্পগুলি ছড়াইয়া ছিল মাত্র। তাহার পশ্চাতে কোন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল না, কোন সংগঠনও ছিল না। তাই যন্ত্রযুগের প্রথম আঘাতেই শিল্পসকল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। নূতন সমাজরচনার পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ-ব্যবস্থা যন্ত্রযুগের তথা বিজ্ঞানের সমস্ত অবদানকেই কাজে লাগাইবে এবং শক্তি সঞ্চয় করিবার মত তাহাতে যাহাকিছু আছে তৎসমুদয়ই গ্রহণ করিয়া উত্তরোত্তর অধিক

শক্তিশালী হইবে। লক্ষ্য থাকিবে—যন্ত্রযুগ বা বিজ্ঞানের কোন অবদান গ্রহণ করিবার ফলে কোনরূপ বেকারত্ব, আলস্য ও বুদ্ধির জড়তা যেন সৃষ্টি না হয়। এইভাবে যন্ত্রযুগের যাহাকিছু গ্রহণযোগ্য হইবে বিকেন্দ্রীকরণ-ব্যবস্থা তৎসমুদয়ই গ্রহণ করিবে। পূর্বে যে-বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প ছিল তাহার এই শক্তি ছিল না। সমগ্র দৃষ্টি লইয়া তাহার সম্মুখে কোন ব্যাপক পরি-কল্পনাও ছিল না। বর্তমানের বিকেন্দ্রীকরণ-ব্যবস্থা যন্ত্রযুগের যাহাকিছু ভাল সবই হজম করিয়া লইবে এবং অবশেষে উহা যন্ত্রযুগকেই বিলীন করিয়া দিবে। পূর্বের বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প ও বর্তমানের বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনার মধ্যে এই বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে।

(খ) বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ কেবলমাত্র শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ নহে। রাজ্যশক্তির বিকেন্দ্রীকরণও ইহার অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু সমাজের যেকোন ক্ষেত্রে, যেখানেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে তাহারও বিকেন্দ্রীকরণ করা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

সূতাঞ্জলি

মহাত্মা গান্ধীর প্রথম শ্রাদ্ধ দিবস ১৯৪৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী দেশের সর্বত্র প্রতিপালন করা হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর দেহাবসানের পর তাঁহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে চালাইয়া যাইবার জন্য কি ব্যবস্থা করা যায় সে-সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে সেবাগ্রামে গঠনমূলক কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে গান্ধীজীর বিচারধারা যাঁহারা মান্য করেন তাঁহাদের এক ভ্রাতৃ-সমাজ (brotherhood) প্রতিষ্ঠা করা হয়। উহার নাম সর্বোদয়-সমাজ। সর্বোদয়-সমাজের সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্বোদয়-কল্পনার ব্যাপক প্রচারের জন্য প্রতি বৎসর ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেশের স্থানে-স্থানে মেলা হইয়া আসিতেছে। সূতাঞ্জলি সমর্পণ করা উক্ত মেলার এক প্রধান কার্যক্রম। গান্ধীজীর পুণ্যস্মৃতিকে যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন এবং যাঁহারা শরীর-শ্রমের আদর্শ মান্য করেন তাঁহাদের প্রত্যেককে নিজেদের হাতেকাটা একগুণ্ডী সূতা (৬৪০ তার) সর্বসেবা-সঙ্ঘের জন্য সমর্পণ করিতে হয়।

সূতাঞ্জলির কার্যক্রম স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামরাজ রচনা তথা শাসনমুক্ত-সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য কার্যক্রম। কারণ (১) সূতাঞ্জলি প্রচলিত হইলে সারাদেশে এক কর্মময় উপাসনা চলিতে থাকিবে। তাহাতে জনগণ এক প্রকৃত আধ্যাত্মিক দৃষ্টি লাভ করিবে। (২) সর্বোদয়-প্রতিষ্ঠার পক্ষে শরীর-শ্রমের আদর্শ অনুসরণ করা অপরিহার্য। সূতাকাটা দ্রোহরহিত উৎপাদক-শ্রমের প্রতীক। তাই উহা শ্রম-যজ্ঞের যোগ্য আহূতি। (৩) নিজের হাতেকাটা সূতা সমর্পণ করার অর্থ হইতেছে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামরাজ তথা সর্বোদয়ের পক্ষে ভোট দেওয়া। এক গুণ্ডীই দিতে হইবে, উহার অধিক নহে। কারণ তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, যতগুণ্ডী পাওয়া গিয়াছে সর্বোদয়ের পক্ষে তত লোকের সমর্থন বা ভোট পাওয়া গিয়াছে। সূতাঞ্জলি-রূপে যদি অর্থসংগ্রহ করার উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে থাকিত, তবে একজনের একাধিক গুণ্ডী দেওয়াতে কোন নিষেধ থাকিত না। (৪) সূতাঞ্জলি সমর্পণের মধ্যে-যে কি বিরাট শক্তি নিহিত আছে সে-সম্পর্কে এখনও লোকে সচেতন হয় নাই। প্রতি মেলায় পর্বতপ্রমাণ সূতা জমা হইয়াছে কল্পনা করা যাউক। তাহা হইলে কি চিত্র মনে আসে? বিনোবাজী বলেন, ইহাতে মনে হইবে হনুমান যেন 'চিত্রকূট'-পর্বত লইয়া আসিয়াছেন।

সর্বোদয়ের রূপ হইবে পল্লীশিল্পপ্রধান। খাদি পল্লীশিল্পের কেন্দ্র-স্বরূপ। মহাত্মা গান্ধী খাদিকে পল্লীশিল্পরূপ সৌরজগতের সূর্য আখ্যা দিয়াছেন। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময় খাদিকে স্বাধীনতার পরিচ্ছদ (livery of freedom) বলা হইত। বিনোবাজী বলেন, এখন খাদি 'সাম্যযোগের সংকেত-চিহ্ন' হইতে পারে। তাই সূতাঞ্জলি সর্বোদয়-সাধনার কার্যক্রমে ক্রমশ প্রধানস্থান গ্রহণ করিতে থাকিবে সন্দেহ নাই। যেসব ভূমিহীন দরিদ্রগণকে ভূমি-বিতরণ করা হইতেছে ও হইবে তাঁহারা যখন বিচার-বুঝিয়া শ্রদ্ধার সহিত নিয়মিতভাবে সূতাঞ্জলি অর্পণ করিতে থাকিবেন, তখনই ভূমি-বিতরণের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

সমন্বয়

বুদ্ধগয়া সর্বোদয়-সম্মেলনের এক বড় অবদান—বিনোবাজীকর্তৃক বুদ্ধ-

গয়ায় 'সমন্বয়-আশ্রমে'র প্রতিষ্ঠা। বিনোবাজী বুদ্ধগয়ায় 'সমন্বয়-আশ্রম' নামে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। ইহার লক্ষ্য হইবে—বেদান্তের সত্য এবং বৌদ্ধের অহিংসার সমন্বয়। তাই বিনোবাজী ইচ্ছা করিলেন যে, বুদ্ধগয়ার জগদ্বিখ্যাত বৌদ্ধ-মন্দিরের কাছাকাছি আশ্রমের জন্য একটু জমি পাইলে ভাল হয়। ঐখানে সহজে কোন জমি পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবানের এমন লীলা যে, বিনোবা তাঁহার অভিপ্রেত স্থানেই ৫/০ বিঘা জমি পাইলেন এবং জমিটি স্থানীয় শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মঠের পক্ষ হইতে খুবই আনন্দের সহিত ঐ আশ্রম নির্মাণের জন্য তাঁহাকে দান করা হইল। জমিটি বুদ্ধগয়া-মন্দিরের নিকটে। উপরন্তু সেখান হইতে শঙ্কর-মঠের সহিত যোগাযোগ করাও সহজ। সম্মেলনের প্রারম্ভে কাকা কালেলকার সমন্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়া এক সারগর্ভ ভাষণ দিলেন। বিনোবাজীর অনুরোধক্রমে সম্মেলনে যোগদানকারী সদস্য ও কর্মিগণ ২০শে এপ্রিল (১৯৫৪) দিবারাত্র পরিশ্রমে ঐ জমিতে একটি কূয়া খনন করিয়া দেওয়ায় উক্ত আশ্রমের ভিত্তি পত্তন করা হইল। সম্মেলনের গৃহাদি ভাঙ্গিয়া উহার বাঁশ, খড় ইত্যাদি সরঞ্জাম লইয়া গিয়া ২২শে এপ্রিল রাত্রির মধ্যে ঐ জমির উপর বিনোবাজীর জন্য একটি কুটীর নির্মাণ করা হইল। ২৩শে এপ্রিল প্রত্যুষে বিনোবাজী সম্মেলনের স্থান হইতে সেখানে যান এবং উক্ত কুটীরে তিনদিন বাস করিয়া আশ্রম-প্রতিষ্ঠার শুভানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ইহা তো হইল? কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি? কেনই বা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার কল্পনা করা হইল? ইহার মূল কোথায়? উপরন্তু বিনোবাজীর বর্তমান কার্যক্রমের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি? দশ বৎসর পূর্বে বিনোবাজী যখন সিওনী জেলে ছিলেন তখন তথায় তিনি গীতার 'স্থিতপ্রজ্ঞ' সম্পর্কীয় শ্লোকগুলির উপর ব্যাখ্যান দেন এবং উহা 'স্থিতপ্রজ্ঞ-দর্শন' নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে তিনি বৌদ্ধের 'নির্বাণ এবং বেদান্তের 'ব্রহ্মনির্বাণ' শব্দের সমন্বয় করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন এবং ঐ ব্যাখ্যাতে তিনি ঐ সমন্বয়ও করেন। ঐ সমন্বয় সম্পর্কে 'স্থিতপ্রজ্ঞ-দর্শন' পুস্তিকায় এরূপ লিখিত আছে—"ঐ দুই-ই বস্তুত এক। বৌদ্ধধর্মের 'নির্বাণ' নিষেধক শব্দ (negative) এবং গীতার

'ব্রহ্ম-নির্বাণ' বিধায়ক ভাষা (positive)। যদি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে 'ব্রহ্ম-নির্বাণ' শব্দ কেবল বিধায়ক নহে; উভয় অর্থেরই সংগ্রাহক-রূপে গীতা ঐ শব্দের অবতারণা করিয়াছেন। 'ব্রহ্ম-নির্বাণ' বলিলে 'আমি' চলিয়া যায়। কিন্তু 'ব্রহ্ম' থাকিয়া যায়। ইহাতে ভয় পাইবার কিছুই নাই। যেখানে 'শব্দ' সমাপ্ত হইয়া গেল সেখানে শব্দ লইয়া ঝগড়া কেন? গীতার ভাষায় আমি বলিব 'একং ব্রহ্ম চ শূন্যং চ, যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'—যিনি ব্রহ্ম ও শূন্যকে এক দেখেন তিনি সত্যই দেখেন। এইজন্য ব্রহ্ম-নির্বাণ শব্দের দ্বারা সারা বাদ মিটিয়া যায়।"

বিহারে ভূদানযজ্ঞের সাফল্যের মূলে বহুলোকের শ্রদ্ধা, তপশ্চর্যা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু বিনোবাজী মনে করেন যে, সকলের মূলে রহিয়াছে ভগবান বুদ্ধের পুণ্যস্মৃতির প্রেরণা। সেইকারণে তিনি বুদ্ধগায়ায় "সমন্বয়-আশ্রম" স্থাপনের প্রেরণা পান বলিয়া মনে হয়। সর্বোপরি ভূদানযজ্ঞের কার্যক্রম যে-পরম লক্ষ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে তাহা হইতে এক সমন্বয়-আশ্রম স্থাপন করিবার প্রেরণা তিনি পান। উহা নিম্নের আলোচনা হইতে ক্রমশ স্পষ্ট হইবে।

বেদান্ত এই পরম সত্য প্রতিপাদন করেন যে, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, আর কিছুই নাই। সবই ঈশ্বরময়। এইসত্য উপলব্ধি করিলে জীবনে অহিংসা প্রতিষ্ঠা না হইয়া পারে না। কারণ যদি হিংসা করা হয়, তবে সে-হিংসা তো নিজেকেই নাশ করিবে। সবই তো একই আত্মা ও একই ঈশ্বর। সমন্বয়ের কথা বুঝাইতে গিয়া বিনোবাজী ইহা অনুপমভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—"বেদান্ত ও অহিংসা এই দুই জিনিস পরস্পর অবিরুদ্ধ। ইহারা পরস্পরের কার্যকারণ। বেদান্ত হইতে সরাসুরি অহিংসা প্রতিফলিত হইয়া থাকে এবং অহিংসা গ্রহণ করা ব্যতীত বেদান্তের কোন পাকা মজবুত বুনিয়াদ থাকে না। অন্যদিকে বেদান্তের আধার ছাড়া অহিংসা দৃঢ় হইয়া থাকিতে পারে না। এই সমগ্র প্রক্রিয়া গীতার একটি শ্লোকে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে—

'সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো পরাং গতিম্ ॥'

যে মনুষ্য সর্বত্র পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সমানরূপে দেখিয়া থাকেন--ইহা হইল বেদান্ত। আর উহার পরিণামস্বরূপ তিনি কোনরূপ হিংসাই করিতে পারেন না। কারণ হিংসার কার্য করিবার জন্য যিনি তরবারি উঠাইবেন, তিনি নিজেকেই আঘাত করিবার জন্য উহা উঠাইতেছেন এরূপ মনে করিবেন। এইজন্য যিনি ঐরূপ আত্মহিংসা করেন না, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন। মূল বুনিয়াদ হইতেছে—সমান পরমেশ্বরের দর্শন অর্থাৎ বেদান্ত। উহা হইতেই জীবননিষ্ঠাস্বরূপ অহিংসা এবং উহার অন্তিম পরিণাম পরমগতি। এইরূপে গীতার এক অদ্ভুত শ্লোকে সমগ্র-বিশ্বের পক্ষে জরুরী সমন্বয়, আদি হইতে অন্ত, বুনিয়াদ হইতে শিখরদেশ পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে।" এই সমন্বয়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী আরও বলেন, "সর্বাঙ্গীন সমগ্র সত্য-দর্শন এবং উহার সঙ্গে অহিংসা ইহাকে বেদান্ত বলে। আমাদের জীবনে ও দর্শনে আমাদিগকে এই দুই তত্ত্বের সমন্বয়সাধন করিতে হইবে। এযাবৎ সমন্বয়ের জন্য যে-প্রচেষ্টা করা হইয়াছে তাহার দ্বারা একদিক মাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে পরিপূর্ণতা আসে নাই। পরিপূর্ণতায় হয়তো কখন পৌঁছানো যাইবে না। যাহা হউক, ভগবান আজ আমাদের জন্য এক বিরাট কার্যক্রম রচনা করিয়াছেন। ভূদানযজ্ঞ-যে আমাদিগকে কোন্ সুদূরে লইয়া যাইবে তাহার অনুমান আজ করা সম্ভব নহে। কিন্তু আমাদিগকে একের পর একপদ অগ্রসর হইতে হইবে। এই সম্পর্কে এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের কল্পনা আমার মনে আসে। তাহার নাম 'সমন্বয়-আশ্রম' বা 'সমন্বয়-মন্দির' যাহাই দেওয়া হয় হউক।

"এক ঈশ্বরই আছেন আর সবই শূন্য, আমরা সবই শূন্য। তাঁহারই অভ্যন্তরে তাঁহার লীলায় আমরা এইসব রূপ পাইয়াছি। শূন্যেরও একটি রূপ থাকে। উহারও এক আকার দেখা যায়। উহা নিরাকার নহে। ঐরূপে আমাদেরও আকার মিলিয়াছে। এইজন্য আমাদিগকে শূন্য হইয়া যাইতে হইবে।"

আমাদিগকে 'সর্বোদয়'-রচনার মাধ্যমে সামুদায়িক অহিংসার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সামুদায়িক অহিংসার মূল হইতেছে—আত্মার একত্ব

দর্শন। সর্বভূতে একই আত্মা বিরাজমান—এই অনুভূতি। উহাই সাম্প্রদায়িক অহিংসার উৎস। উহাই বেদান্ত। ইহাই আত্মজ্ঞানের পরম-বিকাশ। এই অনুভূতি থাকিলে তবেই সাম্প্রদায়িকক্ষেত্রে সাম্য-প্রতিষ্ঠার প্রেরণা আসে। তাই সত্য বা বেদান্তের সহিত অহিংসার সমন্বয়ের প্রয়োজন আজ অত্যন্ত জরুরী। উপরন্তু বেদান্ত বা আত্মজ্ঞান দিক্ নির্দেশ করে। কিন্তু কর্মে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা ও শক্তিদান করে—অহিংসা। তাই সাম্প্রদায়িক সাম্য-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সত্য বা আত্মজ্ঞান ও অহিংসা পরস্পরের পূরক। এই কারণে আজ এই সমন্বয়ের এত প্রয়োজন। সমন্বয়-আশ্রম স্থাপনের উহাই মূল কথা। যদি খুব গভীরভাবে চিন্তা করা যায় তবে আমরা বুঝিতে পারিব যে, আজ সর্বক্ষেত্রে সমন্বয়ের প্রয়োজন বিশেষ-ভাবে অনুভূত হইতেছে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে, বিভিন্ন আদর্শবাদের মধ্যে, জগতের বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির মধ্যে সমন্বয়সাধন আজ জরুরী হইয়া দাঁড়াইতেছে। সর্বপ্রকার সমন্বয়ের উৎস—সত্য ও অহিংসার সমন্বয়। তাই বিনোবাজী প্রতিষ্ঠিত "সমন্বয়-আশ্রমের" ভবিষ্যৎ অপরিমেয় সম্ভাবনায় পূর্ণ। উহা এইযুগের আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে পরিণত ও পরিগণিত হইবে—এই আশা পোষণ করা দুরাশা নহে।

সমন্বয়-আশ্রম প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে যে-মহান আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা বিনোবাজীর শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী হইতে ক্রমশ আরও সুস্পষ্ট হইতেছে। সমন্বয়-আশ্রম প্রতিষ্ঠার আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—ধ্যানযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয়সাধন। বিনোবাজী সমন্বয় ও সমন্বয়-আশ্রম সম্পর্কীয় এক আলোচনা প্রসঙ্গে সম্প্রতি (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫) বলিয়াছেন—"সমন্বয়ের অর্থ ইহা নহে যে, সংসারে কোন-কোন ধর্ম অপূর্ণ আছে এবং সেইসব অপূর্ণধর্মের সমন্বয় করিতে হইবে। সকল ধর্মই পূর্ণ। তবে উহাদের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে তাহাদেরই সমন্বয়সাধন করিতে হইবে।

"আমার ঐ আশ্রম হইতে কিছু পাইবার আশা আছে। এক তো এই যে, ধ্যানযোগ ও কর্মযোগের অভিন্নতা কিরূপে সাধন করা যায় তাহার প্রয়োগ সেখানে চলিবে। ভারতে ধ্যানযোগের যেরূপ বিকাশ হইয়াছে

সেরূপ আর কোথাও হয় নাই। সম্ভবত সূফিগণের মধ্যে ঐরূপ বিকাশ হইয়াছিল। কিন্তু এই ধ্যানযোগের সাধনায় একটু ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছিল। শ্রমবিমুখ ও কর্মবিমুখ হইয়া একান্তে ঐ সাধনা করা হইত। ইহার তাৎপর্য ইহা নহে যে, ঐসব সাধক অলস ছিলেন। তাঁহারা তো শ্রম করিতেনই। তাঁহাদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠোর ছিল। কিন্তু তাঁহারা উৎপাদক-শ্রম করিতেন না। এরূপ বিশ্বাস করা হইত যে, ধ্যানযোগের জন্য কর্ম ত্যাগ করা আবশ্যক। তাই সাধকশ্রেণী শ্রমবিমুখ হইয়া গেলেন। সমাজে উৎপাদক-শ্রমের প্রতিষ্ঠা কম হইয়া গেল। সমাজ সেইসব সাধকের ভরণপোষণের ভার লইতেন। এক্ষণে আমি চাই যে, এরূপ সাধকের সৃষ্টি হউক যাঁহারা নিজেদের ভরণপোষণের ভার সমাজের উপর চাপাইবেন না। নিজেরাই উৎপাদক-শ্রম করিবেন।

"এই উৎপাদক-পরিশ্রমকে আমি 'ব্রহ্মকর্ম' বলিয়া থাকি। সাধক বাহ্য সৃষ্টিতে পরিশ্রম করিতেছেন এরূপ দেখা যাইবে, কিন্তু উহার কোন ভার সাধকের মনের উপর পড়িবে না। আমরা শ্বাস গ্রহণ করিতেছি দেখা যায়; কিন্তু শ্বাস লইতে আমাদের কোনরূপ কষ্ট হয় না। সেইরূপ সাধক 'ব্রহ্মকর্ম' করিতে থাকিবেন বটে, কিন্তু তিনি অন্তরে অখণ্ডভাবে ধ্যানমগ্ন থাকিবেন। যেমন শ্বাস লওয়া হইতেছে এই বোধই আমাদের থাকে না, সেরূপ অবিরত কর্ম করিলেও সাধকের উহার বোধই থাকিবে না। কর্মের দ্বারা তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইবেই না।

"পরিব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অখণ্ডভাবে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন এরূপ জ্ঞান-প্রসারক সেবকের প্রয়োজন সমাজে নিরন্তর রহিয়াছে। হিন্দু সন্ন্যাসিগণ, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ, জৈন মুনিগণ তথা অন্য সাধু-সন্তগণ ভারতে এই পরিব্রাজকবর্গকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ঐ পরিব্রাজকগণের তপস্যার কারণেই আমাদের সংস্কৃতি এরূপ বিবিধতাযুক্ত সমৃদ্ধ হইয়াছে, প্রাণবান হইয়া রহিয়াছে। উহাকে কতই না আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। তথাপিও উহা জীবন্ত রহিয়াছে। অনাসক্তবৃত্তিতে গ্রামে-গ্রামে জ্ঞান প্রসার করিয়া বেড়াইবেন এরূপ সেবকগণের খুবই প্রয়োজন রহিয়াছে। এইবিষয়ে সমন্বয়-আশ্রম সহায়তা করিতে পারিবে। আজ পর্যন্ত 'এই পরিব্রাজক-

শ্রেণী ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছেন। যাঁহারা সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির আরম্ভ করাইয়াছিলেন তাঁহারা নিজেরা উচ্চকোটির সাধক ছিলেন। ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবনযাপন করিলে সাধকের উন্নতি তো হয়ই। জন-সম্পর্ক এবং জনতা-জনার্দনের দর্শনলাভের উহা নিঃসংশয় এক সুন্দর উপায়। আমি ঐ ভিক্ষাবৃত্তির সহিত শরীর-শ্রমের ব্রতকে জুড়িয়া দিতে চাই। পরিব্রাজক যেখানেই থাকিবেন সেখানেই তিনি কোন-না-কোন উৎপাদক-পরিশ্রম অবশ্য করিবেন।

"ঐ শ্রমের দ্বারা যাহা উৎপন্ন হইবে তাহাতে তাঁহার নিজের অধিকার আছে—ইহা তিনি মনে করিবেন না। ঐ উৎপাদনও তিনি সমাজে অর্পণ করিয়া জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নম্রভাবে গ্রহণ করিবেন। যদি এইভাবে ভিক্ষাবৃত্তির সহিত ব্রহ্মকর্ম জুড়িয়া দেওয়া যায় এবং ধ্যানযোগ ও কর্মযোগের অভিন্নতা সাধন করিবার জন্য প্রচেষ্টা করা যায়, তবে জীবনে এক নূতন আলো আসিবে।

"সেক্ষেত্রে সাধকের সাধনা সামূহিক সাধনায় পরিণত হইবে। সাধক জানিবেন যে, সমাজের সঙ্গে তাঁহার অভেদ্য সম্বন্ধ আছে এবং তিনি সমাজরূপী living organism -এর এক অবিভাজ্য অঙ্গ। বারিবিন্দুর জীবন যেরূপ সিন্ধুর সহিত সমরস হইলে তবেই সম্ভব হয়, মানুষের জীবনও সেরূপ সমাজের মধ্যে থাকিয়াই সম্ভব। দুই অবস্থায় মানুষের জীবন সমাজ হইতে পৃথক হইয়া থাকিতে পারে। এক অবস্থা হইতেছে—মৃত্যু এবং অন্য অবস্থা হইতেছে—মুক্তি। সমাজ হইতে পৃথক হইয়া থাকিয়া জীবিত থাকা সম্ভব নহে।"

বিনোবাজী মৌলিক

ভূদানযজ্ঞের মূল গান্ধীজীর বিচারধারায়—একথা আমরা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বিনোবাজী উহা যেভাবে দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা মৌলিক। তাঁহার অনুপম প্রকাশভঙ্গী তাঁহার নিজস্ব। যে-গভীরতম আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোণ হইতে ভূদানযজ্ঞের বিভিন্ন দিকের বিচার তিনি করেন, বিশেষত তাহাই তাঁহার নিজস্ব। তাই

বিনোবাজী গান্ধীজীর অসমাপ্ত কার্য সম্পাদন করিতেছেন বটে, কিন্তু উহার প্রতি-পর্দায়, প্রতিরন্ধ্রে বিনোবাজীর মৌলিক ছাপ রহিয়াছে। তিনি গান্ধীজীর অনুকরণ নহেন, তিনি মৌলিক। গান্ধী-বিচারকে তিনি এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া আমাদের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বিনোবাজীকে বুঝিতে হইলে এইকথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে। তিনি যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন তাহাই তাঁহার নিজের করিয়া লইয়াছেন। উহা যখন তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয়, তখন মনে হয় কোন এক অভিনব জিনিস শুনিতেছি। ইহাই বিনোবাজীর বৈশিষ্ট্য। বিনোবাজী গান্ধীজীর নিকট হইতে কতটা পাইয়াছেন আর অন্যের নিকট হইতে কতটা পাইয়াছেন—এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি ১৯৪৮ সালে যেমন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিনোবাজীর উক্ত মৌলিকত্বের কথা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—"গান্ধীজীর নিকট হইতে আমি তো পরিপূর্ণভাবে পাইয়াছি। কিন্তু তিনি ব্যতীত অন্যের নিকট হইতেও পাইয়াছি। যাঁহার নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি তাহা আমি নিজের করিয়া লইয়াছি। এখন ঐ সমগ্রপুঁজি আমারই হইয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে গান্ধীজীর দেওয়া কত আর অন্যের দেওয়া কত, তাহার পৃথক হিসাব আমার কাছে নাই। যে-বিচার আমি শুনিয়াছি তাহা যদি আমার কাছে উচিত বলিয়া মনে হইয়া থাকে এবং আমি উহা হজম করিয়া থাকি, তবে তাহা আমারই হইয়া গিয়াছে। উহা আর পৃথক কেমন করিয়া থাকিবে? আমি কলা খাইয়াছি ও তাহা হজম করিয়া ফেলিয়াছি, উহার মাংস আমার শরীরের উপর বসিয়া গিয়াছে, এখন ঐ কলা আর কোথায় পাওয়া যাইবে? উহা তো আমার শরীরের রক্ত-মাংসে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এইপ্রকারে যে-বিচার আমি গ্রহণ করিয়াছি উহা তো আমারই হইয়া গিয়াছে।"

আন্দোলনের ভাবী স্বরূপ

একটি লক্ষ্য স্থির করিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯৫৭ সালের শেষ পর্যন্ত অহিংসাত্মক উপায়ে দেশের ভূমি-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। অর্থাৎ ভূমি-বণ্টনের বর্তমান অসাম্য দূর করিতে হইবে। একথা পূর্বে

উল্লেখ করা হইয়াছে। যে মূলগত বিচারবোধের ভিত্তিতে ভূমি-বণ্টনের অসাম্য দূর করিতে হইবে, তাহা হইতেছে—ভূমিতে কোন ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে না। গ্রামের ভূমির মালিক হইবে সমগ্র গ্রাম। যেব্যক্তি নিজহাতে ভূমি চাষ করিতে চাহিবে সেব্যক্তিই ভূমি পাইবে। ইহা এক মহান ক্রান্তিমূলক বিচার। ইহাকে কার্যে পরিণত করিবার কাজও এক মহান ক্রান্তির কাজ। জন-মানসে আমূল পরিবর্তন সাধিত হইলে তবেই এই ক্রান্তি হওয়া সম্ভব। সর্বসেবা-সংঘ ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন পরিচালনা ও উহার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। বিনোবাজী মনে করেন যে, কোন সংস্থার সীমার মধ্যে আবন্ধ রাখিয়া ক্রান্তি আনয়ন করা সম্ভব নহে। তাই তিনি চান যে. আন্দোলনের দায়িত্ব জনগণের উপর অর্পণ করা হউক। তাহাতে আন্দোলন ব্যাপক হইবে এবং ক্রান্তিও সহজসাধ্য হইবে। উপরন্তু গান্ধী-স্মারক-নিধি হইতে অর্থ লইয়া আন্দোলনের ব্যয় নির্বাহ করা হইতেছে। আন্দোলনকে সংস্থা-নিরপেক্ষ করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সংস্থার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করাও বন্ধ করা আবশ্যক। আন্দোলনের দায়িত্ব জনসাধারণ গ্রহণ করিলে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন থাকিবে না। তবে সর্বসময়ের কর্মীদের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা না রাখিলে চলিবে না। সম্পত্তিদানযজ্ঞে দানপ্রাপ্ত অর্থের একাংশ এই বাবদ ব্যয় করা যাইতে পারে। সম্পত্তিদানের অর্থ যে-যে উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার নিয়ম রহিয়াছে তাহার মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে, ত্যাগশীল দরিদ্র কর্মীদের ন্যূনতম নির্বাহ-ব্যয়ের জন্য সম্পত্তিদানের অর্থ ব্যয় করা যাইতে পারে। তাই বিনোবাজী চান যে, সম্পত্তিদানযজ্ঞ-আন্দোলন এখন অত্যন্ত ব্যাপকভাবে চালানো হউক। সম্প্রতি (সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিক, ১৯৫৫) বিনোবাজীর সঙ্গে তাঁহার উড়িষ্যা ভ্রমণের সর্বশেষ অবস্থান-স্থল কুজেন্দ্রীতে সর্বসেবা-সঙ্ঘের প্রবন্ধ-সমিতির কয়েকজন সদস্য সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহাদের সহিত ভূদান-যজ্ঞ-আন্দোলনের ভাবী রূপ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গেই বিনোবাজী উপরোক্তরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেন। উহা হইতে আন্দোলনের ভাবী স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে। সর্বসেবা-সঙ্ঘ বিনোবাজীর ঐ বিচারধারা মানিয়া লইয়াছেন এবং আন্দোলনকে সেই অনুসারে রূপদানের জন্য

আবশ্যকীয় কর্মব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। আন্দোলনের ভাবী রূপ সম্পর্কে বিনোবাজীর উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম এই ঃ—

"আন্দোলনকে কোন সংস্থার সীমা বা নিয়মে আবদ্ধ রাখিয়া ক্রান্তি আনয়ন করা যায় না। সর্বসেবা-সংঘ তো এক সংস্থা। সংস্থার মাধ্যমে সাহায্যদান করা যায়, কিন্তু ক্রান্তি আনয়ন করিতে হইলে তাহা জন-মানসের পরিবর্তনদ্বারাই সম্ভব। আমি চাই যে, ১৯৫৭ সালে ক্রান্তি হউক, অর্থাৎ গ্রামে-গ্রামে লোকেরা উঠিয়া দাঁড়াক এবং আমরা যেরূপ চাই সেইভাবে ভূমির বণ্টন হউক। সেইদিন আসিতে যত বৎসর লাগে লাগুক। কিন্তু অন্তিম ক্রান্তির কাজ একই দিনে হওয়া চাই। একটি তারিখ স্থির করিয়া ঐদিন সারাভারতে ভূমি-বণ্টন করিতে হইবে। সেই জন-মানস প্রস্তুত করিবার জন্য যাহাকিছু করা আবশ্যক তাহা করা হউক। আমাদের পদযাত্রাও চলিবে, কিছু গঠনকার্যও হইবে এবং রাজনৈতিক দলসমূহের সহানুভূতিও পাওয়া যাইবে। এসব তো হইবেই। কিন্তু অন্তিম লক্ষ্য লাভ হইবে জনশক্তির দ্বারা।

আমরা গান্ধীনিধি প্রভৃতির নিকট হইতে এখন যে-অর্থ লইতেছি তাহা লওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া বলিয়া দিতে হইবে যে, এই ক্রান্তির কাজ সারা-ভারতের সমগ্র জনগণই করিবে। আমরা এই কাজের জন্য কাহারও নিকট হইতে অর্থ লইব না। কেবলমাত্র দেশের বিশ-পঁচিশটি স্থানে অফিস রাখা হইবে। সেখানে দানপত্র ইত্যাদি জমা থাকিবে। এইকাজের জন্য যে এক-আধ লক্ষ টাকার আবশ্যক হইবে তাহা গান্ধীনিধি হইতে লওয়া হইবে বটে, কিন্তু আন্দোলনের দায়িত্ব জনতার উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে। একথা ঠিক যে, অর্থাদির ব্যবস্থা না রাখিলে সর্বসময়ের কর্মী (whole-time worker) পাওয়া যাইবে না। এইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া সম্পত্তিদানের জন্য জোর চেষ্টা করিতে হইবে এবং সম্পত্তিদানের অর্থ-সাহায্যে কর্মিগণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইভাবে সমগ্র ব্যবস্থা জনশক্তির মাধ্যমে হইবে। ইহা মানিয়া লইয়া একটি দিন স্থির করিয়া রামনাম লইয়া উপর হইতে অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করা বন্ধ করিতে হইবে। লোকে বলে—এইকাজ কেবল আপনাদের নহে, আমাদেরও। তবে অনর্থক

আমরা কেন এই অহংকার করিবার অবকাশ রাখি যে, কেবলমাত্র আমরাই এইকাজ করিতেছি। যদি আমরা সংস্থার মাধ্যমে কাজ করা বন্ধ করিয়া দেই, তবে কাজ সফল করিবার দায়িত্ব জনতার উপর সাক্ষাৎভাবে আসিয়া পড়িবে। অবশ্য গঠনকার্যের কথা ভিন্ন এবং আমি চাই-যে কোরাপুট জেলায় গঠনকার্য চলিতে থাকুক। ইহা ব্যতীত যেসব জমি পাওয়া গিয়াছে তাহার বহুলাংশ বিতরণ করিয়া লোকের সম্মুখে বিতরণ-প্রক্রিয়ার এক নমুনাও রাখিতে হইবে। অবশিষ্ট কার্য জনতাই করিবে। বিতরণ সম্পর্কে আমাদের যে-নিয়ম আছে তাহা বড়-বড় অক্ষরে ছাপাইয়া প্রতি গ্রামে টাঙ্গাইয়া দিতে হইবে। তখন ঐ নিয়ম অনুসারে যে-কেহ বিতরণ-কার্য করিতে পারিবে। এইভাবে আন্দোলনকে তন্ত্রমুক্ত অবস্থায় লইয়া যাইতে হইলে যাহা করা আবশ্যক আপনারা তাহা করুন।"

উপসংহার

প্রেমের শক্তি নীরবে ও অদৃশ্যভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে। তারপর একদিন কোন শুভ অবকাশে তাহা বিরাট্ আকারে আত্মপ্রকাশ করে। তখন লোকে তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। মহাত্মা গান্ধী ভারতের মাটিতে সামুদায়িক প্রেমের বীজ বপন করিয়াছিলেন। উহা অংকুরিত হইবার জন্য মাটির নীচে অদৃশ্যভাবে ক্রিয়াশীল ছিল এবং কবে লোকচক্ষুর অন্তরালে উহার অংকুরোদ্গম হইয়াছিল। আজ আরেকজন সাধু-সন্তের শীতল শান্তিবারি সিঞ্চনে তাহা তরুণ পাদপরূপে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। লোকে ইহার বর্ধনশীলতার গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্যবোধ করিতেছে। এইকাজ মহাত্মা গান্ধীর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"আজ যেকাজ আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি তাহা আপনারা অন্তরের সহিত মানিয়া লইয়াছেন এবং আমি দেখিয়াছি যে, উহা বুঝাইতে আমার বিশেষকিছু কষ্ট করিতে হয় নাই। ইহার অর্থ কি? মহাপুরুষের শক্তি যখন তাঁহার দেহে আবদ্ধ থাকে, তখন তাহা সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যখন তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া যান, তখন সেইশক্তি অধিক তেজের সহিত কাজ করিতে থাকে। যদি আমাদের মনের

ভূমিকা ঠিকমত গঠিত হইয়া থাকে, তবে আমরা অন্তর হইতে অনুভব করিতে পারিব যে, গান্ধীজী বিদ্যমান আছেন, তাঁহার তিরোভাব হয় নাই। আর আজ যাহা বহুলোককে প্রেরণাদান করিতেছে ইহা তাঁহারই শক্তি। পরমেশ্বর তাঁহার কার্য অনেকপ্রকারে সাধন করাইয়া লন। সমুদ্রে অনেক লহরী উত্থিত হয়। পরমেশ্বররূপী সমুদ্রে সৎপুরুষরূপী লহরী উত্থিত হইয়া থাকে। আর আমরা যদি সেই লহরী স্পর্শ করি, তবে আমাদের তাহা হইতে প্রেরণা ও নবজীবন লাভ হয়। যে-কার্যক্রম আজ আমি দেশের সম্মুখে রাখিয়াছি উহা গান্ধীজীরই আদর্শ-কার্যক্রম। আপনাদের এই বিশ্বাস থাকা চাই যে, আমরা এক আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।"

এখন এই কাজ ঈশ্বরের প্রেরণায় ও ইঙ্গিতে সাধিত হইতেছে। নচেৎ কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কতিপয় ব্যক্তির পরিচালনায় এতটা সম্ভব হইত না। এই আন্দোলনের আশাতীত অগ্রগতি লক্ষ্য করিলে মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়। ইহার কারণ কি? কারণ ভূদানযজ্ঞ কোন এক সাধারণ আন্দোলন নহে। ভূমি লইয়া ইহার আরম্ভ বটে, কিন্তু ইহার মূল গভীরতম প্রদেশে। ইহা এক ধর্ম-আন্দোলন। ইহা যুগের দাবী। ইহা যুগধর্ম। ধর্ম-প্রবাহের আরম্ভ হয় অত্যন্ত সংকীর্ণ আকারে। ক্রমশ উহার বিস্তার হইতে থাকে এবং অবশেষে উহা সমগ্র ভূভাগ প্লাবিত করিয়া ফেলে। উহা প্রথমে বৃক্ষের ক্ষুদ্রতম বীজের আকারে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু ক্রমশ বর্ধিত হইয়া মহান মহীরুহে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"সাধারণত বটবৃক্ষের সহিত ধর্মের তুলনা করা হয়। যাহা চৈতন্যময় জীবন্তধর্ম, তাহা বটবৃক্ষের মত বিস্তারলাভ করে। উহা হইতে যেসব শাখা নির্গত হয় তাহা হইতে শিকড় বহির্গত হয়, ক্রমে তাহা মূলে পরিণত হয় এবং নূতন-নূতন বৃক্ষ জন্মিতে থাকে। ধর্ম-বিচারের ক্ষেত্রেও এইরূপই হয়। বটবৃক্ষের বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এইজন্য বটবৃক্ষের উপমা দেওয়া হইয়াছে। আম গাছ বড় বটে, কিন্তু উহার আঁটি ছোট নহে। কিন্তু বটের বীজ খুবই ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্রতম বীজের ভিতরই সমগ্রশক্তি নিহিত থাকে। সেইরূপ ভূদানযজ্ঞের নামে যে-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে উহার বীজও এত সূক্ষ্ম ছিল যে, যিনি উহা বপন করিয়াছিলেন তিনিও ভাবিতে পারেন নাই

উহা এরূপ ব্যাপক হইবে, উহার শাখাদি হইতেও নূতন-নূতন বৃক্ষের উদ্ভব হইবে।" ইহার মধ্যে নব সমাজ-রচনার বীজ নিহিত রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। বিশ্বের আজ সবচাইতে যে-জরুরী সমস্যা তাহার সমাধানের বীজও ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যদি ভারত এই আন্দোলনকে পরিপূর্ণ সফলতায় লইয়া যাইতে পারে, তবে কেবলমাত্র সর্বোদয় সমাজপ্রতিষ্ঠায় উহার পরিণতি হইবে না, উহা সমগ্রবিশ্বকেও শান্তির পথ দেখাইবে। উহা সমগ্রবিশ্বকেও অভয়মন্ত্র দান করিতে সক্ষম হইবে।

মহাকবি সেক্সপীয়রের কথায় বলা যায়, 'There is a tide in the affairs of man'—মনুষ্যের জীবনে উন্নতির এক শুভক্ষণ আসিয়া থাকে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, জাতি ও দেশের জীবনেও তেমন। যদি আমরা সেই শুভক্ষণ চিনিয়া লইতে পারি এবং সময় থাকিতে অনন্যকর্মা হইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি, তবে অবিলম্বে ও অনায়াসে দেশ অভীষ্টলাভ করিবে। আমাদের দেশ ও জাতির পক্ষে সেই শুভক্ষণ উপস্থিত।

এই গম্ভীর প্রসঙ্গে গীতার শেষ শ্লোক স্মৃতিপথে উদিত হয়।—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥"

—"যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন, যেখানে ধনুর্ধারী পার্থ আছেন সেইখানেই শ্রী আছে, বিজয় আছে, বৈভব আছে ও অবিচল নীতি আছে—ইহাই আমার মত।"

মহাত্মা গান্ধী ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন—"এখানে শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। তাই উহার অর্থ হইতেছে অনুভবসিদ্ধ শুদ্ধজ্ঞান। 'ধনুর্ধারী পার্থ' বলায় অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানের অনুসারিণী ক্রিয়া সূচিত করা হইয়াছে।" যেখানে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান এবং তদনুসারিণী ক্রিয়া—এই দুইএর সংযোগ, সেখানে শ্রী, বিজয়, বৈভব সবই মিলিবে।

আজ ভারতে পূর্ণবিকশিত আত্মজ্ঞান ও তদনুসারিণী ক্রিয়া—এই উভয়ের প্রয়োজন। যদি এই উভয়ই একযোগে আমরা লাভ করিতে পারি, তবে আমাদের শ্রী, বিজয়, বৈভব ইত্যাদি সবই মিলিবে। ভগবান আমাদিগকে সেইশক্তি দান করুন।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—(ক)

কর্মীদের প্রতি বিনোবাজীর বাণী

ভূদানযজ্ঞের কাজ প্রভুর সেবা

"যেব্যক্তি এইকাজে লাগিবেন তাঁহাকে প্রভুর সেবা মনে করিয়া এই কার্যে লাগিতে হইবে। কাহারও হৃদয়ে যেন ব্যথা দেওয়া না হয়। মুখে ও হৃদয়ে নম্রতা রক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেককে ভগবানের স্বরূপ বলিয়া মনে করিতে হইবে। যিনি জমি দিবেন তাঁহাকে তো সমাদর করিতে হইবে, কিন্তু যিনি জমি দিবেন না তাঁহাকে অনাদর করা চলিবে না। এরূপ শ্রদ্ধা-পূর্ণ বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, যিনি আজ দিলেন না তিনি কাল দিতে পারেন।"

ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে

"বহুসংখ্যক গঠনমূলক কর্মী ছোটখাট কাজে ব্যাপৃত আছেন এবং তাঁহাদের শক্তি অনুসারে কাজ করিয়া যাইতেছেন। ভূদানযজ্ঞ একটি নূতন কাজ আসিল এবং তাঁহাদের রচনাত্মক কাজে একটি কাজ বৃদ্ধি পাইল—কর্মীরা প্রায় এইরূপই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এখন এইকথা স্পষ্ট হইয়াছে যে, আমাদের চালু কাজের মধ্য হইতে যতখানি সম্ভব কাজ কমাইয়া দিয়া ভূদানযজ্ঞের কাজে লাফাইয়া পড়িতে হইবে। অনেক কাজে আরেকটি কাজ যোগ হয় নাই, বরং বহুকাজকে নিজের মধ্যে লইয়া পোষণ করিবে—এরূপ এক কাজ উপস্থিত হইয়াছে।"

কি-কি কাজ করিতে হইবে?

"এক-ষষ্ঠাংশ ভূমিসংগ্রহ করার কাজ ভূদানযজ্ঞের কাজের মধ্যে সব-চাইতে ক্ষুদ্র অংশ। প্রাপ্ত ভূমির বণ্টন করিতে হইবে। যাহাদিগকে জমি দেওয়া হইবে তাহাদের চাষ-আবাদ করিবার জন্য সরঞ্জামাদি দেওয়াইতে হইবে। উহাদিগকে জমিতে স্থায়ীভাবে বসাইতে হইবে। যেগ্রামে জমি পাওয়া গেল সেইগ্রামে খাদি, গ্রাম্যশিল্প, বুনিয়াদী শিক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রামরাজ্য স্থাপনা করিতে হইবে। ভূদানযজ্ঞের কাজের প্রধান অংশ তো পরে করি-

বারই কাজ। যেখানে আবাদযোগ্য পতিত জমির বড় চক পাওয়া গিয়াছে বা পাওয়া যাইবে, সেখানে নূতনভাবে গ্রাম বসাইতে ও গ্রামরচনা করিতে হইবে। এইকাজের জন্য সকলের সহযোগিতা পাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে, জনশক্তি জাগ্রত করিতে হইবে এবং সরকারের নিকট যে-সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে তাহা পাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

নিরন্তর কার্যের আবশ্যকতা

"ভূদানযজ্ঞের ন্যায় এরূপ উৎসাহদানকারী কার্যক্রম আজ দেশের সম্মুখে উপস্থিত। তথাপি কেহ বলে, আমি চারদিন এই কাজে সময় দিব; আবার কেহ বলে, 'পাঁচদিন দিব'। কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত সংসারের জন্য তো তাঁহারা তিনশত পঁয়ষট্টি দিন অবসর পান। আমি জিজ্ঞাসা করি, শিবাজী মহারাজ নিজ জীবনের দশ-পাঁচ দিন সময় ব্যয় করিয়া কি ক্রান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? তিনি তো প্রতিমুহূর্তে ঐকাজে নিমগ্ন থাকিতেন। শঙ্করাচার্য ৩২ বৎসর বয়সের মধ্যে তিন-চার বার সারাদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। অনেক শিষ্য করিয়াছিলেন, বিশ-বিশটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরম্পরা দৃঢ় করিয়াছিলেন। এইসব তিনি মাত্র পাঁচদিন করিয়া সময় দিয়া করিতে পারেন নাই। তিনি নিরন্তর কাজ করিতেন। যখন এরূপ নিরন্তর কার্যরত কর্মীদল তৈয়ারী হইয়া ভূদানযজ্ঞের কাজে আত্মনিয়োগ করিবে, তখনই এই ক্রান্তিকারী কার্য পূর্ণতালাভ করিতে পারিবে।"

এখন ভোগের সময় আসিয়াছে কি?

"কেহ-কেহ এরূপ ভাবিয়াছেন যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর এখন আমাদের কিছু ভোগ করা দরকার। কিন্তু ভোগের সঙ্গে-সঙ্গে পুণ্যক্ষয় হইয়া থাকে। কালিদাস লিখিয়াছেন যে, তপস্বী এক তপ সমাপ্ত হইলেই অন্য তপ আরম্ভ করিয়া দিবেন। ত্যাগ এবং তপ ব্যতীত কোন কার্য সিদ্ধ হয় না। আজ তো আমরা ভোগের পিছনে পড়িয়া আছি এবং ভোগীলোক রাজগদির উপর উপবিষ্ট হইলে কি আর কাজ হইতে পারে?"

কর্মীদের দান

"আমার বিচারধারা গ্রামে-গ্রামে জনে-জনে প্রচার করিবার দায়িত্ব

আপনাদিগকে (কর্মীদিগকে) লইতে হইবে। কিন্তু এই কাজ কেবলমাত্র তখনই আপনাদের দ্বারা করিতে পারা সম্ভব হইবে, যখন আপনারা নিজ হইতে নিজেদের হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া দিবেন। গরীবের জন্য আপনারা আপনাদের এক-ষষ্ঠাংশ দান করুন। আমাদের উপদেশের প্রভাব তখনই জনগণের উপর পড়িবে, যখন আমরা নিজেরা তদনুসারে আচরণ করিব। অতএব কংগ্রেসী, প্রজা-সমাজবাদী প্রভৃতি সকল রাজনৈতিক দলের লোক যাঁহারা আমার কাজে সহায়তা দান করিবার কথা বলিতেছেন, সদ্‌ভাবনা ও প্রেমের সহিত তাঁহাদের নিজ-নিজ অংশ শীঘ্র দান করিয়া দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে কোনরকমের কৃপণতা চলিবে না। তাঁহারা যদি এরূপ না করেন, তবে তাঁহাদের নিন্দা হইবে। কিন্তু আমার কাহারও নিন্দা সহ্য হয় না। এজন্য আমি কর্মীদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি।"

সময়মত ও একযোগে কাজ

"কোথাও কোন বড় পাথর উঠাইতে হইলে সকল লোক একসঙ্গে জোর দেয়। 'এক', 'দুই', 'তিন' বলে এবং এক মুহূর্তেই সকলে একসঙ্গে জোর লাগায়। যদি এরূপ না করে তবে পাথরকে নড়ানো যায় না। এই কার্যও (ভূদানযজ্ঞকার্য) এরূপ যে, ইহাতে আমাদিগকে একসঙ্গে ও একই সময়ে নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। আমি আমার নিজের শক্তি প্রয়োগ করিতেছি। দুই মাসে আপনারা লাগিবেন, চার মাস পরে আর কেহ-কেহ লাগিবে—এইভাবে নিজের-নিজের অবসরমত লাগিলে কাজ হইবে না। এইপ্রকার কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক। সামরিক ভাষায় তাহাকে 'Zero hour' (শূন্যক্ষণ) বলে। কিন্তু ঐসময় আমাদের অবসর আছে কিনা বা আমাদের সুবিধা আছে কিনা—ইহা যদি দেখা হয়, তবে তাহাতে কাজ চলে না। নেপোলিয়ন আট হাজার সৈন্য লইয়া অষ্ট্রিয়ায় গিয়া হাজির হন, এক নির্দিষ্ট সময়ে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্যগণকে আদেশ দেন এবং তাহাতে জয়লাভ করেন। ইতিহাস পাঠ করিবার সময় যুদ্ধসম্বন্ধে অধ্যয়ন করার সখ আমার ছিল। বক্‌সর যুদ্ধে জিনিসপত্র এবং সাহায্য সময়মত না পৌঁছিবার কারণে পরাজয় হইয়াছিল। আমাদের এক বড় দোষ—ব্যবস্থিততার অভাব।"

পরিশিষ্ট—(খ)

সম্পত্তিদানযজ্ঞ সম্পর্কে আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য

[বুদ্ধগয়া সম্মেলনের সময় সর্বসেবা সংঘের কয়েকজন মুখ্যব্যক্তি বিনোবাজীর সহিত সম্পত্তিদানযজ্ঞ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ঐ আলোচনার সারাংশ যাহা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস জাজুজী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

সম্পত্তিদানের স্বরূপ ঃ—সম্পত্তিদানযজ্ঞের বিচারধারা জীবনে রূপায়িত করিবার জন্য নিম্নলিখিত কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। দাতা স্বীয় আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ সমাজসেবায় অর্পণ করিবেন। ইহা সম্ভবপর না হইলে স্বীয় সংসার খরচের এক অংশ দিবেন। আয়ের কিম্বা ব্যয়ের কত অংশ দিবেন তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। উহা ক্রমশ বাড়তি অংকের দিকে যাওয়া চাই। দরিদ্রনারায়ণকে নিজপরিবারের ষষ্ঠব্যক্তি মনে করিয়া প্রকৃত আয়ের ষষ্ঠাংশ অথবা ব্যয়ের পঞ্চমাংশ দিবেন—এইরূপ এক সাধারণ নিয়ম ধরা হইয়াছে। সাংসারিক খরচের মধ্যে বিবাহ ও ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যয়ও ধরিতে হইবে। ষষ্ঠাংশ দাবী করা হয় সত্য, কিন্তু ইহা কোনও ট্যাক্স নহে। সুতরাং দাতা তাঁহার ইচ্ছানুসারে কম কিম্বা বেশী দিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের আয় যথেষ্ট বেশী তাঁহারা যেন এই নির্দিষ্ট পরিমাণের (ষষ্ঠাংশ) কম দিতে না চান। যাঁহাদের আয় নিতান্ত সাধারণজীবন নির্বাহের উপযোগী—অথবা যাহাদের আয় ঐ নির্বাহের চাইতেও কম তাহাদেরও সম্পত্তিদানযজ্ঞে যোগদান করা উচিত। তাঁহাদের দেয় অংশ এই আন্দোলনের প্রতীকরূপে থাকিবে।

সংকল্পের সীমা ঃ—সম্পত্তিদানযজ্ঞের সংকল্প আজীবন হওয়া উচিত। ইহা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এক আধ্যাত্মিক অনুশাসন। সম্পত্তিদানের দ্বারা সমাজহিতকর কাজের সংগে-সংগে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক প্রগতিও হইবে।

ইহার জন্য সকলের তীব্র চেষ্টা থাকা প্রয়োজন। যদি আরম্ভেই কেহ আজীবন সংকল্প গ্রহণ করিতে না পারেন, তবে তিনি প্রথমকিস্তি হিসাবে কমপক্ষে পাঁচ বৎসরের জন্য সংকল্প অবশ্যই করিবেন। এবং ইহারও লক্ষ্য এই হওয়া চাই যে, পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতার সাহায্যে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যও সংকল্প গ্রহণ করা হইবে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যদি আয় বাড়ে তবে সম্পত্তিদানের অংশও বাড়িবে। আয় কমিলে দানের অংশও কমিবে।

দানের অর্থ কিভাবে খরচ হইবে :—সম্পত্তিদানের অর্থ অন্য কাহারও কাছে দিতে হইবে না। দাতা নিজেই উহা খরচ করিবেন। বৎসরে একবার উহার হিসাব সর্বসেবা-সংঘের কার্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। সম্পত্তিদানের অর্থ খরচ করিবার জন্য বিনোবাজী নিম্নলিখিত কার্যসূচী দিয়াছেন :—

(অ) যেসব ভূমিহীন চাষীকে জমি দেওয়া হইবে তাহাদের জন্য বীজ, বলদ, কুঁয়া প্রভৃতিতে সাহায্য করা।

(আ) ত্যাগী সেবকদিগকে অল্পতম ভাতা দেওয়া।

(ই) সৎ সাহিত্যপ্রচার।

বিনোবাজী কিম্বা সর্বসেবা-সংঘ ইহার সহিত অন্যকোন বিষয় সংযোজন বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন। এইসকল কাজের কোন্‌টিতে কত খরচ করিতে হইবে তাহা দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর থাকিবে।

কোন-কোন দাতা এইরূপও বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের কতকগুলি সামাজিককাজের জন্য সর্বদাই কিছু-কিছু খরচ করিতে হয়। সেইজন্য স্থির হইয়াছে যে, দাতা ইচ্ছা করিলে সম্পত্তিদানের টাকা হইতে এক-তৃতীয়াংশ তাহার ইচ্ছামত সার্বজনিক সমাজহিতকর কাজে খরচ করিতে পারিবেন। এবং কমপক্ষে ⅔ অংশ সম্পত্তিদানযজ্ঞের উদ্দেশ্যে খরচ করিতে হইবে।

ইহা যেন চাঁদা দেওয়া না হয় :—অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, কোন কোন দাতা ভূদানযজ্ঞের কাজে আর্থিক সহায়তা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু সম্পত্তিদানযজ্ঞের মত দীর্ঘ সময়ের সংকল্প গ্রহণ করিতে সাহস করেন না। সম্পত্তিদান ব্যতীত কেবল আর্থিক সহায়তা দেওয়া একপ্রকারের চাঁদাই ধরিতে হইবে। এইধরনের চাঁদা দেওয়ার কাজে আমরা উৎসাহ দিতে চাই না। আমাদের সমস্তশক্তি সম্পত্তিদানযজ্ঞের কাজেই সংগঠিত

করা উচিত। তবে এইটুকু ব্যতিক্রম রাখা চলিতে পারে যে, যাঁহারা এক-কালীন দান করিতে চাহেন তাঁহারা ভূমিহীনদের জন্য কৃষির সাজসরঞ্জাম দান করিতে পারেন, যেমন—হালের বলদ, লাঙ্গল, কূপ ইত্যাদি। এই কাজেও দাতার নিকট হইতে কোন টাকা না লইলেই ভাল হয়। দাতা নিজেই ভূমিহীনদের জন্য উহা পেঁাছাইয়া দিবেন। যদি কোনক্ষেত্রে ইহা সম্ভব না হয়, তবে ভূদানযজ্ঞ সমিতি দাতাকে পথ প্রদর্শন করিতে পারেন এবং সহ-যোগিতা করিতে পারেন। যদি এইকাজে কোথাও পয়সা জমা রাখিবার আবশ্যক হয়, তবে তাহা সর্বসেবা-সংঘের নিকট রাখাই ঠিক হইবে।

কর্মীর ভাতা ঃ—গ্রামসেবার কাজে অথবা ভূদানযজ্ঞ প্রভৃতির কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এমন সেবক-কর্মীর জন্য ভাতা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সে-সম্পর্কে এরূপ ব্যবস্থা হইবে যে, দানকৃত অর্থ সর্বসেবা সংঘের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং অতঃপর উহা কর্মীকে দেওয়া হইবে। বিভিন্নক্ষেত্রে ইহার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহা সর্বসেবা-সংঘ স্থির করিবেন।

সাহিত্যপ্রচার ঃ—সৎ সাহিত্যপ্রচারের ব্যাপারেও কোন সাহিত্যই বিনা-মূল্যে দেওয়া হইবে না। অল্পমূল্যে সাহিত্য বিক্রয় করা যাইতে পারে। কোন বিশেষশ্রেণীর পাঠক, যেমন বিদ্যার্থী, কর্মী প্রভৃতিকে অধিক সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে। সার্বজনিক পুস্তকালয়ে কিম্বা পাঠচক্রে বিনামূল্যেও পুস্তক দেওয়া যাইতে পারে। সৎ সাহিত্যের তালিকায় কোন্-কোন্ পুস্তক থাকিবে তাহা পূজ্য বিনোবাজী স্থির করিবেন। এইপ্রকার সাহিত্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া লইলে ভাল হয়।

উপরে সম্পত্তিদানযজ্ঞের যে-তিনটি উদ্দেশ্যের কথা লেখা হইল তাহা সফল করিবার জন্য কি-কি করা উচিত তাহা দাতা প্রাদেশিক ভূদানযজ্ঞ সমিতির নিকট হইতে জানিয়া লইতে পারেন। এবং এইকাজে প্রাদেশিক ভূদানযজ্ঞ সমিতি সহযোগিতা করিবেন।

সম্পত্তিদানে দানকৃত অর্থের কিছু বিশেষ বিনিয়োগ ঃ—(১) যদি কোন বর্ণহিন্দু কোন হরিজন বালককে নিজের গৃহে রাখিয়া তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তবে, তাহার জন্য যে-খরচ হইবে তাহা সম্পত্তিদান বলিয়া গণ্য

করা যাইতে পারে।

(২) কোন সংস্থায় কর্মী ও শিক্ষকগণ একত্র থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যে-বেতনাদি পাইয়া থাকেন তাহার মধ্যে অনেক পার্থক্য। এক্ষেত্রে যদি তাঁহারা তাঁহাদের আয় একত্র করিয়া তাঁহাদের পরিবারের সংখ্যানুপাতে উহা সমানভাবে ভাগ করিয়া লয়েন, তবে উহাকে উত্তম সম্পত্তিদান বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(৩) গরীবদের নিকট হইতে সম্পত্তিদান চাওয়া হয়। সুতরাং তাঁহাদের দানের পরিমাণ যৎসামান্যই হওয়া স্বাভাবিক। ঐ সামান্য অর্থ উপরোক্ত উদ্দেশ্যে তাঁহাদের নিজেদের ব্যয় করা সম্ভব হইবে না। তাই যেখানে দানের বার্ষিক পরিমাণ ২৫৲ টাকা, সেইক্ষেত্রে নিম্নরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ঃ—(ক) যিনি খাদি পরিধানকারী নহেন, তিনি সম্পত্তিদান দেওয়ার পর বার্ষিক ৫০৲ পর্যন্ত মূল্যের খাদি খরিদ করিলে তাঁহার অর্ধেক সম্পত্তিদান বলিয়া গণ্য করা হইবে। (খ) পল্লীশিল্পজাত তৈল, চাউল, চিনি, গব্যঘৃত খরিদ করিলে তাঁহার এক-চতুর্থাংশ সম্পত্তিদান বলিয়া গণ্য করা হইবে। (গ) হাত-চাকিতে গম ভাংগাইয়া যদি আটা ব্যবহার করা হয়, তবে সেরপ্রতি প্রদত্ত মজুরীর মধ্যে এক আনা সম্পত্তিদান বলিয়া গণ্য হইবে।

বিবিধ ঃ—বহুক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা ক্রেতাগণের নিকট হইতে 'ঈশ্বরবৃত্তি' আদায় করিয়া থাকেন। কোন ব্যবসায়ীর নিকট 'ঈশ্বরবৃত্তির' অর্থ সঞ্চিত থাকিলে তাহা সম্পত্তিদানযজ্ঞে গ্রহণ করা চলিবে না।

যাঁহার প্রচুর জমি আছে তিনি ভূদানযজ্ঞে ভূমিদান না করিয়া কেবলমাত্র সম্পত্তিদানযজ্ঞে দান দিতে চাহিলে তাহা গ্রহণ করা যাইবে না।

পরিশিষ্ট—

পশ্চিমবঙ্গের জেলাওয়ারী

(১৯৫১ সালের ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে

সংখ্যা—

জেলা	মোট ভৌগলিক আয়তন সেটেলমেন্ট জরিপ অনুসারে	জল আয়তন	ভূমি আয়তন	আবাদের অনুপযোগী (জল আয়তন সমেত)
	১	২	৩	৪
বীরভূম	১১১৫০০০	১১২৪০০	১০০২৯০০	১৯৬৮০০
বর্ধমান	১৭৩১৪০০	১৫৩৪০০	১৫৭৮০০০	৩৪৬২০০
বাঁকুড়া	১৬৯৪০০০	১৫০৬০০	১৫৪৩৪০০	৩০০০০০
হুগলী	৭৭৩৪০০	৭৩৯০০	৬৯৯৫০০	১৩৮০০০
হাওড়া	৩৫৮১০০	৩৫৮০০	৩২২৩০০	৭৮০০০
মেদিনীপুর	৩৩৬১৮০০	২০৪৩০০	৩১৫৭৫০০	৬৭৩৫০০
২৪ পরগণা	৩৩৬৬৬০০	২১৭১০০	৩১৪৯৫০০	৫০৬২০০
নদীয়া	৯৬৫৭০০	৪৯৮০০	৯১৫৯০০	৮৮৪০০
মুর্শিদাবাদ	১৩২১৩০০	৯৪১০০	১২২৭২০০	১৭২৯০০
মালদহ	৮৯০৯০০	৫৬৫০০	৮৩[illegible]৪০০	৮৫৫০০
পঃ দিনাজপুর	৯৩১৫০০	৫২৪০০	৮৭৯১০০	১৫৩০০০
জলপাইগুড়ি	১৫১৯৬০০	৬৫৫০০	১৪৫৪১০০	২১০২০০
দার্জিলিং	৭৬৭৪০০	৬৪০০	৭৬১৪০০	১৭৭২০০
কোচবিহার	৮৪৩৭০০*	পাওয়া যায় নাই	পাওয়া যায় নাই	৮৬৯০০
পঃ বঙ্গ মোট	১৯৬৪১১০০	—	—	৩২১৩৭০০

*ইহার মধ্যে ২৩,১০০ একর পাকিস্থান পরিবেষ্টিত অংশ। ঐ অংশের বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমির কোন অংক প্রস্তুত করানো যায় নাই।

'গ'

ভূমির বিবরণ

সেই বৎসর। সরকারী হিসাব অনুযায়ী)

একরে।

আবাদযোগ্য পতিত (চলতি পতিত বাদে)	চলতি পতিত	নীট আবাদী জমি	যে জমিতে একাধিক ফসল হয়	মোট আবাদী ও আবাদযোগ্য জমি
৫	৬	৭	৮	৯
৮৬৮০০	২৫০০০	৮০৬৭০০	৬০৯০০	৯১৮৫০০
১৬২৬০০	৬০০০০	১১৬২৬০০	৪২২০০	১৩৮৫২০০
২৪৮০০০	২২৯৪০০	৯২৪৬০০	৪১৫০০	১৩৯৪০০০
২৯৮০০	৮৮০০	৫৯৬৮০০	৪৮৭০০	৬৩৫৪০০
১৫৬০০	১১১০০	২৫৩৪০০	৩৩৩০০	২৮০১০০
২৪৭৭০০	১০২৯০০	২৩৩৭৭০০	১০৮৭০০	২৬৮৮৩০০
৩০১৬০০	৮৮৬০০	১৪১১৪০০	১৮৫০০০	১৮১৭৬০০
৯৩৩০০	২০৫৫০০	৫৭৮৫০০	২২৮০০০	৮৭৭৩০০
১০৯১০০	৩০৬০০	১০০৮৭০০	৪০২১০০	১১৪৮৪০০
৫৯৬০০	৮৩৪০০	৬৬২৪০০	১৩৭৮০০	৮০৫৪০০
৬৩০০০	৩৮৪০০	৬৪৬১০০	৮৫৩০০	৭৭৭৫০০
২৩০০০০	১০১৩০০	৬১৪২০০	৩৬৯০০	৯৪৫৫০০
৪৯৮০০	৩২৯০০	২১৮২০০	২১৮০০	৩০০৯০০
১২৪৯০০	৯২৯০০	৫০০৭০০	৭২০০০	৭১৮৫০০
১৮২৯৮০০	১১৩২৮৩০	১১৭৩০০০০	১৫০৪২০০	১৪৬৯২৬০০

পরিশিষ্ট—

পশ্চিমবঙ্গে জীবিকা হিসাবে শ্রেণীবিভাগ ও

(১৯৫১

জেলা	মোট জনসংখ্যা	Agricultural livelihood categories কৃষির উপর নির্ভরশীল মোট জনসংখ্যা	Non-agricultural livelihood categories কৃষির উপর নির্ভরশীল নহে এমন মোট জনসংখ্যা
	১	২	৩
বীরভূম	১০,৬৬,৮৮৯	৮,৬৮,২৮২	১,৯৮,৬০৭
বর্ধমান	২১,৯১,৬৬৭	১৩,৭২,৩৩৫	৮,১৯,৩৩২
বাঁকুড়া	১৩,১৯,২৫৯	১০,৭৮,৩৭৫	২,৪০,৮৮৪
হুগলী	১৫,৫৪,৩২০	৯,১০,৯২১	৬,৪৩,৩৯৯
হাওড়া	১৬,১১,৩৭৩	৫,০৫,৮৯৪	১১,০৫,৪৭৯
মেদিনীপুর	৩৩,৫৯,০২২	২৭,৪৬,২০৩	৬,১২,৮১৯
২৪ পরগণা	৪৬,০৯,৩০৯	২৪.৬১,৭৮৫	২১,৪৭,৫২৪
কলিকাতা	২৫,৪৮,৬৭৭	২২,৬৯৬	২৫,২৫,৯৮১
নদীয়া	১১,৪৪,৯২৩	৬,১১,৭৮৮	৫,৩৩,১৩৬
মুর্শিদাবাদ	১৭,১৫,৭৫৯	১১,৮৬,৪৭৩	৫,২৯,২৮৬
মালদহ	৯,৩৭,৫৮০	৬,৬৭,৮৫৭	২,৬৯,৭২৩
পঃ দিনাজপুর	৭,২০,৫৭৩	৬,১৩,৭৪৬	১,০৬,৮২৭
জলপাইগুড়ি	৯,১৪,৫৩৮	৪,৪৫,৪৯৪	৪,৬৯,০৪৪
দার্জিলিং	৪,৪৫,২৬০	১,৪২,৮৩৬	৩,০২,৪২৪
কোচবিহার	৬,৭১,১৫৮	৫,৬০,৪৭৬	১,১০,৬৮২
পঃ বঙ্গ মোট	২,৪৮,১০,৩০৮	১,৪১,৯৫,১৬১	১,০৬,১৫,১৪৭

'ঘ'

কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের শ্রেণীবিভাগের বিবরণ।

লোকগণনা)

কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগণের শ্রেণীবিভাগ			
কৃষিজীবী যাঁহাদের নিজের জমি (প্রধানতঃ বা সম্পূর্ণভাবে) পোষ্যবর্গ সমেত	কৃষিজীবী যাঁহাদের নিজের জমি নাই পোষ্যবর্গ সমেত	কৃষি শ্রমিক পোষ্যবর্গ সমেত	কৃষির উপর নির্ভরশীল নহেন এমন জমির মালিক ভূমির খাজনা প্রাপক ও তাঁহাদের পোষ্যবর্গ
৪	৫	৬	৭
৪,৫১,৫৬৫	১,৩২,২২০	২,৭৮,১০৯	৬,৩৮৮
[illegible],৮৮,৫১০	৩,২৩,৩৬৫	৩,৪৩,৪০১	১৭,৩৫৯
৬,৮১,৩৩০	১,৩২,১৫৯	২,৫৬,৮৭১	৮,০১৫
৪,৯৭,০৮৯	১,৮৯,৪০৭	২,১২,৩৩৩	১২,০৯২
২,৩৮,৫২৫	৯০,৯৩৬	১,৬৭,৩৩৫	৯,০১৮
১৭,২০,২২৩	৫,৫১,১৩৫	৪,৫৪,১৭৩	২০,৬৭২
১২,৯৯,২৭৮	৪,৭৩,৫৯৮	৬,৬২,৩৫৭	২৬,৫৫২
৪,৬৯৭	৩০৯	২৮৫	১৭,৪০৫
৩,৬৭,০০৮	১,০৮,৬০১	১,২৭,৮৯৫	৮,২৮৪
৭,১১,৪৫৯	১,৮২,৩৪০	২,৮৩,৩৪৯	৯,৩২৫
৩,৯৫,৪২১	১,৫৪,১৬৭	১,১৫,৬৮৭	২,৫৮২
৩,৪৫,৫৯৫	১,৯০,৭১৩	৭৪,২৯৮	৩,১৪০
১,৯০,৯৫২	২,৩৮,৯৩৫	১১,০০২	৪,৬০৫
৯৪,০৭৯	৪০,২৩০	৭,৯২৯	৫৯৮
৩,৩৮,০২৬	১,৭২,২৮৭	৪৬,৮৫৭	৩,৩০৬
৮০,২৩,৭৫৭	২৯,৮০,৪০২	৩০,৪১,৮৮১	১,৪৯,১২১

পরিশিষ্ট—(ঙ)

ফসল উৎপাদন অনুসারে জেলাওয়ারী ভূমি-বিভাগের বিবরণ

(বর্তমান লোকগণনার রিপোর্ট হইতে গৃহীত) সংখ্যা—একরে

জেলা	ভাদোই ফসল	হৈমন্তিক ফসল	রবি ফসল	অন্যান্য যথা—আম, চা, পান, কলা ইত্যাদি	আউশ ধান
	১	২	৩	৪	৫
বীরভূম	১২,০২১	৫,৩৯,৯৬১	৪৬,৯২৪	৭,৮২২	১৫,৭৫৩
বর্ধমান	৫৩,৮১৫	৭,৯৭,৬০৪	৯২,৬৩০	১,০৮,৭০৬	১৪,৪০০
বাঁকুড়া	১৭,৯০০	৬,৪৬,২০০	৩০,২০০	২,৭৭,৩৫২	১,৭১,১০০
হুগলী	৯,১০০	৩,৯৪,৯০০	১৯,২০০	৩১,৮৮৬	২৫,৬০০
হাওড়া	৭,৮০০	২,২০,০০০	১৭,৫৫০	৬,২৩০	১,৬০০
মেদিনীপুর	২,২৪,১০০	১৮,৯৯,০০০	২,২৩,২০০	১৬,০০০	১,৪২,৭০০
২৪ পরগণা	১,৬৬,২৮৮	১০,১৫,১৩১	১,৪৩,৪০১	৮০,৩৮৮	৪৪,০১৬
নদীয়া	৩,৪০,৮১৬	২,১০,৭৬৫	২,৬৫,৩৪৬	৪৩,২৮৯	১,৯৩,৯৭৬
মুর্শিদাবাদ	৩,৬৫,৮৩৯	৩,৬৩,০৩২	৪,৯৩,১৯৩	৪৯,১২৫	১,৯১,৩৬৫
মালদহ	১,৯০,১০০	২,৮৫,৬০০	২,৯৮,৫০০	২৯,৬০০	১,১০,৩৩৬
পঃ দিনাজপুর	১,১০,৫৯৯	৪,৮৭,৩১৮	১,০১,২৪০	১৫,৮৮৯	৬৭,৭৪০
জলপাইগুড়ি	৯৭,০০০	৪,০৭,৫০০	১২,৯৪৭	২,০৭,১৩৪	৩৫,৪০০
দার্জিলিং	৫৪,১২১	৮৩,১১৪	১৫,৭৭১	১,৮২,৪৭৫	৩৪৯
কোচবিহার	৬৬,৪৯৮	২,২০,৭০৪	৪৪,৮৩৯	৩৬৬	৬৩,২১১
পঃ বঙ্গ মোট	১৭,৪৬,২৯৭	৭৫,৭১,৩২৯	১৮,০৪,৯৪১	১০,৮৬,২৯২	১০,৭৭,৫৪৬

পরিশিষ্ট—(ঙ)

ফসল উৎপাদন অনুসারে জেলাওয়ারী ভূমি-বিভাগের বিবরণ

(বর্তমান লোকগণনার রিপোর্ট হইতে গৃহীত) সংখ্যা—একরে।

জেলা	আমন ধান	বোরো ধান	গম	যব	ছোলা ইত্যাদি	অন্যান্য খাদ্যশস্য
	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বীরভূম	৫০৭১৬৯	৩৮	৮৮৫৮	২২২	৮২২১	২২৯৫৭
বর্ধমান	৭৫০০০০	×	৬১০০	২৩০০	৩৩৬০০	৬২০০
বাঁকুড়া	৬৪৬২০০	২০০	১০৪০০	১৪০০	৫৪০০	২৫৩০০
হুগলী	৩৯৪৯০০	৪৫০০	২০০০	২৫০	৬২০০	৩৫৭০০
হাওড়া	২২০০০০	৩০০০	×	২০০	১৬০০	২১৩০০
মেদিনীপুর	১৮৯৯৩০০	৬৯৩৯	৩৭৫০	৩০০	৭১০০	১৭৮০০
২৪ পরগণা	১০১৫১৩১	২১৯	১৪০৮	১০০	৯৩০০	১১৬৫৪২
নদীয়া	২১০৭৬৫	৮৫১	২৪৮০০	৬১০০	৮৬৫০০	১০২৫৯৪
মুর্শিদাবাদ	৩৬৩০০২	২০৯৬	৪৬৫১৫	২৭০৪৪	১৪০৬৯৮	২০২২১৮
মালদহ	১৩৫০৫৭	১১৯৪০	১২০১০	২৬৯১৭	২৫৪৭২	৯৯৫৭২
পঃ দিনাজপুর	৪৪৭৫৪৩	৮৬	৩৭২১	৫৯৭৭	৬৫৫৪	৮৭৩৮
জলপাইগুড়ি	৪০৭৫০০	৫	১৬০	৩৯০	১	৯২২১৩
দার্জিলিং	৬১৭৮৯	×	৫৬৫	৪০০	২	২৪২০৯
কোচবিহার	২২০৭০৪	×	৩২৬৬	১০৫	৪০০	৯৮৫০
পঃ বঙ্গ মোট	৭২৭৯৩৯০	৩৭৮৭৪	১২৩৫৫৩	৭১৭০৫	৩৩১০৪৮	৭৮৫২২৩

পরিশিষ্ট—(ঙ)

ফসল উৎপাদন অনুসারে জেলাওয়ারী ভূমি-বিভাগের বিবরণ

(বর্তমান লোকগণনার রিপোর্ট হইতে গৃহীত) **সংখ্যা—একরে।**

জেলা	তিসি	তিল	সরিষা	আখ	জোয়ার ইত্যাদি	গোলআলু	ফলের বাগান
	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বীরভূম	৪১৯	৬১১	৬৪৬	৪৫৪২	১৮১	৫৯১১	১৪৩৯০
বর্ধমান	৪০০	৩০০	৩৭০০	৯০০০	×	১৮৪০০	৩২৫৩৪
বাঁকুড়া	২২০০	৬৫০০	৩৫০০	৩১০০	৩০০	৪১০০	২৭৭৩৫২
হুগলী	১০০	৩০০	২০০০	৩০০০	১৩০০০	২১৪০০	৩৩৭৯৯
হাওড়া	৪৫০	×	৭০০	২৫০০	২০০০	২১০০	১২৩১১
মেদিনীপুর	৩০০	৩১০০	৭৫০০	৪৪০০	৪০০	১২৯৫০	১৫৮৫০
২৪ পরগণা	×	×	৪৯০০	২৪৯৩	১০০	৬০৪৬	৭৩৮১২
নদীয়া	১৫০০০	৬০৫	৮০০০	৫৭৩৩	১৬৭০	১৬৫০	৪৩২৯২
মুর্শিদাবাদ	২৫০০০	১৪৭৭	১৫০১০	১১৭৭৫	৩৮০	৭৩৩৩	৪৯১২৫
মালদহ	৫৯৮	৪৩০	১৮০০০	৩০০০	১৪৫৮০০	২৪০০	২৯৬০০
পঃ দিনাজপুর	১৬২	৪২৫	২৬৪৪৯	১৫৫৫	১৫৭৯	৩২১৮	১১০৩৩
জলপাইগুড়ি	৪৩	৫	২৯২৬৩	৪০০	২৫৬২	৫৫১৬	৪১০১২
দার্জিলিং	×	×	২৫৭৬	২২৬	১৫৬৩	৪৪৩৪	৪৯৪৮
কোচবিহার	×	×	১৪৪৯৪	১০০	×	৫৭০২	×
পঃ বঙ্গ মোট	৪৪৬৭২	১৩৭৫৩	১৩৬৭২৮	৫১৮২৪	১৬৯৫৩৫	১০১১৬০	৬৩৯০৫৮

পরিশিষ্ট—(চ)

পশ্চিমবঙ্গের বন

বন-সম্পদ এক বৃহৎ জাতীয় সম্পদ। জ্বালানী-কাষ্ঠ ও টিম্বার-কাষ্ঠ ছাড়া কাগজ, দেশলাই-এর বাক্স প্রভৃতি ছোট-বড় বহুবিধ শিল্পের জন্য আবশ্যকীয় কাঁচামাল বন হইতে উৎপন্ন হয়। বনে বহুবিধ ঔষধের গাছ-গাছড়া উৎপন্ন হয়। বন গবাদি পশুর চারণভূমি। বহুবিধ খাদ্যসামগ্রীও বন হইতে উৎপন্ন হয়। বন কেবল সম্পদ নহে, উহা দেশের পক্ষে এক অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ। কারণ, বন আবহাওয়ার আর্দ্রতা রক্ষণ ও বৃদ্ধি করে এবং বারিপাতের প্রাচুর্য রক্ষা করিয়া কৃষির সৌকর্য বিধান করে। পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে উপরের মাটির স্তর খুব পাতলা সেখানে বৃষ্টির জল সবেগে গড়াইতে গড়াইতে মাটি ক্ষয় হইয়া গিয়া উহা উষর ক্ষেত্রে পরিণত হয়। একমাত্র বনই উহা নিবারণ করিতে পারে। সমতল অঞ্চলে বাতাসের বেগে ধূলা উড়িয়া মাটি ক্ষয় হয়। বনের দ্বারা তাহা নিবারিত হয়।

তাই বৈজ্ঞানিক মতে ভারতবর্ষের ভূভাগের এক-তৃতীয়াংশ বনাবৃত রাখা একান্ত প্রয়োজন বিবেচিত হইয়াছে। পার্বত্য অঞ্চলে শতকরা ৬০ ভাগ এবং সমতল অঞ্চলে শতকরা ২০ ভাগ বনাবৃত রাখা প্রয়োজন। কিন্তু ১৯৪৯-'৫০ সালের হিসাবানুসারে ভারতবর্ষের ভূভাগের পরিমাণ ৮১,০৮,০৯,০০০ একর এবং বনের পরিমাণ ১৪,৭৭,০৫,০০০ একর (২,৩০,৭৮৯ বর্গমাইল) অর্থাৎ শতকরা ১৮·২২ ভাগ। এই হিসাবের মধ্যে বাগান ও রাস্তার ধারে যেসব গাছ আছে তাহার হিসাব ধরা হয় নাই। উহা ধরিলে বন মোট ভূভাগের শতকরা ২০ ভাগ দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গে ঐ সালের হিসাবানুসারে ভূভাগের পরিমাণ ১,৯৬,৯৬,০০০ একর এবং বনের পরিমাণ ২৫,৬৯,২৬১ একর (৪০১৪ বর্গমাইল) অর্থাৎ শতকরা ১৮ ভাগ ছিল। কিন্তু ঐ বন দেশের সর্বত্র সুসমভাবে অবস্থিত নহে। এমন কোন কোন জেলা আছে যেখানে একবিঘাও বন নাই। সম্প্রতি সরকারের দৃষ্টি এইদিকেই আকৃষ্ট হইয়াছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন বন সৃষ্টির জন্য জমি অধিকার করিয়া নূতন বন সৃষ্টির (afforestation) প্রয়াস করা

হইতেছে। বেসরকারী বনসম্পর্কীয় আইনের বলেও বন-সংরক্ষণের চেষ্টা করা হইতেছে। পতিত ভূমি আবাদযোগ্য করিয়া ভূমিহীনের জন্য ভূমিব্যবস্থা করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা করিতে যাইয়া যাহাতে দেশের হিতের পক্ষে যতটা নূতন বন এখনও সৃষ্টি করা প্রয়োজন তাহার জন্য আবশ্যকীয় ভূমির অভাব না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তাই পশ্চিমবঙ্গের জেলাওয়ারী বনের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহার মধ্যে প্রথম হিসাব ১৯৫১ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Conservator General কর্তৃক এবং দ্বিতীয় হিসাব ১৯৫৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন-বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত। পার্থক্যের কারণ খুব সম্ভব এই যে, একটির মধ্যে নূতন বন সৃষ্টির জন্য অধিকৃত ভূমি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং অন্যটির মধ্যে তাহা হয় নাই।

প্রথম হিসাব—১৯৫১		[সংখ্যা—একরে]		দ্বিতীয় হিসাব—১৯৫৪
জেলা	সরকারী বন	বেসরকারী বন	মোট বন।	মোট বন
বীরভূম	×	৩২০৭০	৩২০৭০	৩২৩৭৬
বর্ধমান	×	৭৪৬২৪	৭৪৬২৪	৬৭১৫০
বাঁকুড়া	×	২৮৬৬১১	২৮৬৬১১	৩২৩০৩৯
হুগলী	×	২৫৬০	২৫৬০	×
মেদিনীপুর	৩৫২০	৩২১৯৭৭	৩২৫৪৯৭	৩৫০৮৯৪
২৪ পরগণা	১৮১৬৬৪০	৭০৪০	১৮২৩৬৮০	১০৪২৮১৫
নদীয়া	৬৪০	১৬৬	৮০৬	১১৩৪
মুর্শিদাবাদ	×	৬৫৩	৬৫৩	৩৫৭
মালদহ	×	১২১৯২	১২১৯২	১০৬২৪
পঃ দিনাজপুর	×	১২৮০	১২৮০	১২৬৫
জলপাইগুড়ি	৩৬৯২৮০	৫৪৪০০	৪২৩৬৮০	৪৪২১৩১
দার্জিলিং	২৮৯২৮০	২২৪০০	৩১১৬৮০	২৮১৩১৩
কোচবিহার	১৫৩৬০	×	১৫৩৬০	১৫৩৬০
পঃ বঙ্গ মোট	২৪৯৪৭২০	৮১৫৯৭৩	৩৩১০৬৯৩	২৫৬৯২৬১

ধ্যানের ভারত

॥ আমি সেই ভারতের জন্য কাজ করিয়া যাইব যে-ভারতের দীনতম ব্যক্তিও মনে করিবে যে, দেশ তাহারই দেশ। এই দেশ গড়িয়া তুলিতে তাহাদেরও অভিমত কার্যকরী হইবে। সেই ভারতে উচ্চনীচ শ্রেণীরূপে মানুষের কোন সমাজ থাকিবে না। সেই ভারতে সকল সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে শ্রেষ্ঠপ্রীতির সম্পর্ক রাখিয়া বাস করিবে। সেই ভারতে অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপের কোন স্থান থাকিবে না, উত্তেজক পানীয় অথবা অন্য কোনরূপ মাদকদ্রব্য গ্রহণেরও কোন প্রশ্রয় থাকিবে না। নারী-সমাজ পুরুষসমাজেরই মত সমান অধিকার ভোগ করিবে। ইহাই আমার ধ্যানের ভারত ॥

—গান্ধী

শুদ্ধিপত্র

[তাড়াতাড়িতে ও যান্ত্রিক অসুবিধার দরুন কিছু মুদ্রণপ্রমাদ ঘটিয়াছে। উল্লেখযোগ্য মুদ্রণপ্রমাদগুলি নিম্নে সংশোধিত হইল। ত্রুটি মার্জনীয়।—সঃ]

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৬	সর্বোত	সর্বতো
৬	২০	দকলের	সকলের
১৮	৫	কনে ?	কেন ?
২১	১৮	প্রচেষ্টা	প্রচেষ্টাও
২২	৯	যমুলালজীর	যমুনালালজীর
২২	১১	ধান নদী	ধাম নদী
২৬	২১	টু দি লাষ্ট	টু দিস্ লাষ্ট
৫১	২২	মক্তিলাভের	মুক্তিলাভের
৭২	২৩	হইয়াহে।	হইয়াছে।
৭৮	৭	উপাদানের	উৎপাদনের
১১৪	১৪	কয়িরা	করিয়া
১২৭	৯	সরিত	সহিত
১৩৭	২৫	ভাধা	ভাষা
১৫৩	১৪	যাঁহারা	যাঁহার
১৯৭	১৯	পর্সন্ত	পর্যন্ত
২১৪	১৬	রাজ	আজ
২২৫	২৫	করবার	ফরিবার